প্রতিচিন্তা



সমাজ, অর্থনীতি ও রাষ্ট্রবিষয়ক ত্রৈমাসিক

চতুর্থ বর্ষ ● চতুর্থ সংখ্যা ● ঢাকা ● অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১৪

সম্পাদক ও প্রকাশক মতিউর রহমান কর্তৃক ৫২ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা ১০০০ থেকে
প্রকাশিত এবং ট্রান্সক্রাফট লিমিটেড, ২২৯ তেজগাঁও শিল্প এলাকা
ঢাকা ১২০৮ থেকে মুদ্রিত।
যোগাযোগ : সিএ ভবন, ১০০ কাজী নজরুল ইসলাম অ্যাভিনিউ, কারওয়ান বাজার
ঢাকা-১২১৫। ফোন : ৮১৮০০৭৮-৮১

প্রতি চিন্তা

সমাজ, অর্থনীতি ও রাষ্ট্রবিষয়ক ত্রৈমাসিক

অক্টোবর-ডিসেম্বর সংখ্যা ২০১৪

সম্পাদক
মতিউর রহমান, সম্পাদক, প্রথম আলো

ব্যবস্থাপনা সম্পাদক
খন্দকার সাখাওয়াত আলী, সমাজ গবেষক; ফেলো, পিপিআরসি

উপদেষ্টা পর্ষদ
নুরুল ইসলাম, অর্থনীতিবিদ; ইমেরিটাস ফেলো, ইফপ্রি
আনিসুজ্জামান, প্রফেসর ইমেরিটাস, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
আজিজুর রহমান খান, অর্থনীতিবিদ ও গবেষক; প্রফেসর ইমেরিটাস, ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়া
সিরাজুল ইসলাম, ইতিহাসবিদ; কমনওয়েলথ স্টাফ ফেলো
রওনক জাহান, রাষ্ট্রবিজ্ঞানী; সম্মাননীয় ফেলো, সিপিডি
আকবর আলি খান, অর্থনীতিবিদ, লেখক; অধ্যাপক, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়
ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ, অর্থনীতিবিদ; অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
মাহবুব হোসেন, অর্থনীতিবিদ ও গবেষক; উপদেষ্টা, ব্র্যাক

সম্পাদনা পর্ষদ
নজরুল ইসলাম, ঊর্ধ্বতন অর্থনীতিবিদ, জাতিসংঘ, অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিষয়ক বিভাগ
বদরুল আলম খান, অধ্যাপক, ওয়েস্টার্ন সিডনি বিশ্ববিদ্যালয়, অস্ট্রেলিয়া
হাসান ফেরদৌস, জাতিসংঘে কর্মরত
আলী রীয়াজ, অধ্যাপক, রাজনীতি ও সরকার বিভাগ, ইলিনয় স্টেট ইউনিভার্সিটি
আল মাসুদ হাসানউজ্জামান, অধ্যাপক, সরকার ও রাজনীতি বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
সাজ্জাদ শরিফ, কবি, ব্যবস্থাপনা সম্পাদক, প্রথম আলো

প্রচ্ছদ
কাইয়ুম চৌধুরী, চিত্রশিল্পী

শিল্প নির্দেশক
অশোক কর্মকার, চিত্রশিল্পী

সহকারী সম্পাদক
খলিলউল্লাহ্ ও জোশিতা জিহান অর্নব

দাম : ৫০ টাকা
ISSN 2310-2403
ওয়েবসাইট : protichinta.prothom-alo.com, ই-মেইল : protichinta@gmail.com

Protichinta : A Quarterly Journal on Society, Economy and State
October-December Issue, 2014; Editor & Publisher Matiur Rahman; Price 50 Taka
100 Kazi Nazrul Islam Avenue (CA Bhaban), Karwan Bazar, Dhaka 1215, Bangladesh
Phone : 8180078-81

সূ চি প ত্র

সম্পাদকীয় ৬

গণমাধ্যম

প্রপাগান্ডা ও গণমাধ্যম : যুক্তরাষ্ট্র থেকে বাংলাদেশ
সামিয়া রহমান ও সৈয়দ মাহফুজুল হক ৯

অর্থনীতির ইতিহাস

পলাশীর যুদ্ধ ও সম্পদ পাচারের সূত্রপাত
এম মোফাখ্খারুল ইসলাম ৪১

সীমান্ত

মিয়ানমার-বাংলাদেশ সীমান্তে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অস্ত্র ও গ্যাসপ্রবাহ
ভিলেম ভ্যান শেন্ডেল ৫৮

অনুস্মৃতি

মোখলেসুর রহমানের (সিধু ভাই) সাক্ষাৎকারভিত্তিক রচনা
আমার জীবন-কথা ও সময়
সরদার ফজলুল করিম ও মুস্তাফা নুরউল ইসলাম ৭৪

বইআলোচনা

রাজনীতিতে দায়িত্বশীলতা ও গণতন্ত্রের শর্ত
হাসান শফি ১৪৩
বাংলাদেশ অভ্যুদয়ের বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট
আজিজুল রাসেল ১৫৫

লেখক পরিচিতি ১৭০



সামিয়া রহমান ও সৈয়দ মাহফুজুল হকের প্রবন্ধটি আমরা ছাপছি বাংলাদেশের রাজনীতির দ্বীমেরুকৃত অবস্থাকে মাথায় রেখে। ২০১৩ সালের ৫ই মে ঘটে যাওয়া হেফাজতে ইসলামের আন্দোলনের পর বাংলাদেশের সমাজের বিভক্তি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এটাকে আপাত দৃষ্টিতে একই বছরের ৫ ই ফেব্রুয়ারি শাহবাগ আন্দোলনের বিরুদ্ধ আন্দোলন বলেই ধরা হয়। যুদ্ধাপরাধী বিরোধী সেই আন্দোলন শুরুতে দলমত নির্বিশেষে একটা সার্বজনীন লক্ষ্য নিয়ে পরিচালিত আন্দোলন হিসেবে পরিচিতি পেলেও, পরের দিকে এই আন্দোলনকে দলীয়করণ করা হয়েছে বলেই অনেকে মনে করেন এবং তা এখন দৃশ্যমান। আবার সেই আন্দোলনকে ঘিরে বাংলাদেশের স্বাধীনতা বিরোধী শক্তির অপপ্রচারের ফলে এটিকে নাস্তিকদের আন্দোলন বলে চালিয়ে দেওয়ার একটি প্রচেষ্টা লক্ষ করা গিয়েছিল। যার ফলশ্রুতিতে সাধারণ ধর্মপ্রাণ মুসলমানরা বিভ্রান্ত। হেফাজতে ইসলাম মতিঝিলের শাপলা চত্বরে জড়ো হয়ে তাদের তেরো দফা দাবি উপস্থাপন করে। এই অপপ্রচার বা প্রপাগাণ্ডার মূলে ভূমিকা রেখেছিল গুটি কয়েক মিডিয়া, যার মধ্যে দৈনিক *আমার দেশ* অন্যতম। এই লেখায় যুক্তরাষ্ট্রের উদাহরণ দিয়ে দেখানো হয়েছে কিভাবে মিডিয়া রাজনৈতিক স্বার্থে কিছু ঘটনার পক্ষে আবার কিছু ঘটনার বিপক্ষে অপপ্রচার চালিয়েছিল।

উপনিবেশবাদের করাল গ্রাস থেকে মুক্ত দেশ হিসেবে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার উপর উপনিবেশবাদের ছোবল এখনও বিদ্যমান। সেই উপনিবেশবাদের শুরুটা কিভাবে হল সেই ইতিহাস জানা অত্যন্ত জরুরি। তাছাড়া সাম্প্রতিককালে এ নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে নতুনভাবে বিতর্ক হচ্ছে। জ্ঞানালোচনার এ প্রসঙ্গটি অর্থাৎ ব্রিটিশ উপনিবেশবাদের শুরু হয় নবাব সিরাজউদ্দৌলার পতনের মধ্য দিয়ে। কিন্তু যে ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে নবাবকে ক্ষমতাচ্যুত করে পরবর্তীতে ইংরেজরা ক্ষমতা দখল করে সেই ষড়যন্ত্রে ইংরেজদের ভূমিকা এবং তাদের উদ্দেশ্য নিয়ে একটি আলোচনা থাকছে মোফাখ্খারুল ইসলামের লেখায়। এই প্রবন্ধের অন্যমত গুরুত্ববহ বিষয় হল ইংল্যান্ডের শিল্প বিপ্লবে বাংলা অঞ্চলের সম্পদ কতটুকু কাজে লেগেছিল এবং কি পরিমাণ সম্পদ পাচার করা হয়েছিল তা নিয়ে বিতর্ক।

মিয়ানমার-বাংলাদেশ সীমান্ত বেশ কয়েকটি কারণে আমাদের কাছে এবং বিশ্ব রাজনীতিতে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ভূ-রাজনৈতিকভাবে এই সীমান্ত বেশ তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে। এশিয়ান হাইওয়ে ও প্রাকৃতিক গ্যাসের মত বিষয়গুলো বর্হিবিশ্বের কাছে এই সীমান্তের গুরুত্ব বাড়ালেও, বাংলাদেশের সমাজ বাস্তবতায় এর পাশাপাশি রোহিঙ্গা বিষয়টিও অনেক স্পর্শকাতর। ভিলেম ভ্যান শেন্ডেল বাংলাদেশের উপর আগ্রহী একজন গবেষক ও লেখক। মিয়ানমার-বাংলাদেশ সীমান্তের গুরুত্ব অনুধাবন করেই শেন্ডেলের এই লেখাটি প্রকাশে উৎসাহী হলাম।

এই সংখ্যায় মোখলেসুর রহমান (সিধু ভাই) এর দীর্ঘ সাক্ষাৎকারটি ছাপানো হলো। সাক্ষাৎকারটি জাতীয় জাদুঘর এর কথ্য ইতিহাস প্রকল্পের আওতায় গৃহীত আমাদের দুই জাতীয় অধ্যাপক সরদার ফজলুল করিম ও মুস্তফা নুরউল ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। সম্প্রতিকালে সরদার ফজলুল করিম মারা গেছেন। তাঁর প্রতি সম্মান জানিয়ে তাঁর গৃহীত এই সাক্ষাৎকারটির ঐতিহাসিক গুরুত্বের কথা বিবেচনায় নিয়ে আমরা অনুস্মৃতি পর্বে এ সাক্ষাৎকার ছাপানোর সিদ্ধান্ত নেই। এই সাক্ষাৎকারে দীর্ঘ সময়ের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের সমাজ অর্থনীতি এবং বিশেষত রাজনৈতিক অন্তরমহলের নানা অপ্রকাশিত কথা পাওয়া যাবে। পাওয়া যাবে আমাদের রাজনৈতিক ইতিহাসের মূল মূল ব্যক্তিদের সম্পর্কে তাঁর মূল্যায়ন ও ব্যক্তি সম্পর্কের নানা বিবরণী। এ সাক্ষাৎকারে পাঠকরা ইতিহাসের নতুনমাত্রা ও উপাদান খুঁজে পাবেন।

নব্বই ও পরবর্তী দশকের বহুল আলোচিত রাজনৈতিক প্রসঙ্গ ও বিষয়াদি নিয়ে তৎকালীন সময়ের লেখা মতিউর রহমানের মন্তব্য কলাম ও উপসম্পাদকীয় কলাম নিয়ে প্রথমা প্রকাশনী কর্তৃক প্রকাশিত গ্রন্থ *মুক্ত গণতন্ত্র রুদ্ধ রাজনীতি* গ্রন্থটিকে গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনায় নিয়েছি। ব্যক্তি মতিউর রহমান দেশের বহুল প্রচারিত দৈনিক পত্রিকা *প্রথম আলোর* সম্পাদক। তাঁর লেখার মাধ্যমে তৎকালীন সময়টি যেমন তুলে ধরেছেন, তুলে ধরেছেন তাঁর নিজস্ব ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ। বই আলোচনায় হাসান শফি আমাদের সমসাময়িককালের দলিল হিসেবে যার একটি নিরপেক্ষ আলোচনার প্রচেষ্টা নিয়েছেন। বাংলাদেশের রাজনৈতিক গবেষণায়, গবেষকদের জন্য দরকারি গ্রন্থ হিসেবে বইটি বিবেচিত হবে।

আজিজুল রাসেল শ্রীনাথ রাঘবনের *১৯৭১ : আ গ্লোবাল হিস্ট্রি অব দ্য ক্রিয়েশন অব বাংলাদেশ* গ্রন্থটি আলোচনা করেছেন। মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে পেশাদার ইতিহাসবিদদের লেখা খুবই অল্প। সে বিচারে এ গ্রন্থটি ইতিহাসসম্মত গবেষণা পদ্ধতি অনুসরণ করে লেখা একটি পান্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থ। তবে শেষ অর্থে এ গ্রন্থে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসকে অনেক সংকীর্ণভাবে দেখা হয়েছে এবং এ অঞ্চলের মানুষের মুক্তির আকাঙ্খাকে খাটো করে দেখা হয়েছে এবং বিশেষভাবে মধ্যবিত্ত শিক্ষিত শ্রেণীর ভূমিকাকে বড় করে দেখা হয়েছে। তৎসত্ত্বেও মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস রচনায় গ্রন্থটি একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন।



প্রপাগান্ডা ও গণমাধ্যম : যুক্তরাষ্ট্র থেকে বাংলাদেশ

সামিয়া রহমান ও সৈয়দ মাহফুজুল হক

সারসংক্ষেপ

যেকোনো গণতান্ত্রিক সমাজের প্রধান চলক তথ্য ও জ্ঞান। জ্ঞানভিত্তিক সমাজে গণমাধ্যম এই তথ্য ও জনগণের মতামত, বিশ্বাস গঠন ও পরিবর্তনে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সমাজের বিভিন্ন স্তরে গণমাধ্যম ক্রমান্বয়ে তার ক্ষমতার বিকাশ ঘটিয়েছে। সাম্প্রতিককালে গোটা বিশ্ব, বিশেষ করে বাংলাদেশেও, গণমাধ্যমের এই এজেন্ডা নির্ধারণ এবং সেই বিষয়ে জনগণের কাছ থেকে সম্মতি অর্জনের প্রচেষ্টা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। বিতর্ক উঠেছে কোনো ঘটনা বা সংবাদের নেতিবাচক প্রচারণার ক্ষেত্রে এখন শুধু সরকার, প্রতিষ্ঠান বা সাংবাদিকের নিজস্ব সেন্সরশিপই কাজ করছে না; বরং গণমাধ্যমের স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে এজেন্ডা নির্ধারণ এবং সেই এজেন্ডার পক্ষে সম্মতি গঠনের জন্য প্রচারণাও অনেক বেশি কার্যকর ভূমিকা রাখছে। এই প্রবন্ধে দেশে রাজনৈতিক অস্থিরতার সুযোগে বা কোনো সংঘাতের সময়ে গণমাধ্যম কীভাবে মানুষের মতামতকে প্রভাবিত করেছে, তা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। বিশেষ করে যুদ্ধের সময়ে মার্কিন গণমাধ্যমগুলোর যুদ্ধের পক্ষে সাফাইদানকারী ভূমিকা এবং বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে একই সঙ্গে আলোচনায় নিয়ে আসা হয়েছে যুদ্ধাপরাধের সর্বোচ্চ শাস্তির দাবিতে গঠিত গণজাগরণ মঞ্চ, তার প্রেক্ষাপটে হেফাজতে ইসলামের আবির্ভাব, মতিঝিলে অবস্থান, যৌথ বাহিনীর 'অপারেশন শাপলা' পরিচালনা ইত্যাদি। বিশেষ উদ্দেশ্যে পরিচালিত গণমাধ্যমের মতামত নির্ধারণ ও সম্মতি উৎপাদনের প্রচেষ্টার বিষয়গুলো এখানে আলোচিত হয়েছে।

মুখ্য শব্দগুচ্ছ : জনমত, সম্মতি উৎপাদন, এজেন্ডা নির্ধারণ, প্রচারণা, গণজাগরণ মঞ্চ/শাহবাগ আন্দোলন, অপারেশন শাপলা, আস্তিক/নাস্তিক, হেফাজতে ইসলাম।

প্রারম্ভিক কথা

গণতান্ত্রিক সমাজে স্বতঃসিদ্ধ বিশ্বাসটি এমন যে মিডিয়া স্বাধীন এবং সত্য উদ্‌ঘাটনে ও তা রিপোর্ট করার প্রতি দায়িত্বশীল। ক্ষমতাশালী গোষ্ঠীগুলো যেভাবে দেখাতে চায়, মিডিয়া কেবল সেভাবেই বাস্তবতাকে প্রতিফলিত করে

না। শুধু তথ্য, বিনোদন ও শিক্ষা দিয়েই নয়; বরং এই তিনটি কাজের মাধ্যমে বলীয়ান হয়ে গণমাধ্যম এখন মানুষের মতামতকে নিয়ন্ত্রণ করছে। গণমাধ্যমভিত্তিক যে তথাকথিত গণতান্ত্রিক সমাজে বর্তমানে আমরা বাস করি, সেখানে জনগণের কাছে পৌঁছানোর জন্য গণমাধ্যমগুলো আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা করে। ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ এবং তা প্রচার ও প্রসারের জন্য গণমাধ্যমগুলো একধরনের অসুস্থ প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হচ্ছে। গণমাধ্যমই এখন এজেন্ডা ঠিক করছে, জনগণ কোন বিষয়ে প্রাধান্য দেবে, আলোচনা করবে।[১] গণমাধ্যমের প্রভাববিষয়ক শুরুর দিকের গবেষণাগুলো, বিশেষ করে ম্যাজিক বুলেট-তত্ত্ব, জনগণের ওপর গণমাধ্যমের সরাসরি প্রভাবকে গুরুত্ব দিয়েছিল। কিন্তু পরবর্তী সময়ে দেখা গেল, জনগণের ওপর গণমাধ্যমের প্রভাব ঠিক ততটা সর্বজনীন নয়। জনগণ তাদের পছন্দমতো গণমাধ্যম ব্যবহার করে। অর্থাৎ জনগণ নিজেরাই ঠিক করে তারা কী দেখবে আর কী বর্জন করবে। কিন্তু সমাজ যত তথ্য ও গণমাধ্যমের ওপর নির্ভরশীল হতে শুরু করে, তথ্য যত বেশি জীবনযাপনের অপরিহার্য অংশ হয়ে উঠতে থাকে, জনগণেরও গণমাধ্যম নির্ভরশীলতা তত বাড়তে শুরু করে। এই নির্ভরশীলতার সুযোগে, বিশেষ করে আধিপত্য ও ক্ষমতা বিস্তারের জন্য গণমাধ্যম স্বউদ্যোগে ভূমিকা নিতে শুরু করে। বলা হয় যে মিডিয়ার ওপর এখন জনগণের কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই—মালিক ও ব্যবস্থাপকেরাই বিজ্ঞাপন আকর্ষণের চেষ্টা করেন এবং নির্ধারণ করেন কী পরিবেশন করা হবে, আর জনগণকে অবশ্যই সেগুলোর ভেতর থেকেই পড়া বা দেখার জন্য বাছাই করতে হয়। জনগণ স্বভাবতই অনেক কিছু পড়ে বা দেখে তার কারণ সেগুলো অনায়াসে পাওয়া যায় এবং সেগুলোই তাদের সামনে তুলে ধরা হয়।[২]

গণমাধ্যম যত সমাজে ক্ষমতার নিয়ামক হয়ে উঠতে থাকে, দেশ ও জনগণের ওপর এর প্রভাবের ধরন তত বদলে যেতে থাকে। 'ওয়াচডগের' পরিবর্তে গণমাধ্যম বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে থাকে, গণমাধ্যম নিজেরাই ইস্যু তৈরি করে, সেই ইস্যুর পক্ষে বা বিপক্ষে নেতিবাচক প্রচারণা চালায় বা চালানোর সুযোগ সৃষ্টি হয়।[৩] সমাজে প্রযুক্তিগত উৎকর্ষ যত বেড়েছে, গণমাধ্যম যত মানুষের কাছাকাছি পৌঁছাতে পেরেছে, তার একচ্ছত্র আধিপত্য তত বেড়েছে। এই ক্ষমতার বিস্তার মানুষের মনোজগতে, আচরণে পরিবর্তন আনছে। কতটুকু সফল হচ্ছে সেটি প্রশ্নসাপেক্ষ কিন্তু গণমাধ্যমের এই ভূমিকা যেমন আমরা পশ্চিমা বিশ্বে দেখেছি তেমনি দেখছি বাংলাদেশেও। বিশেষ করে সংঘাত, সহিংসতা, রাজনৈতিক অস্থিরতা বা যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে গণমাধ্যমের এজেন্ডা নির্ধারণ এবং সেই এজেন্ডার পক্ষে বা বিপক্ষে উদ্দেশ্যমূলক প্রচারণা গণমাধ্যমের ভূমিকাকে করে তুলছে বিভ্রান্তিকর। গণমাধ্যম যখন মানুষের চিন্তার দিক,

পরিসর ঠিক করে দেওয়ার দায়িত্ব গ্রহণ করে, তখন গণমাধ্যমের ভূমিকা হয়ে ওঠে ঈশ্বরের সমতুল্য।

বাংলাদেশে সহিংসতা বা সংঘাতের সময়গুলোতে গণমাধ্যমের ভূমিকা নিয়ে কাজ দেখা যায় না বললেই চলে। আর এটিই অনুপ্রাণিত করেছে হেফাজতে ইসলামের বিকাশ কিংবা সহিংসতা বা রাজনৈতিক অস্থিরতার সময়ে গণমাধ্যমের মতামত বিশ্লেষণে। তবে যুদ্ধের সময় মার্কিন গণমাধ্যমের ভূমিকা নিয়ে প্রচুর কাজ দেখতে পাওয়া যায়। কীভাবে মার্কিন গণমাধ্যমগুলো যুদ্ধের পক্ষে জনগণের মতামতকে নিয়ে যেতে কাজ করছে, তা অনেক গবেষকই দেখিয়েছেন। বলা যায় গবেষক মুইনের (২০১১) কথা।[৪] তিনি ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর টুইন টাওয়ারে হামলা এবং ২০০৩ সালে ইরাক আক্রমণের উদাহরণ টেনেছেন। ঘটনাবহুল এই দুটি সময়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা গণমাধ্যম যে এজেন্ডা মানুষের মধ্যে প্রবাহিত করার চেষ্টা করেছে এবং অনেকাংশে প্রভাবিত করেছে, মানুষের আচরণ বা বিশ্বাসেও তা-ই প্রতিফলিত হয়েছে। মুইন অবশ্য শেষ পর্যন্ত পশ্চিমা গণমাধ্যমের পক্ষে সাফাই গেয়েছেন।

ঠিক উল্টো ছবি দেখা যায় হায়েসের (২০০৫) গবেষণায়।[৫] ১৯৯১ সালের উপসাগরীয় যুদ্ধকে উদাহরণ হিসেবে তুলে ধরে গণমাধ্যমগুলো কীভাবে এজেন্ডা নির্ধারণ করে এবং সেই এজেন্ডার পক্ষে কীভাবে কাজ করে বা সম্মতি আদায় করে, তারই এক অনন্য উদাহরণ বলে মন্তব্য করেন। তিনি আরও জানান, এই যুদ্ধেই প্রথম পেন্টাগন তাদের স্বার্থে গণমাধ্যমকে যুদ্ধের পক্ষে মতামত তৈরির জন্য ব্যবহার করে।

ঠিক একইভাবে বাংলাদেশে বিএনপি ও জামায়াত ঘরানার গণমাধ্যমের ভূমিকা জানাও হবে এই প্রবন্ধের অন্যতম উদ্দেশ্য। প্রতিটি গণমাধ্যমের নিজস্ব নীতিমালা আছে, আছে সম্পাদকীয় আদর্শ বা সিদ্ধান্ত। কিন্তু গণমাধ্যমের নিজস্ব সব সিদ্ধান্ত বা আদর্শের বাইরেও একটি গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি বা চেতনা আছে, সেটি হচ্ছে, সত্যের প্রতি একাগ্রতা ও সত্যের অনুসন্ধান। গণমাধ্যমের স্বাধীনতার নামে সংঘাত, সহিংসতা বা রাজনৈতিক অস্থিরতায় সেই সত্যের চেতনার মৃত্যু বা ধ্বংসের যে সাংবাদিকতা আমরা দেখেছি, তা ওয়াচডগ সাংবাদিকতার পরিবর্তে বিভ্রান্তিমূলক সাংবাদিকতার জন্ম দিয়েছে।

গত এক যুগোর্ধ্ব সময়কালে এলিট আধিপত্যের কৌশল হিসেবে সংবাদ উৎসায়ন ও হুমকি-ধমকি ব্যবস্থাগুলো আরও শক্তিশালী হয়েছে। মিডিয়াতে কেন্দ্রীকরণ ও সাংবাদিকতার কাজে অর্থ বরাদ্দ হ্রাস, আগের যেকোনো সময়ের তুলনায় মিডিয়াকে অধিক নির্ভরশীল করে তুলেছে সেসব প্রাথমিক সংবাদ সংজ্ঞায়নকারীর ওপর যারা একই সঙ্গে সংবাদ বানায় এবং প্রাপ্তিযোগ্য ও সস্তা

সরবরাহের মাধ্যমে মিডিয়ার ব্যয় সাশ্রয় করে দেয়। মিডিয়ার ওপর এখন তাদের নিয়ন্ত্রণ প্রবলতরভাবে জারি আছে।[৬]

তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা

প্রবন্ধটিতে ঐতিহাসিক ঘটনা বিশ্লেষণের মাধ্যমে ইতিহাসের বিভিন্ন ঘটনা ব্যাখ্যা করা হয়েছে। কেস স্টাডির সাহায্যে ঐতিহাসিক ঘটনাকে বিশ্লেষণ করে গণমাধ্যমের ভূমিকা জানার চেষ্টা করা হয়েছে। একই সঙ্গে গবেষণাটির তাত্ত্বিক ভিত্তি হিসেবে যোগাযোগের প্রচারণা বা প্রপাগান্ডা-তত্ত্ব ও গণমাধ্যমের এজেন্ডার সেটিং-তত্ত্ব বেছে নেওয়া হয়েছে। প্রচারণা-তত্ত্ব বলে, গণমাধ্যমকে ব্যবহার করে খুব সুকৌশলে মানুষের মনে নির্দিষ্ট কোনো বার্তা দাগ কাটার প্রক্রিয়াই হলো প্রচারণা। মানুষ যাতে নির্দিষ্ট কোনো তথ্য বা সংবাদ বিশ্বাস করে, সে লক্ষ্যের কথাই বলে প্রচারণা বা প্রপাগান্ডা-তত্ত্ব।[৭] ইতিহাস বলে, জার্মানির শাসক অ্যাডলফ হিটলারের প্রচারণা মন্ত্রণালয় ছিল। যার প্রধান ছিলেন ড. জোসেফ গোয়েবলস। এই তত্ত্ব বিশ্বাস করে, নিজের লক্ষ্যে পৌঁছার জন্য যেকোনো উপায়ে মানুষের মনে প্রভাব ফেলতে হবে। প্রচারণা মডেল মূলধারা মিডিয়ার আচরণ ও তৎপরতার সাধারণ বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করে, তাদের করপোরেটীয় চরিত্র এবং অধিপতি অর্থনৈতিক ব্যবস্থার রাজনৈতিক অর্থনীতিতে সম্পৃক্ততার আলোকে।[৮] প্রচারণা-তত্ত্বের সঙ্গে মিলিয়ে এই প্রবন্ধে আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে বিভিন্ন মার্কিন অভিযানের সময় এবং একই সঙ্গে বাংলাদেশের রাজনীতিতে সংঘাত বা সহিংসতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে হেফাজতে ইসলামের আবির্ভাব, কিছু বিশেষ গণমাধ্যম ও রাজনৈতিক দলের হেফাজতের প্রতি পক্ষপাত ও প্রচারণায় সহায়তাকারী হিসেবে সেসব গণমাধ্যমের উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভূমিকার কথা আলোচনা করা হয়েছে। ৫ মে ২০১৩ রাতে যৌথ বাহিনীর অভিযানে আড়াই থেকে তিন হাজার লোক মারা গেছে বলে প্রচারণা চালায় জামায়াতে ইসলামী, বিএনপি ও একই সঙ্গে হেফাজতে ইসলাম। তাদের সঙ্গে সুর মেলায় বিএনপি-সমর্থক গণমাধ্যমগুলো। তাই যুদ্ধ-সংঘাতের সহিংস পরিস্থিতিতে গণমাধ্যম ও হেফাজতে ইসলামের প্রচারণাকে ব্যাখ্যার জন্য প্রচারণা-তত্ত্বের সাহায্য নেওয়া হয়েছে।

গণমাধ্যম যখন জনগণকে বিশেষ উদ্দেশ্যে পরিচালনা করতে চায়, তাদের চিন্তাধারাকে প্রভাবিত করতে চায় বা স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে ইস্যু নির্ধারণ করে, মানুষও ওই একই ইস্যুকে গুরুত্ব দিয়ে দেখে। এজেন্ডা সেটিং-তত্ত্বের মাধ্যমে সেটিকে বোঝার চেষ্টা করা হয়েছে। এটি শুধু হাল আমলের ঘটনা, তা নয়। সেই ১৯২২ সালেই ওয়াল্টার লিপম্যান তাঁর গ্রন্থ *পাবলিক ওপিনিয়নে* বলেছিলেন, আমাদের মস্তিষ্কে গণমাধ্যম ঘটনার ছবি তৈরি করে। আর নেতা-নেত্রীদের ওই

ছবি সম্পর্কে সজাগ থাকতে হবে। বাংলাদেশে হেফাজতে ইসলামের শাপলা চত্বরে অবস্থান এবং পুলিশের অভিযান নিয়ে মানুষের মনে হেফাজতের কর্মীদের মৃত্যু নিয়ে কিছু গণমাধ্যম ও রাজনীতিবিদ যে ধারণা তৈরি করে এবং আস্তিকতার ও নাস্তিকতার ইস্যুতে যেভাবে পুরো দেশকে দুটি ভাগে ভাগ করে ফেলা হয়েছিল, এর ব্যাপক প্রভাব পড়েছিল জনগণের মধ্যে, দেশের সামগ্রিক রাজনীতিতে। ফলাফল, পাঁচটি সিটি করপোরেশন নির্বাচনে আওয়ামী লীগের পরাজয়। সরকারের উচ্চপর্যায় থেকে বারবার হেফাজতের মিথ্যা প্রচারণার কারণেই এই পরাজয় বলেও মন্তব্য করা হয়েছে।[৯] এখানে হেফাজতের মিথ্যা তথ্যের বিভ্রান্তি, জনমতের অনিশ্চয়তা ওয়াল্টার লিপম্যানের মস্তিষ্কে গণমাধ্যমের ছবি তৈরি করার কথাই মনে করিয়ে দেয়। আর ভিয়েতনাম যুদ্ধ বাদে, প্রতিটি অন্যায় মার্কিন অভিযানকে মার্কিন গণমাধ্যমগুলো দেশের স্বার্থে অভিযান বলে চিত্রিত করেছে। ফলে, মানুষ বিশ্বাস করেছে যে ইরাক কিংবা আফগানিস্তানে সামরিক অভিযান ছিল যৌক্তিক। মার্কিন গণমাধ্যমগুলো যুদ্ধকে দেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বলে পরিবেশন করেছে। জনগণও গণমাধ্যমের কথা বিশ্বাস করে মার্কিন অভিযানকে সমর্থন করেছে।

ভিয়েতনাম যুদ্ধ ও যুদ্ধবিরোধী মার্কিন গণমাধ্যম

ভিয়েতনাম যুদ্ধ শুরু হয় ১৯৫৫ সালে, আর শেষ হয় ১৯৭৫ সালে। সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্নায়ুযুদ্ধের সময় এই আগ্রাসন চালায় মার্কিন সরকার। যুক্তরাষ্ট্র দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ঠিক পরপরই ইন্দোচীনে প্রথমবারের মতো অনুপ্রবেশ করে ফ্রান্সের পুনঃঔপনিবেশীকরণ প্রচেষ্টার সমর্থনে, এরপর একুশ বছর ধরে (১৯৫৪-৭৫) তৎপরতা চালায় ভিয়েতনামের দক্ষিণ অর্ধাংশে এমন একটি সরকার প্রতিষ্ঠা করতে, যার প্রতি সেদেশীয় জনগণের কোনো সমর্থন ছিল না বলে মার্কিন কর্মকর্তা ও বিশ্লেষকেরা বারবার বলেছিলেন। দক্ষিণ ভিয়েতনাম যাতে আরেকটি সমাজতান্ত্রিক ঘরানার দেশ না হতে পারে, তা ঠেকাতেই মূলত আমেরিকার এই আগ্রাসন। কমিউনিস্ট হলেও যাদের ব্যাপক গণভিত্তি ছিল বলে সবাই স্বীকার করে। অন্যদিকে উত্তর ভিয়েতনামের সরকার দুই দেশ একত্র হওয়ার স্বপ্ন দেখতে থাকে। আর আমেরিকার এই আগ্রাসনকে তারা নব্য উপনিবেশ স্থাপন বলেই মনে করতে থাকে।[১০] এই যুদ্ধকে মার্কিন ইতিহাসে সবচেয়ে ঘৃণিত যুদ্ধগুলোর একটি বলে বিবেচনা করা হয়।

ভিয়েতনামে মার্কিন এই তৎপরতাকে আগ্রাসন হিসেবেই বিবেচনা করা যায়। মূলধারা মিডিয়া অবশ্য মার্কিন পলিসিকে কদাচিৎ অন্যভাবে দেখলেও, সব সময় অত্যন্ত নৈতিক ও সুউদ্দেশ্যপ্রণোদিত বিবেচনা করেছে, যদিও তাদের বিচারে এটি

যুদ্ধ-ব্যয়ের ভুল হিসাব-নিকাশভিত্তিক ছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ১৯৭৫ সালে যুদ্ধের সামরিক পর্যায়ের অবসান ঘটানোর পর দেশটির ওপর ১৮ বছরব্যাপী বয়কট আরোপ কার্যকর রাখে, যে দেশটিকে তারা কার্যত ধ্বংস করেছিল। ভিয়েতনামিদের হিসাবমতে যুদ্ধের কারণে তিন মিলিয়ন নিহত, তিন লাখ নিখোঁজ, ৪ দশমিক ৪ মিলিয়ন আহত এবং দুই মিলিয়ন বিষাক্ত রাসায়নিকে আক্রান্ত হয়। এই যুদ্ধে মার্কিন নিহতের সংখ্যা মাত্র ৫৮ হাজার, যা মোট মার্কিন জনসংখ্যার এক শতাংশের এক-দশমাংশ। অন্যদিকে ভিয়েতনামি নিহতের সংখ্যা মোট জনসংখ্যার ১৭ শতাংশ।[১০]

প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ ১৯৯২ সালে বলেন, 'হ্যানয় আজ বুঝতে পেরেছে, অতীতের জন্য কোনো শাস্তির হুমকি না দিয়ে আমরা শুধুই উত্তর চেয়েছি।' অর্থাৎ 'ভিয়েতনাম এমন কাণ্ড করেছে, যার কারণে তারা শাস্তি পাওয়ারই উপযুক্ত, কিন্তু সেটা না করে তারা যুদ্ধে নিখোঁজ সেনাদের সম্পর্কে উত্তর চেয়েছে শুধু।' *নিউইয়র্ক টাইমস*-এর কূটনৈতিক ভাষ্যকার লেসলি গেলব ভিয়েতনামকে অপরাধী শ্রেণীতে স্থান দেন, কারণ তারা আমেরিকানদের খুন করেছে।[১১]

১৯৭৫ সালে যুদ্ধ পরিসমাপ্তির পর মার্কিন সংস্কৃতিতে তা এক ক্রমবিকাশমান অস্বস্তি হিসেবে জারি আছে। আধিপত্যকারী এলিটদের বিবেচনায় এ যুদ্ধ এমন একটি সময়ের প্রতিনিধিত্ব করে, যখন জাতীয় নীতির বিরুদ্ধতা এবং সেই সঙ্গে সমাজের প্রাক-উদাসীন অংশের উত্থান গণতন্ত্রের সংকট রূপে আবির্ভূত হয়। ওই সব বিশৃঙ্খল জনগোষ্ঠী এবং ভিন্নমতাবলম্বীকে এমনভাবে দেখা হয় যে তারা সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক অবকাঠামো ক্ষতিগ্রস্ত করেছে এবং বলপ্রয়োগ নীতির বিরুদ্ধে যৌক্তিক বাধা গড়ে তুলেছে, যা কিনা ভিয়েতনাম লক্ষণ হিসেবে বিবেচিত। প্রচারণা মডেল আমাদের আন্দাজ করতে বলে যে মূলধারা মিডিয়ার যুদ্ধ পর্যালোচনায় এলিট দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত হয়, ১৯৬০-এর দশককে চিত্রায়িত করা হয় একটা কালো যুগ হিসেবে এবং যুদ্ধে মার্কিন ভূমিকাকে দেখা হয় নিদেনপক্ষে মহৎ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত কিন্তু ব্যর্থতায় পর্যবসিত।[১২]

ভিয়েতনাম যুদ্ধে মিডিয়ার সামান্য ভিন্নমত ছিল সরকারের পলিসির সঙ্গে (১৯৬৮ সাল থেকে কিছু এলিটও যুক্ত হয়েছিলেন সমালোচনামুখর জনগোষ্ঠীর সঙ্গে)। মার্কিন পলিসির পক্ষে সাফাইদানকারীদের যুক্তি ছিল, এটি মিডিয়া পণ্ডিতদের সাময়িক নৈরাশ্যবাদিতা। তারা কৌশলগত বিতর্কের দৃষ্টান্ত তুলে ধরে বলতে চেয়েছে, মিডিয়ার অবস্থান ছিল বৈরীভাবাপন্ন. এমনকি মিডিয়া যুদ্ধে পরাজয় ডেকে এনেছে।

ষাটের দশকজুড়ে মিডিয়া বিশ্বস্তভাবে রাষ্ট্রীয় সহিংসতার প্রতি সহযোগিতা করে। ১৯৬৭ সাল নাগাদ সর্বগ্রাহ্য অভিমত বদলে যেতে শুরু করে এবং জনগণ

শান্তিবাদী-যুদ্ধবাদী অভিজাতদের অভিমতকে উপেক্ষা করতে শুরু করে। এর অনেক পরে ১৯৮২ সালেও ৭২ শতাংশ জনগণ (কিন্তু স্বল্পসংখ্যক নীতিনির্ধারক বা অভিমত মোড়ল এবং মার্কিন বুদ্ধিজীবী এলিটদের একজনও নয়) ভিয়েতনাম যুদ্ধকে ভুলের চেয়েও বাড়তি কিছু মনে করে। 'যুদ্ধটা যে মূলগতভাবে অন্যায় ও অযৌক্তিক', জনগণ ও নেতাদের অভিমতের এই ফারাক ১৯৮৬ পর্যন্ত বজায় থাকতে দেখা যায়।[১৩]

শত্রুরাষ্ট্রের দ্বারা আক্রান্ত বনাম যুক্তরাষ্ট্র

১৯৮৪ সালে পোল্যান্ডীয় কমিউনিস্টদের বলি ধর্মযাজক জার্জি পপিলাজকো মার্কিন সমর্থনপুষ্ট রাষ্ট্র এল সালভাদরে ১৯৮০ সালে নিহত ধর্মযাজক অস্কার রোমেরোর তুলনায় কেবল বেশি কাভারেজই লাভ করেননি, বরং মার্কিন সমর্থনপুষ্ট রাষ্ট্রগুলোতে নিহত শতধর্মীয় কর্মীর সর্বসম্মিলিত কাভারেজের তুলনায় বেশি কাভারেজ পান, যদিও ওই বলিদের মধ্যে খোদ আটজন ছিলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক। এই পক্ষপাত মার্কিন নীতিনির্ধারকদের জন্য খুব লাভজনক ছিল, কারণ শত্রুরাষ্ট্রের আক্রান্তদের ওপর বিপুল মনোযোগদানের সুবাদে ওই সব রাষ্ট্রের চরিত্র দানবীয়-দুষ্ট দেখায় এবং মার্কিন বৈরিতা ন্যায্য হয়ে ওঠে। পপিলাজকো এবং ল্যাটিন আমেরিকার শতধর্মীয় বলির কাভারেজে অতীতে যে ব্যাপক রাজনৈতিক পক্ষপাত দেখা গেছে, সে চর্চা আজও জারি আছে, মিডিয়াতে ১৯৯০-এর দশকে 'গণহত্যাযজ্ঞ' শব্দের ব্যবহার থেকেই তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। 'গণহত্যা' একটি বিদ্বেষমূলক প্রত্যয়, যা শত্রুদের ক্ষেত্রে হরহামেশা প্রয়োগ হয়। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা তার মিত্র শাসকগোষ্ঠীর দ্বারা কদাচিৎ প্রয়োগ হয়। তাই ১৯৯০-এর দশকে সাদ্দাম হোসেন ও ইরাক মার্কিন আক্রমণের লক্ষ্য হয়ে ওঠে, কিন্তু তুরস্ক মার্কিন মিত্র হওয়ায় সেই বছরগুলোতে কুর্দিদের বিরুদ্ধে জাতিগত শুদ্ধি অভিযানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রধান অস্ত্র সরবরাহক হওয়ায় সাবেক মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার গেলব্রেথ বলেছিলেন, 'যদিও তুরস্ক সেদেশীয় কুর্দিদের ওপর নিপীড়ন চালাচ্ছে, কিন্তু সাদ্দামের দ্বারা ইরাকি কুর্দিদের ওপর পরিচালিত "নব্য গণহত্যাযজ্ঞ" রোধে মার্কিন নেতৃত্বাধীন মিশনে তুরস্কের সহযোগিতা আবশ্যক।' মিডিয়ার এই প্রত্যয় থেকে কে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শত্রু আর কে মিত্র, তা সহজেই শনাক্ত করতে পারা যায়। কসোভো-আলবেনীয়দের বিরুদ্ধে যুগোস্লাভিয়ার নিপীড়নের অভিযোগে ১৯৯৯ সালে দেশটির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ন্যাটোভুক্ত মিত্র দেশগুলোর সরকারি অভিযোগনামা মিডিয়াতেও প্রতিফলিত হয়, সেই সঙ্গে প্রতিনিয়ত এই নিপীড়নকে 'গণহত্যাযজ্ঞ' আখ্যায়িত করা হয়।[১৪]

উপসাগরীয় যুদ্ধ

যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে বাজেট ঘাটতি, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ও অর্থনৈতিক মন্দা খানিকটা বেকায়দায় রেখেছিল সিনিয়র বুশ প্রশাসনকে। আর এই যুদ্ধে গণমাধ্যমের সহানুভূতিশীল ভূমিকা ও যুদ্ধের প্রচারণা বেকায়দা অবস্থা থেকে শক্ত অবস্থানে নিয়ে যায় বুশ প্রশাসনকে। আর এই প্রচারণার ক্ষেত্রে খানিকটা কৌশলী ছিল যুক্তরাষ্ট্র। শুরুতে সাদ্দাম হোসেনকে নিয়ে শোরগোল তোলে সরকার। সে সময় আমেরিকার অনেক মানুষই জানত না কে এই সাদ্দাম হোসেন। গণমাধ্যম সাদ্দাম হোসেনকে যুদ্ধবাজ হিসেবে প্রচার করতে থাকে, অনেকটা অ্যাডলফ হিটলারের মতোই। তাই গণমাধ্যমে যুদ্ধের পক্ষের সংবাদ ও বুশ প্রশাসনের অবস্থান জনমতকে উপসাগরীয় যুদ্ধের প্রতি নিয়ে যায়। মানুষ ভাবতে থাকে, সাদ্দামকে কুয়েত থেকে না হটালে বোধ হয় মার্কিন নিরাপত্তাই হুমকির মুখে পড়বে।[১৫]

মূলত উপসাগরীয় যুদ্ধকে মানুষের কাছে নিয়ে গেছে মার্কিন টেলিভিশন। বিশেষ করে সিএনএন ও ফক্স নিউজের ভূমিকা এই যুদ্ধে ছিল মার্কিন সরকারের পক্ষে। কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডগলাস কেলনার এই যুদ্ধকে বর্ণনা করেছেন 'আকর্ষণীয় বর্ণনার যুদ্ধ' হিসেবে। টিভি চ্যানেল সিবিএসের খবরের নীতির সঙ্গে মার্কিন সরকারের নীতি মিলে গেছে বলেও অধ্যাপক কেলনার (১৯৯২) মন্তব্য করেছেন।[১৬] তিনি তাঁর বই *দ্য পার্সিয়ান গালফ টিভি ওয়ার*-এ আরও বলেছেন, মূলত সিএনএনই মার্কিন জনগণের মনস্তত্ত্বকে যুদ্ধের দিকে নিয়ে গেছে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা যুদ্ধের ছবি, যুদ্ধের দামামা বাজানো স্টিং আর সরাসরি সম্প্রচার—সবকিছু মিলেই সিএনএন মার্কিন জনগণের মনে যুদ্ধকে আকর্ষণীয় করে কর্ষণ করেছে। মানুষ যুদ্ধের বাস্তব পরিবেশনা দেখতে হুমড়ি খেয়ে পড়েছে টিভিতে। এই যুদ্ধ ছিল তাই অনেকটা ম্যারাথন দৌড়ের মতো। এই প্রতিযোগিতার কারণে দর্শকের মনে উদ্বিগ্নতা তৈরি হয়ে তা কাজ করেছে নেশার মতো। সর্বশেষ খবর জানার জন্য মানুষ ব্যস্ত থেকেছে। সবচেয়ে বড় কথা হলো, সিএনএন উপসাগরীয় যুদ্ধ শুরুর ১০ বছর আগে থেকেই এই ধরনের সংঘাত কাভার করে আসছে। যুক্তরাষ্ট্র ইরাক আক্রমণের আগেই সিএনএন তার যাবতীয় সরঞ্জাম নিয়ে তৈরি ছিল। যার ফলে চ্যানেলটি যুদ্ধ শুরু হওয়ার দিন থেকেই সরাসরি সম্প্রচার শুরু করে। একই সঙ্গে যুদ্ধের যৌক্তিকতা কর্ষণ করতে থাকে মানুষের মধ্যে। যাকে অনেক যোগাযোগবিদ সিএনএন ইফেক্ট বা সিএনএন প্রভাব বলেছেন। মার্টিন ম্যানিং ও অন্যান্য (২০১১)[১৭] তাঁদের বিখ্যাত *এনসাইক্লোপিডিয়া অব মিডিয়া অ্যান্ড প্রপাগান্ডা ইন ওয়ারটাইম আমেরিকা* বইয়ে বলেন, '১৯৯০ সালের মধ্যভাগ থেকেই পেন্টাগনের কর্মকর্তারা সিএনএন

ইফেক্টের কথা স্বীকার করতে থাকেন। আর চ্যানেলটির এই ধরনের খবর পরিবেশন যুদ্ধের সময় জনমতের ব্যবস্থাপনার নতুন এক মাত্রা যোগ করে। এই খবর পরিবেশন সরকারকে বাধ্যই করে দ্রুত ও একপক্ষীয় পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য। কোনো কোনো সমালোচক মনে করেন, সিএনএনের যুদ্ধের খবর অধিকাংশ সময়ই দর্শকের মধ্যে একপক্ষীয় দৃষ্টিভঙ্গি কর্ষণ করে। সিএনএন ইফেক্ট অন্য চ্যানেলের সঙ্গে অনৈতিক প্রতিযোগিতা নিয়ে আসে। এই প্রতিযোগিতা এমন সংবাদ সম্প্রচারে চ্যানেলগুলোকে উৎসাহিত করে, যার কোনো ভিত্তিই নেই।'

সেই সময়ে সংঘাত বা যুদ্ধকালীন সংবাদ পরিবেশনে বেশ নতুনত্ব আসে। প্রতি ঘণ্টায় ঘণ্টায় প্রচারিত হতে থাকে জেনারেলদের সংবাদ সম্মেলন। লিঞ্জার ও সাইমন (১৯৯৩) জানান,[১৮] যেসব দর্শক টিভির ওপর যুদ্ধের সংবাদের জন্য বেশি নির্ভর করেছে, তারা যুদ্ধের কূটনৈতিক সমাধানের চেয়ে সামরিক সমাধানকে বেশি কার্যকর বলে মনে করেছে। টিভি দর্শকেরা যুদ্ধের ছবি দেখে, যুদ্ধকেই প্রাধান্য দিয়েছে, সমর্থন দিয়েছে। ১৯৯০ সালের নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে প্রায় ৫৩ শতাংশ আমেরিকার নাগরিক কুয়েত থেকে ইরাককে হটানোর জন্য মার্কিন সামরিক অভিযানকে সমর্থন দেয়। অর্থাৎ উপসাগরীয় যুদ্ধের জন্য সিনিয়র বুশের পক্ষে প্রায় অর্ধেকেরও বেশি মার্কিন নাগরিকের সমর্থন ছিল।[১৯]

টুইন টাওয়ার আক্রমণ ও ইসলামভীতি

১৯৪১ সালে পার্ল হারবার আক্রমণের পর টুইন টাওয়ারে আক্রমণই ছিল মার্কিন ভূখণ্ডের একমাত্র সরাসরি হামলা। চারটি বিমানকে কবজা করে আল-কায়েদার সদস্যরা আত্মঘাতী হামলা করে টুইন টাওয়ার ও পেন্টাগনে। আরেকটি বিমান গিয়ে আছড়ে পড়ে পেনসিলভানিয়ায়। বিমানের সব আরোহী মারা যান। আর ভবনধসে মারা যান অনেকে। আল-কায়েদার এই হামলায় হতাহতের সংখ্যা ছিল প্রায় তিন হাজার। অর্থনৈতিক, সামাজিক বা সামরিক শক্তির জোরে সমগ্র বিশ্বে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠাকারী বা আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টায় নিমগ্ন মার্কিন সাম্রাজ্যের জন্য এই আঘাত ছিল অকল্পনীয় ও অবমাননাকর। এই আক্রমণ যুক্তরাষ্ট্রসহ পশ্চিমা দেশগুলোতে মুসলমানদের প্রতি প্রতিহিংসার ক্ষেত্র তৈরি করে। মুসলমানদের সন্ত্রাসী হিসেবেই চিহ্নিত করা হয় গণমাধ্যমে। স্মিথ (২০০৯) টুইন টাওয়ারে হামলার পর মার্কিন গণমাধ্যমে ইসলামের চিত্রায়ণ নিয়ে তাঁর গবেষণা প্রবন্ধে জানান, ইসলামকে একটি সহিংস ধর্ম হিসেবে এবং মুসলমানদের সন্ত্রাসী হিসেবে চিহ্নিত করতে ভূমিকা রেখেছে পশ্চিমা গণমাধ্যম। বিশেষ করে এর জন্য অনেকাংশে দায়ী মার্কিন গণমাধ্যম। পশ্চিমা বিশ্বে বা মার্কিন সাম্রাজ্যে প্রবেশ বা

বসবাস চরম জটিল ও অমানবিক হয়ে ওঠে মুসলমানদের জন্য। শুরু হয় মুসলমানদের ব্যাপক ধরপাকড়। শুধু পশ্চিমা বিশ্বে নয়, মুসলমানপ্রধান দেশগুলোর প্রতিও পশ্চিমা বিশ্ব আগ্রাসী হয়ে ওঠে। বিশেষ করে যে মুসলিম দেশগুলো মহাশক্তিধর মার্কিন সাম্রাজ্যের তাঁবেদার ছিল না তাদের প্রতি পশ্চিমা সরকার এবং গণমাধ্যম হয়ে ওঠে খড়্গহস্ত। পরিকল্পিতভাবে পশ্চিমা গণমাধ্যমগুলো ইসলামবিদ্বেষী প্রচারণা শুরু করে। এই ইসলামভীতি জুনিয়র বুশের ইরাক আক্রমণ আরও যৌক্তিক ও দ্রুততর করে তোলে।[২০]

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিভার্সিটি অব নর্থ ক্যারোলাইনার গবেষক ক্রিস্টোফার বেইল *নিউইয়র্ক টাইমস*, *ইউএসএ টুডে* ও *ওয়াশিংটন টাইমস*কে তাঁর গবেষণার জন্য বাছাই করেন।[২১] তিনি টেলিভিশন চ্যানেল হিসেবে সিবিএস, সিএনএন ও ফক্স নিউজকে বাছাই করেন আধেয় বিশ্লেষণের জন্য। তিনি প্রায় এক হাজার ৮৪টি সংবাদ বিজ্ঞপ্তি ও ৫০ হাজার ৪০৭টি পত্রিকার সংবাদের বিশ্লেষণ করেন। এই বিশ্লেষণ থেকে তিনি এই উপসংহারেই এলেন, টুইন টাওয়ারে হামলার পর মার্কিন গণমাধ্যমে মুসলমানরা অনেক বেশি আলোচনায় এসেছে। আর এই আলোচনার বড় অংশজুড়েই ছিল নেতিবাচক আলোচনা।

যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিভার্সিটি অব নেব্রাস্কা লিঙ্কনের শিক্ষক লুকিয়ে সারাউব গণমাধ্যমের ইসলামভীতি নিয়ে বলেন,[২২] 'নয়-এগারোর পর মুসলমানরা অনেক বেশি গণমাধ্যমে জায়গা পেতে থাকে, যা এর আগে কখনোই তারা পায়নি। আর মুসলমানদের জন্য বেশ কিছু ছাঁচীকরণ বা স্টেরিওটাইপ ধারণা প্রয়োগ করা হয়, যার মধ্যে ছিল মুসলিম সন্ত্রাসী কিংবা আরব সন্ত্রাসী। এসব ধারণা ইসলাম ও তার অনুসারীদের বিরুদ্ধে ভয় ও ভুল ধারণাই তৈরি করেছে।'

ইরাক আগ্রাসন

যখন মার্কিন সমাজে ইসলামকে সন্ত্রাসী একটি ধর্ম হিসেবে রূপায়িত করা হয়ে গেছে, ঠিক সেই সময়ে জুনিয়র বুশ সাদ্দাম হোসেনকে সরানোর জন্য ইরাক আক্রমণ করেন। ২০০৩ সালে ইরাকে আগ্রাসন চালায় যুক্তরাষ্ট্র। মূলত দুটি ভাগে দেশটিতে অভিযান চালায় যুক্তরাষ্ট্র। ২০০৩ সালের ২০ মার্চ মার্কিন সেনাবাহিনী সাদ্দাম হোসেনকে হটাতে অভিযান চালায়। এরপর আরও বড় পরিসরে মার্কিন সেনাবাহিনী মানববিধ্বংসী মারণাস্ত্র ধ্বংস করতে অভিযান শুরু করে। মার্কিন সরকার ইরাকে নিউক্লিয়ার অস্ত্র আছে, এ প্রচারণা চালায়। পশ্চিমা গণমাধ্যমগুলো সরকারের এই প্রচারণার বিস্তার ঘটাতে এবং ইরাক যুদ্ধকে ন্যায্য করতে সহযোগিতা করতে থাকে।[২৩] মানববিধ্বংসী মারণাস্ত্র ধ্বংসের নামে (পরবর্তী সময়ে যে অস্ত্রের অস্তিত্ব পাওয়া যায়নি)[২৪] জুনিয়র বুশ ও তাঁর প্রশাসন

ইরাক আক্রমণ করে। ইরাকে অভিযানের আগে জর্জ ডব্লিউ বুশ এই অস্ত্র ধ্বংসের জন্য সাফাই গান। এখনো হোয়াইট হাউসের আর্কাইভে বুশের এসব বাণী খুঁজে পাওয়া যায়। অভিযানের ঠিক আগে জুনিয়র বুশ মার্কিন জনগণকে তেমনি এক ভাষণে জানান,[২৫] 'এই মুহূর্তে ইরাক তার রাসায়নিক জীবাণু অস্ত্র বাড়াচ্ছে এবং তার প্রযুক্তির উন্নতি সাধন করছে।' পিছিয়ে ছিলেন না জুনিয়র বুশের উপদেষ্টা ও সহযোগীরা। তাঁরাও মিথ্যা মানববিধ্বংসী মারণাস্ত্রকে সত্যে পরিণত করতে প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছিলেন, একই সঙ্গে টুইন টাওয়ারের হামলার জন্য দায়ী আল-কায়েদাকে সাদ্দাম হোসেনের সঙ্গে মেলানোর চেষ্টা করছিলেন। অর্থাৎ তাঁরা রাসায়নিক অস্ত্রের সঙ্গে নয়-এগারো নিয়ে মার্কিন জনগণের মনে কড়া নাড়তে চাইছিলেন। সে সময়কার মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট ডিক চেনি এক সংবাদ সম্মেলনে বলেন,[২৬] 'আমরা জানি, তার (সাদ্দাম হোসেন) সঙ্গে নানা সন্ত্রাসী সংগঠনের সম্পর্ক আছে, তার মধ্যে আল-কায়েদাও আছে। অর্থাৎ বুশ প্রশাসন মার্কিন জনগণের মধ্যে ইরাকের গণবিধ্বংসী মারণাস্ত্র নিয়ে একটি ধোঁয়াশা তৈরি করে। আগের উপসাগরীয় যুদ্ধের মতো এবারও মার্কিন গণমাধ্যম ক্ষমতাবানদেরই পক্ষ নিয়েছিল। যুদ্ধ শুরুর আগেই গণমাধ্যমগুলো যুদ্ধের দামামা বাজিয়ে দিয়েছিল তাদের সংবাদের মাধ্যমে। টিভি চ্যানেল এমএসএনবিসি বলেছিল, "কাউন্ট ডাউন ইরাক", পিছিয়ে ছিল না সিবিএস, তারা সংবাদের বিশেষ সেগমেন্টের নাম দিয়েছিল "শোডাউন উইথ সাদ্দাম"। পশ্চিমা গণমাধ্যমগুলো অতি উৎসাহী ভূমিকায় "ওয়ার অ্যাগেইনস্ট টেররিজম"-এর যাত্রা শুরু করে।'

এই আগ্রাসনের সঙ্গে গণমাধ্যমের এজেন্ডা সেটিংয়ের সঙ্গে সহসম্পর্ক রয়েছে বলে গণমাধ্যম বিশেষজ্ঞরা তাঁদের নানা গবেষণায় বলেছেন। বিশেষ করে মুইন (২০১১) তাঁর গবেষণায় বলেন,[২৭] ২০০৩ সালে ইরাক আক্রমণের পেছনে গণমাধ্যমের বিশেষ একটি ভূমিকা রয়েছে। গণমাধ্যম এখানে মানুষের মধ্যে যুদ্ধের বিষয়ে মতামত তৈরি করেছে, আর মানুষ ওই মতামতের কারণে ইরাক আক্রমণকে সমর্থন দিয়েছে। ইরাক আক্রমণের ঠিক এক বছর আগে ২০০২ সালে বুশ প্রশাসনের মিথ্যাচার বাড়ে। আর ঠিক ওই সময়ে প্রায় ৬০ শতাংশ মার্কিন নাগরিক ইরাক আক্রমণকে সমর্থন করে। ২০০৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে আক্রমণের ঠিক আগে আল-কায়েদা, মানববিধ্বংসী মারণাস্ত্র ও ইরাকের রাসায়নিক অস্ত্র নিয়ে জর্জ ডব্লিউ বুশ ও তাঁর সভাসদেরা ১৪০টি বক্তব্য দেন। ঠিক ওই সময় মার্কিন টিভি চ্যানেল সিবিএস ও *নিউইয়র্ক টাইমস* পত্রিকার জরিপে দেখা যায়, শতকরা ৮৫ ভাগ মার্কিন নাগরিক বিশ্বাস করতে থাকে, ইরাকে মানববিধ্বংসী মারণাস্ত্র আছে। ইরাক আগ্রাসনে আগেরবারের সিএনএনের মতোই

ভূমিকা পালন করে ফক্স নিউজ। একটি গবেষণায় দেখা গেছে, ইরাক যুদ্ধ নিয়ে সবচেয়ে বেশি ভুল ধারণা পোষণ করে ফক্স নিউজের দর্শকেরা। ইরাক যুদ্ধের ভুল তথ্যকে সত্য বলেই মেনেছে ফক্স নিউজের প্রতি ১০০ জনের মধ্যে ৬৭ জন দর্শক। সেখানে সিএনএনের শতকরা ৩১ ভাগ দর্শক তার চ্যানেলের ভুল তথ্যকেই বিশ্বাস করেছে। অর্থাৎ ফক্স নিউজ যুদ্ধের সংবাদকে এতটাই নিজের মতো করে প্রচার করেছে, যার কারণে তার দর্শকেরা ভুল তথ্যকেই সবচেয়ে বেশি বিশ্বাস করেছে। এর একটি বড় কারণও রয়েছে। আর তা হলো ফক্স নিউজের মালিক রুপার্ট মারডক, যিনি আবার যুদ্ধবাজ বলেও পরিচিত। যুক্তরাষ্ট্রের ইরাক আক্রমণের সহযোগী হতে রুপার্ট মারডক সেই সময়কার যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ারকে ফোন করে চাপও দিয়েছিলেন। মালিকের এই যুদ্ধবাজ মনোভাব ফক্স নিউজের আধেয়কে প্রভাবিত করেছে। নয়-এগারোর ঠিক পরপরই চ্যানেলটি তার পর্দার বাঁ কোনায় মার্কিন পতাকা দিয়ে রাখে। আর এই অ্যানিমেটেড পতাকার সঙ্গে ইরাক আক্রমণের পর চ্যানেলটির নিচে টিকার যেতে থাকে 'অপারেশন ইরাকি ফ্রিডম'। যুদ্ধের দামামা সুকৌশলে বাজিয়ে যুদ্ধের পক্ষে মতামত তৈরি করেছে ফক্স নিউজ।[২৮]

২০০৩ সালের গ্রীষ্মে ইউনিভার্সিটি অব মেরিল্যান্ডে ইন্টারন্যাশনাল পলিসি অ্যাটিচিউড প্রোগ্রাম ও জরিপ সংস্থা নলেজ নেটওয়ার্ক জনগণের মতামত ও ভুল অনুধাবন নিয়ে একটি গবেষণা পরিচালনা করে। এই গবেষণার উদ্দেশ্য ছিল জনগণের মধ্যে ভুল মত প্রচারের জন্য গণমাধ্যম কেমন ভূমিকা পালন করেছে, তা জানা। পুরো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তিন হাজার ৩৩৪ জনের ওপর এই জরিপ চালানো হয়। জনমনের ভয়ানক ভুল ধারণা এই অনুধাবনে বের হয়ে আসে।[২৯] যেমন :

* শতকরা ৪৯ ভাগ মার্কিন বিশ্বাস করে, আল-কায়েদার সঙ্গে ইরাক কাজ করেছে।
* শতকরা ২২ ভাগ বিশ্বাস করে, ইরাকে গণবিধ্বংসী মারণাস্ত্র পাওয়া গেছে।
* শতকরা ২৩ ভাগ বিশ্বাস করে, বিশ্বজনমত ইরাক আক্রমণের ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে ছিল।
* সর্বোপরি শতকরা ৬০ ভাগ ওপরের যেকোনো একটি ভুল ধারণায় বিশ্বাস করে।

গ্যান্ট জেফরি তাঁর *ওয়ার অন টেরর : আনফোল্ডিং বাইবেল প্রফেসি* বইতে মন্তব্য করেছিলেন, ইরাক যুদ্ধ ছিল আমেরিকার বিপক্ষে প্রতিশোধ। উপসাগরীয়

যুদ্ধে সাদ্দামের পরাজয় আমেরিকার প্রতি তার ঘৃণা বাড়িয়ে দিয়েছিল বহুগুণে। ইরাক এমন একটি দেশ, যার নয়-এগারো হামলায় অংশ নেওয়ার মতো প্রভাব, শক্তি, সামর্থ্য ও সামরিক সক্ষমতা আছে। প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেনের মূল লক্ষ্য ছিল আমেরিকার বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেওয়া, আমেরিকার অর্থনৈতিক সক্ষমতাকে ধ্বংস করে ফেলা। জেফরির মতে, সাদ্দাম হোসেনের লক্ষ্য ছিল আরব বিশ্বের মহান নেতা হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করা। তাঁর স্বপ্ন ছিল সুপ্রাচীন ব্যাবিলনীয় সাম্রাজ্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা এবং উপসাগরীয় অঞ্চলের সবচেয়ে ক্ষমতাধর সামরিক শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠা পাওয়া। জেফরি তাঁর বইতে উল্লেখ করেন, আমেরিকান সরকার শতভাগ নিশ্চিত যে ইরাক ওসামা বিন লাদেনের আল-কায়েদার সঙ্গে জড়িত এবং তারা আমেরিকার বিভিন্ন অংশে বিধ্বংসী সিরিজ সন্ত্রাসী হামলা চালানোর পরিকল্পনায় নিয়োজিত। ইরাক ছিল নিশ্চিতভাবে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য ও ইসরায়েলের জন্য হুমকি। সাদ্দাম তাঁর সব শক্তি, সামর্থ্য ও অর্থ নিয়োজিত করেছিল বিধ্বংসী অস্ত্র নির্মাণে, যে অস্ত্র তারা ব্যবহার করবে আমেরিকার বিরুদ্ধে। পশ্চিমের অবশ্যই এখন সাদ্দাম এবং তাঁর সামরিক শক্তিকে দেখে নিতে হবে।[৩০]

নয়-এগারো হামলার পাঁচ ঘণ্টার মধ্যে মার্কিন ডিফেন্স সেক্রেটারি ডোনাল্ড রামসফেল্ড বলেছিলেন, 'আমার আগ্রহ এখন সাদ্দামকে আঘাত করা।... ব্যাপকভাবে সব ধ্বংস করে দাও, ঘটনার সঙ্গে সম্পর্ক থাকুক আর না-ই থাকুক।' ২০০১ সালের নয়-এগারো হামলার ১০ দিন পর প্রেসিডেন্ট বুশকে নিশ্চিতভাবে জানানো হয়, মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থার কাছে কোনো রকম তথ্যপ্রমাণ নেই যে সাদ্দাম হোসেন নয়-এগারো হামলার সঙ্গে জড়িত বা আল-কায়েদার সঙ্গে সাদ্দাম জড়িত, এমন তথ্যও তাদের কাছে নেই। ২০০২ সালের ফেব্রুয়ারিতে প্রকাশিত মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থার ডিফেন্স ইন্টেলিজেন্স টেররিজম রিপোর্টে সাদ্দামের সঙ্গে আল-কায়েদার সঙ্গে ষড়যন্ত্রের কোনো তাৎপর্যপূর্ণ প্রমাণ পাওয়া যায়নি। কিন্তু বুশ প্রশাসন ক্রমাগতভাবে নয়-এগারো হামলার জন্য সাদ্দামকেই দায়ী বলে প্রচার করেছে এবং পশ্চিমা মিডিয়াগুলো সেই তথ্য ক্রমাগতভাবে জনগণকে ইনজেক্ট করেছে। বুশ প্রশাসন এভাবেই ইরাকে আগ্রাসনকে ন্যায্যতা দান করেছে এবং জনগণকে নিয়ে এসেছিল তাদের পক্ষে।

কিন্তু পুলিৎজার পুরস্কার বিজয়ী সাংবাদিক রন সাসকিন্ড রিপোর্ট করেন যে হোয়াইট হাউসের নির্দেশে সিআইএ নয়-এগারো হামলায় মুসলিম সন্ত্রাসীদের সঙ্গে ইরাক জড়িত, তারিখ পিছিয়ে এমন জালিয়াত ডকুমেন্ট তৈরি করে। সিআইএ সেই নির্দেশনা মেনে জালিয়াতি করে এবং সেই জালিয়াত ডকুমেন্ট ব্যবহৃত হয় ইরাকের বিরুদ্ধে যুদ্ধকে ন্যায্যতা দেওয়ার পক্ষে। সাসকিন্ড আরও প্রকাশ করেন

যে বুশ প্রশাসনের কাছে উচ্চপদস্থ ইরাকি গোয়েন্দা সংস্থার সূত্রে তথ্য ছিল যে ইরাকে কোনো ব্যাপক বিধ্বংসী অস্ত্র ছিল না। মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থার কাছে পর্যাপ্ত তথ্য ও সময় ছিল এই আগ্রাসন বন্ধ করার।[৩১]

২০০০ থেকে ২০০৪ সাল পর্যন্ত বিবিসি ওয়ার্ল্ড সার্ভিসের মহাপরিচালক ছিলেন গ্রেগ ডাইক। ইরাক আক্রমণের সময় মার্কিন গণমাধ্যমগুলোর সমালোচনা করে তিনি বলেন, 'মার্কিন গণমাধ্যমগুলোর অবস্থান স্পষ্টতই যুদ্ধের পক্ষে অবস্থান নিয়েছে তা নয়, তাদের মধ্যে অনেকেই অতিমাত্রায় দেশপ্রেম দেখাচ্ছে এবং যুদ্ধের পক্ষে জনমত তৈরি করছে।' সিএনএনকে ছাড়িয়ে এক নম্বরে যেতে ফক্স নিউজ মার্কিন প্রশাসনের পক্ষে অবস্থান নিয়েছে এবং যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে বড় রেডিও নেটওয়ার্ক ইউএস কেব্‌ল নিউজ নেটওয়ার্কিং যুদ্ধের পক্ষে দেশজুড়ে র‍্যালি করেছে বলেও সমালোচনা করেন গ্রেগ ডাইক (হাফেজ, ২০০৩)[৩২]।

২০০৫ সালের ১৬ ডিসেম্বর বুশ স্বীকার করেন, নয়-এগারো হামলার সঙ্গে সাদ্দাম জড়িত হওয়ার কোনো প্রমাণ তাঁদের ছিল না। তারপরও বুশ এবং ডিক চেনি (ভাইস প্রেসিডেন্ট, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র) ইরাক যুদ্ধের ন্যায্যতার পক্ষে সাফাই দিতে থাকেন। ২০০৯ সালে ডিক চেনি শেষ পর্যন্ত স্বীকার করেন, সাদ্দাম ঘটনার সঙ্গে জড়িত ছিলেন না। ২০০৬ সালের দ্বিপক্ষীয় সিনেট রিপোর্টে প্রকাশিত হয়, বুশ গণমাধ্যমকে বিভ্রান্ত করেছিলেন ইরাকের সঙ্গে আল-কায়েদার যোগাযোগের মিথ্যা তথ্য দিয়ে। নয়-এগারো হামলায় সাদ্দামের জড়িত থাকা নিয়ে প্রশাসনের ক্রমাগত মিথ্যা অভিযোগ অধিকাংশ আমেরিকান জনগণকে ইরাকের বিরুদ্ধে নিয়ে গিয়েছিল। ইরাকের বিরুদ্ধে আগ্রাসন অধিকাংশ আমেরিকানের সমর্থন পায়। সেপ্টেম্বরের হামলা আমেরিকানদের মধ্যে আরববিরোধী ঘৃণাকে এমনভাবে উসকে দিয়েছিল যে প্রশাসনের মিথ্যা অভিযোগ আমেরিকানদের সহজেই প্রভাবিত করে। ইরাকের বিরুদ্ধে এই মিথ্যা অভিযোগ এতটা জোরালো হতো না, যদি না সেপ্টেম্বরের হামলার কারণে আমেরিকানদের মধ্যে আরববিরোধী ঘৃণা তৈরি হতো। ২০০৬ সালের নির্বাচনে দেখা যায়, ৯০ শতাংশ আমেরিকান সেনা বিশ্বাস করত, ইরাকের বিরুদ্ধে এই মিশন ছিল নয়-এগারো হামলার বদলা। আমেরিকার এই পুরো 'টর্চার প্রোগ্রামের' ভিত্তি ছিল মিথ্যা অভিযোগ ও তথ্যের ওপর। বুশ প্রশাসন আল-কায়েদার সঙ্গে ইরাকের যোগাযোগ সম্পর্কে শুধু মিথ্যা তথ্যই দেয়নি, তারা 'টর্চার প্রোগ্রামের' মাধ্যমে বন্দীদের মিথ্যা জবানবন্দি দিতে বাধ্য করত। জোরপূর্বক এই মিথ্যা জবানবন্দির উদ্দেশ্য ছিল আল-কায়েদার সঙ্গে ইরাকের যোগসূত্র তৈরি করা।[৩৩]

প্রশাসন দ্বারা চালিত হয়ে ও স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে মার্কিন গণমাধ্যমগুলো তাদের একপেশে সংবাদ দিয়ে জনগণের মধ্যে যুদ্ধের পক্ষে মতামত প্রচার

করতে সম্মত হয়। জরিপ প্রতিষ্ঠান 'গ্যালাপ' ২০০৩ সালে যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে একটি জরিপ চালায়। ওই জরিপেও যুদ্ধের পক্ষেই জনমত দেখতে পাওয়া যায়। ওই জরিপ অনুসারে, শতকরা ৭১ ভাগ মার্কিন ইরাকের বিরুদ্ধে যুদ্ধকে সমর্থন করেছিলেন। যুদ্ধ ভালোভাবেই চলছে বলে শতকরা ৯০ ভাগ উত্তরদাতা মনে করেছেন।[৩৪]

আমরা বুশ প্রশাসন ও গণমাধ্যমের ভূমিকাকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলে দেখব, প্রথমে বুশ প্রশাসন যুদ্ধের পক্ষে একটি হুজুগ তোলে। এই হুজুগের কারণে মার্কিন জনগণ ধাঁধায় পড়ে যায়। গণমাধ্যম তার স্বার্থে সরকারের যুদ্ধের পক্ষে অবস্থান নেয়। অবস্থান নিয়ে যুদ্ধের পক্ষে সংবাদ ও ছবি প্রচার করতে শুরু করে। মিথ্যা জবানবন্দি আদায় করতে থাকে। এই দুইয়ের মিলিত প্রভাব পড়ে জনগণের ওপর। জনগণ গণমাধ্যম দ্বারা বিভ্রান্ত হয়, সরকার ও গণমাধ্যমের আচরণ দ্বারা পরিচালিত হয়। সম্মত হয় তাদের মতাদর্শের সঙ্গে। যার প্রমাণ আমরা পেয়েছি আগের অনুচ্ছেদে 'গ্যালাপে'র জরিপের মাধ্যমে। সরকার ও গণমাধ্যমের এই ভূমিকা নিচের লেখচিত্রের মাধ্যমে তুলে ধরা যেতে পারে :

চিত্র-১ : সম্মতি উৎপাদন মডেল তৈরির প্রক্রিয়া বা ধাপসমূহ

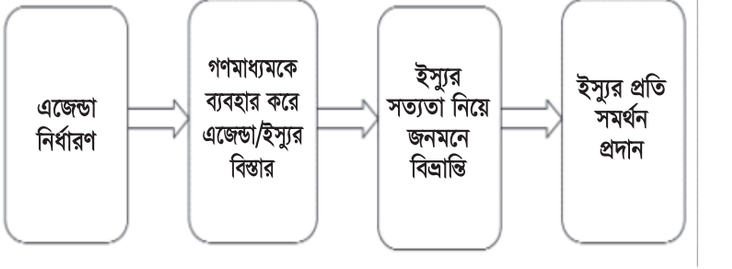

এজেন্ডা ছড়িয়ে দিয়ে সম্মতি উৎপাদন : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ

গত আওয়ামী লীগ সরকারের নির্বাচনী ইশতেহারে প্রাধান্য পেয়েছিল যুদ্ধাপরাধের বিচার। ক্ষমতায় এসে আওয়ামী লীগ-সমর্থিত ১৪-দলীয় সরকার আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল গঠন করে শুরু করে মানবতাবিরোধী অপরাধের

বিচারপ্রক্রিয়া। মানবতাবিরোধী অপরাধে অভিযুক্ত জামায়াতের অধিকাংশ নেতা। এই বিচারপ্রক্রিয়ার শুরু থেকে জামায়াত এর বিরোধিতা শুরু করে। যুদ্ধাপরাধের বিচার হলে দেশে গৃহযুদ্ধ হবে বলে হুমকি দেয়। এমনকি ১৮-দলীয় জোট নেত্রী খালেদা জিয়া যুদ্ধাপরাধের দায়ে অভিযুক্তদের রাজবন্দী বলে আখ্যায়িত করে তাদের মুক্তির দাবিতে বগুড়ার জনসভায় ভাষণ দেন। শুরু হয় হরতাল, ভাঙচুর, সহিংসতা। ২০১৩ সালের পুরো সময়টাই বাংলাদেশ এক অস্থির রাজনৈতিক সময় পার করেছে। যুদ্ধাপরাধীদের সর্বোচ্চ শাস্তির দাবিতে দেশের তরুণসমাজ একত্র হয়ে ৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ সালে শাহবাগে গঠন করে 'গণজাগরণ মঞ্চ'। এই আন্দোলন পরবর্তী সময়ে শুধু আর ব্লগার এবং অনলাইন অ্যাকটিভিস্টদের আন্দোলনে সীমাবদ্ধ থাকেনি; এতে যুক্ত হয় সমাজের বিভিন্ন স্তরের হাজার হাজার মানুষ। 'গণজাগরণ মঞ্চের' আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে রাজনীতির মাঠে উত্থান ঘটে আর একটি শক্তির : 'হেফাজতে ইসলাম'। ২০১০ সালে নারী নীতির বিরোধিতা করে 'হেফাজতে ইসলামের' আবির্ভাব ঘটলেও ২০১৩ সালে তাদের উত্থান ছিল 'গণজাগরণ মঞ্চের' বিরুদ্ধ শক্তি হিসেবে। শাহবাগের তরুণদের দাবি ছিল মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বাস্তবায়ন, যুদ্ধাপরাধীদের সর্বোচ্চ শাস্তি। কিন্তু শাহবাগ আন্দোলনের বিপক্ষ বিরুদ্ধ শক্তি একে আস্তিক-নাস্তিকের আন্দোলন হিসেবে আখ্যায়িত করে (মুরশিদ ২০১৩)[৩৫]। ১৩ দফা নিয়ে মাঠে নামে হেফাজতে ইসলাম, যেখানে ১৩ দফায় শাহবাগের আন্দোলনকারীদের নাস্তিকতার দায়ে অভিযুক্ত করা হয়। তাদের শাস্তি দাবি করা হয়। নারীর অধিকারের বিরুদ্ধে, নারী-পুরুষের মেলামেশা বন্ধের জন্য দাবি জানানো হয়, দাবি ওঠে কোরআন-সুন্নাহর আলোকে রাষ্ট্র পরিচালনার। বিএনপির চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার 'হেফাজতের' ঢাকা অবরোধ আন্দোলনে সম্পৃক্ততা জানান। শুরুর দিকে 'গণজাগরণ মঞ্চের' সঙ্গে সম্পৃক্ততা নিয়ে বিএনপি দ্বিধায় থাকলেও অচিরেই তারা তাদের অবস্থান পরিষ্কার করে। ১৮-দলীয় জোটের অন্যতম শরিক দল জামায়াতের অনেক নেতা যুদ্ধাপরাধের দায়ে অভিযুক্ত। আর শাহবাগ আন্দোলন ছিল এই যুদ্ধাপরাধীদের বিপক্ষে, জামায়াতের অপশক্তির বিপক্ষে। বিএনপি-জামায়াত সমর্থক গণমাধ্যমগুলো শাহবাগের আন্দোলনের বিপক্ষে পরিষ্কারভাবে অবস্থান নেয়, তাদের দলীয় অবস্থানের কারণে। তারা একই সঙ্গে ওই আন্দোলনকে নিষিদ্ধ করার জন্য 'হেফাজতে ইসলামের' দাবির প্রতিও সমর্থন জানায়। বিএনপিপন্থী দৈনিক *আমার দেশ* পত্রিকাটি এখানে সবচেয়ে পক্ষপাতমূলক ভূমিকা পালন করেছিল। শুধু পক্ষপাত নয়, আন্দোলনকে ভিন্নপথে চালিত করার জন্য পরিকল্পিতভাবে প্রচারণা চালিয়েছিল। প্রবন্ধটিতে তাই *আমার দেশ* পত্রিকাটি বেছে নেওয়া

হয়েছে প্রচারণা-তত্ত্বের সম্প্রসারণ ও প্রসারণকে বোঝার জন্য। দেখার চেষ্টা করা হয়েছে গণমাধ্যম কীভাবে একটি ইস্যু তৈরি করে সেই ইস্যুর পক্ষে সম্মতি গঠনের জন্য চেষ্টা চালায়।

শাহবাগের 'গণজাগরণ মঞ্চ' ও 'আমার দেশ' পত্রিকার ভূমিকা

বিএনপিপন্থী ব্যবসায়ী *আমার দেশ* পত্রিকার ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক ও মালিক মাহমুদুর রহমান শাহবাগ আন্দোলনের শুরু থেকেই পত্রিকাটি শাহবাগ আন্দোলন নিয়ে নেতিবাচকভাবে সংবাদ প্রকাশ করতে শুরু করে। প্রথম দিকে আন্দোলনের ঝোঁক স্পষ্ট হওয়ার আগে পত্রিকাটি আন্দোলনকে আওয়ামী লীগের আন্দোলন বলে প্রচারণা শুরু করে। শাহবাগের আন্দোলনের চার দিন পর পত্রিকাটির প্রধান শিরোনামই ছিল এমন—'ফ্যাসিবাদ আক্রান্ত গণজাগরণ মঞ্চ : শাহবাগ ক্রমেই আওয়ামী নিয়ন্ত্রণে : বক্তৃতা দিয়েছেন মন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী : ব্যবস্থাপনা ছাত্রলীগ সভাপতি।'[৩৬]

১৩ ফেব্রুয়ারি *আমার দেশ* একটি কার্টুন ছাপায় প্রথম পাতায়। যেখানে দেখা যায়, শাহবাগের আন্দোলনে সমর্থন-সহায়তা দিচ্ছে পুলিশ। অন্যদিকে, বিরোধী জোটের আন্দোলনে দমন-নিপীড়ন চালাচ্ছে পুলিশ। এ যেন একই মুদ্রার দুটি ভিন্ন দিক। শুধু খবরের মাধ্যমে নয়, কার্টুন বা ব্যঙ্গচিত্র দিয়েও শাহবাগ আন্দোলনকে আওয়ামী রূপ দিতে চেষ্টা করে *আমার দেশ* পত্রিকাটি।[৩৭]



Facebook.com/CartoonistHuda

আমার দেশ পত্রিকাটি দিনের পর দিন এই বলেও খবর প্রকাশ করতে থাকে যে শাহবাগের আন্দোলন ভারতীয় সংস্কৃতিরই প্রতিচ্ছবি। ১৪ ফেব্রুয়ারিতে শাহবাগের 'গণজাগরণ মঞ্চের' একটি কর্মসূচি ছিল প্রদীপ প্রজ্বালন। পত্রিকাটি পরদিন এই প্রদীপ প্রজ্বালনকে হিন্দুদের দীপাবলির সঙ্গে তুলনা করে সংবাদ প্রকাশ করে। এই নিয়ে সংবাদটির শিরোনাম ছিল, 'রাজধানীর শাহবাগে আয়োজিত আওয়ামী লীগ-বাম শোডাউনে গতকালও ভারতীয় হিন্দুদের রীতিতে প্রদীপ প্রজ্বালন কার্যক্রম পালিত হয়।'[৩৮] সংবাদটিতে আরও বলা হয়, 'ছাত্রছাত্রীদের অনেকটা জোর করেই আন্দোলনে যুক্ত করেছে ছাত্রলীগ। তাদের হিন্দুয়ানি কায়দায় প্রদীপ জ্বালাতে বাধ্য করা হয়।'

যুদ্ধাপরাধীদের সর্বোচ্চ বিচারের দাবিতে সংগঠিত শাহবাগ আন্দোলনে ব্যাপক জনসমর্থন বিএনপি-জামায়াত জোটকে শঙ্কিত করে তুলেছিল। আশঙ্কিত করছিল বিএনপি-জামায়াত সমর্থিত গণমাধ্যমগুলোকেও। তারা পরিকল্পিতভাবে গণজাগরণ মঞ্চের বিরুদ্ধে প্রচারণা শুরু করে। *আমার দেশ* এ ক্ষেত্রে জোরালো ভূমিকা রাখে। সাম্প্রদায়িকতার বীজকে উসকে দিয়ে, যুদ্ধাপরাধের ইস্যুকে সম্পূর্ণ ভিন্নদিকে ধাবিত করার জন্য 'আস্তিক-নাস্তিক' ইস্যুকে সামনে নিয়ে আসে *আমার দেশ* পত্রিকাটি।

৫ মার্চ ২০১৩, *আমার দেশ* পত্রিকায় প্রকাশিত হয়, 'বানরকে লাই দিলে শুধু ঘাড়ে চেপে বসে না, লাইদাতার ঘাড়ে বসে চুলের মুঠি ধরে দুই গালে মনের সুখে চড় মারতে থাকে। শাহবাগিদের কাজ-কারবার দেখে এবং কথাবার্তা শুনে মনে হয় তারাও এখন লাই পাওয়া বানরের মতো জাতির ঘাড়ে চেপে দেশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে থাপ্পড় মারতে শুরু করেছে...শাহবাগিদের মুখপাত্র ডা. ইমরান এইচ সরকার বলেছেন, "এই সরকার আমাদের চেয়ে বেশি শক্তিশালী হতে পারে না।"...শাহবাগ আন্দোলনের চাপেই মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলার রায়ে জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমির মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর ফাঁসির আদেশ দেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল। শাহবাগিদের নির্দেশে যখন জাতীয় পতাকা ওঠানামা করে, জাতীয় সংসদে যখন অন্য সব প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে শাহবাগ বন্দনার মঙ্গল শঙ্খ বেজে ওঠে, তারুণ্যের জাগরণে মুগ্ধ প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং অন্তরে শাহবাগের সঙ্গে একাত্ম হওয়ার আকুতি অনুভব করেন, জাতির পক্ষ থেকে যখন শাহবাগ চত্বরে পোলাও বিরিয়ানি মিনারেল ওয়াটারের ঢল নামে, সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তারাও যখন শাহবাগে তারুণ্যের সঙ্গে সংহতি জানাতে অফিস ছেড়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ে পড়েন, মিডিয়ার অতি বড় অংশ যখন শাহবাগের "জীবনে লভিয়া জীবন ধন্য হওয়ার প্রতিযোগিয়ায় মেতে ওঠে" তখন শাহবাগিরা নিজেদের সরকারের চেয়ে শক্তিশালী ভাবতেই পারে। তবে শাহবাগি নেতা ইমরান যে

বললেন তাদের চাপেই দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর বিরুদ্ধে মৃত্যুদণ্ডাদেশ দেওয়া হয়েছে—এ বক্তব্য অবশ্যই বিশ্লেষণের দাবি রাখে। শাহবাগি নেতার বক্তব্য সঠিক হলে আমাদের ধরে নিতে হবে, আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল আইনের ধারাবাহিকতায় দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীকে মৃত্যুদণ্ড দেননি, তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে শাহবাগিদের চাপের ধারাবাহিকতায়।'*

গণজাগরণ মঞ্চের বিরুদ্ধে শুধু সংবাদ প্রকাশ করেই বসে থাকেনি *আমার দেশ*, একই সঙ্গে বিএনপি-জামায়াতপন্থী বুদ্ধিজীবীদের উপসম্পাদকীয় প্রকাশ করে তাদের সংবাদকে আরও বেশি যৌক্তিক করে তোলার চেষ্টা করেছে পত্রিকাটি। ২০১৩ সালের মার্চ মাসের ২ তারিখে *আমার দেশ*-এর সম্পাদকীয়তে ফরহাদ মাজহারের লেখায় প্রকাশিত হয়, শাহবাগ দৃশ্যমান চ্যালেঞ্জ হয়ে আদালতের বিপরীতে অবস্থান নিয়েছে। রীতিমতো বিচারব্যবস্থা ভেঙে ফেলার শামিল হয়েছে। আদালতের সওয়াল-জবাব ও বিদ্যমান আইনের পরিপ্রেক্ষিতে যদি কাউকে বিচারক ফাঁসি দিতে না পারেন, তবু শাহবাগ দাবি করছে ফাঁসিই দিতে হবে। বিচার করো, কিন্তু ফাঁসি ছাড়া আর কোনো রায় মানি না—দাবি করলে সেটা হয় আদালতের নাম ভাঙিয়ে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড ঘটানোর নির্দেশ চাওয়া। পিটিয়ে মানুষ মারার মতো হত্যায় আদালতকে অংশগ্রহণের জন্য বাধ্য করা হচ্ছে। শাহবাগ এ ধরনের পাবলিক লিঞ্চিং বা গণঅংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের পক্ষে দাঁড়িয়েছে কি?...একেই কিছু গণমাধ্যম আখ্যা দিয়েছে 'গণজাগরণ'। গণজাগরণ মঞ্চ বিচার নয়, বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড চায়।'[৩৯]

যুদ্ধাপরাধীদের পক্ষে ক্রমাগত মানবিক আবেগমূলক প্রতিবেদন লিখে আন্দোলনকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে *আমার দেশ*। ১ মার্চ ২০১৩ তারিখে *আমার দেশ* পত্রিকায় প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়, 'সাঈদীর মৃত্যুদণ্ডের খবর প্রকাশিত হবার পর উল্লাসে মেতে ওঠে শাহবাগের জনতা। অন্যদিকে এ রায়ের পর সারাদেশের মানুষ তীব্র প্রতিবাদ করেছে।'[৪০]

শাহবাগ আন্দোলন ও গণজাগরণ মঞ্চের মুখপাত্র ইমরান এইচ সরকারের বিরুদ্ধে পত্রিকাটি প্রকাশ করতে থাকে একাধিক প্রতিবেদন। ৪ মার্চ ২০১৩ তারিখের *আমার দেশ* পত্রিকায় প্রকাশিত হয়, 'শাহবাগিদের নেতা ইমরান এইচ সরকার হচ্ছেন রাজাকারের নাতি...গোয়েন্দা ব্লগার সূত্র জানায় আন্দোলন শুরুর পর জামায়াতি প্রতিষ্ঠানের তালিকাভুক্ত করার নামে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কাছে চাঁদাবাজি, চাঁদার টাকায় ধানমন্ডি এলাকায় ফ্ল্যাট কেনা, রাতে সহযোদ্ধাসহ

* হাইকোর্টের শেষ রায়ে দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীকে আমৃত্যু কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে।

উৎসুক সাধারণ মানুষ শাহবাগের খোলা আকাশের নিচে অবস্থান করলেও ইমরানের পার্শ্ববর্তী একটি হোটেলে রাত যাপন, ডিস্কোতে নাচানাচি, এয়ারপোর্ট এলাকায় আরেকটি বিলাসবহুল হোটেলে ছাত্রলীগেরই আরেক প্রভাবশালী নেতার সঙ্গে ফুর্তি করা, তথাকথিত অগ্নিকন্যা লাকির আন্দোলনবিমুখ হওয়া, শত শত ছাত্রী ও নারীর রাতে শাহবাগে অবস্থান থেকে বিমুখ হাওয়াসহ নানা তথ্য জানা যায়।'

সাঈদীর ছবি চাঁদে দেখা নিয়ে ১৭ মার্চ ২০১৩ তারিখে *আমার দেশ* প্রকাশ করে, 'কোনটা বেশি দামি—১৩ জন ধর্মপ্রাণ মানুষের জীবন নাকি তথাকথিত গণজাগরণ মঞ্চ?... আওয়ামী ও বামপন্থীদের কথিত এই মঞ্চ রক্ষা করতে গিয়েই বগুড়ার ইতিহাসে ঘটে সবচেয়ে মর্মন্তুদ হত্যাযজ্ঞ ৩ মার্চের গণহত্যা। ধর্মপ্রাণ মানুষের হামলা থেকে মঞ্চটি রক্ষা করতেই পুলিশ সেদিন নির্বিচারে গুলি করে হত্যা করে ১৩ জন সাধারণ মানুষকে। বরেণ্য আলেম আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর ছবি চাঁদে দেখা গেছে, ৩ মার্চ রাতে এমন খবর ছড়িয়ে পড়লে হাজার হাজার নারী-পুরুষ রাস্তায় নেমে আসে। তারা নারায়ে তাকবির আল্লাহু আকবর, সাঈদীর মুক্তি চাই—দিতে হবে দিয়ে দাও স্লোগান দেয়। গভীর রাত থেকে সকাল পর্যন্ত বগুড়া জেলা শহর ও উপজেলাগুলোতে হাজার হাজার মানুষ মিছিল করলেও অপ্রীতিকর তেমন কোনো ঘটনা ঘটেনি। ফজরের নামাজের পর হাজার হাজার মানুষ শহরের প্রাণকেন্দ্র সাত মাথার দিকে যেতে থাকে। ওই স্থানে রয়েছে গণজাগরণ মঞ্চ। ওই মঞ্চের আশপাশে রাস্তার মুখে অবস্থান নেয় পুলিশ সদস্যরা। মিছিলকারীরা গণজাগরণ মঞ্চ ভাঙতে পারে, এই আশঙ্কায় পুলিশ সদস্যরা ভোর ছয়টার দিকে মুহুর্মুহু গুলি ছুড়তে থাকে—তাতেই ঘটে এত বিপুল মানুষের প্রাণহানি।...এ ঘটনায় নিহতদের পরিবারে মাতম চলছে। নিহতদের বেশির ভাগই রাজনীতির সঙ্গে জড়িত নন। ধর্মপ্রাণ এসব মানুষ দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর মুক্তির দাবি জানাতেই রাস্তায় নেমে এসেছিলেন।'

'আমার দেশ' ও ব্লগারদের নাস্তিকীকরণ

শাহবাগ আন্দোলনের অন্যতম একজন উদ্যোক্তা ব্লগার রাজীব দুর্বৃত্তদের হাতে খুন হন ২০১৩ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি রাতে। ব্লগার রাজীব খুনের পর থেকেই যেন পাল্টে যায় *আমার দেশ* পত্রিকার এজেন্ডা সেটিং। এর আগ পর্যন্ত পত্রিকাটির ঝোঁক ছিল শাহবাগের আন্দোলনের আওয়ামীকরণ নিয়ে। অথচ ব্লগার রাজীব মারা যাওয়ার পর পত্রিকাটি নতুন করে সামনে নিয়ে আসে আস্তিক-নাস্তিক ইস্যু। পুরো দেশ দুটি ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। *আমার দেশ* এবং বিএনপি-জামায়াত

জোটের পক্ষ থেকে অভিযোগ ওঠে, যারা শাহবাগ আন্দোলনকে সমর্থন করে তারা নাস্তিক। ৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ তারিখে *আমার দেশ* পত্রিকায় একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়, 'রাজধানীর ভয়ঙ্কর ইসলামবিদ্বেষী ব্লগার চক্র' শিরোনামে এই সংবাদটিতে ব্লগার রাজীব হত্যাকেই পরোক্ষভাবে সমর্থন দেওয়া হয়। এ ক্ষেত্রে পত্রিকাটির ভাষা ছিল অনেকটা এমন, ব্লগার রাজীব নাস্তিক, তাই তার হত্যা সমর্থনযোগ্য। প্রতিবেদনটির একটি অনুচ্ছেদে লেখা হয়,[৪১] 'ধর্মদ্রোহী ও নাস্তিক যুবগোষ্ঠী মহান আল্লাহ, পবিত্র গ্রন্থ কোরআন, মহানবী হজরত মোহাম্মদ (স.) ঈদ, নামাজ, রোজা ও হজ সম্পর্কে জঘন্য ভাষায় বিষোদ্‌গার করে মুসলমানদের ইমান-আকিদায় আঘাত হানছে। তাদের কুৎসিত ও অশ্লীল লেখা পড়লে যেকোনো মুসলমানের স্থির থাকা কঠিন হয়ে পড়ে। এমনকি বিবেকবান অমুসলিমদেরও গা শিউরে ওঠার কথা। ব্লগে ইসলামি বিধান, রীতিনীতিকে কটাক্ষ করা হচ্ছে প্রকাশের অযোগ্য ভাষায় এবং নবী-রাসুলদের কাল্পনিক কাহিনি ও মতামত লেখা হচ্ছে অবলীলায়। ধর্মদ্রোহী ব্লগারদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন শুক্রবার রাতে মিরপুরে খুন হওয়া শাহবাগ আন্দোলনের অন্যতম উদ্যোক্তা আহমেদ রাজীব হায়দার ওরফে থাবা বাবা।'

এখানে বেশ কয়েকটি বিষয় চলে আসে। প্রথম : তরুণদের একটি দল ধর্মদ্রোহী ও নাস্তিক। তারাই আবার শাহবাগের আন্দোলনে শামিল। তাদেরই গুরু রাজীব, যিনি নিজেই একজন নাস্তিক। অনেকটা যোগ করে করে শাহবাগের আন্দোলনের সঙ্গে নাস্তিকদের যোগসাজশ করার চেষ্টা করেছিল *আমার দেশ* পত্রিকাটি। যখন যুদ্ধাপরাধীদের শাস্তির দাবিতে সমগ্র দেশ ঐক্যবদ্ধ হতে শুরু করেছিল, ঠিক তখনই *আমার দেশ* সাম্প্রদায়িকতা ও মানুষের ধর্মীয় অনুভূতিতে সুড়সুড়ি দেওয়ার চেষ্টা করেছে। চেষ্টা করেছে ঐক্যবদ্ধতা ভেঙে দিয়ে ভিন্ন খাতে মানুষের চিন্তাধারাকে প্রবাহিত করতে। *আমার দেশের* সঙ্গে সুর মিলিয়ে প্রচারণায় যোগ দেন বিএনপি ও জামায়াতে ইসলামীর নেতারা। আরও যোগ হয় বিএনপি-জামায়াতপন্থী টিভি চ্যানেল ইসলামিক টিভি ও দিগন্ত টেলিভিশন। বিএনপি-জামায়াত সমর্থিত অন্য গণমাধ্যমগুলোও এ ক্ষেত্রে সহযোগিতা করতে থাকে। তবে *আমার দেশ* পত্রিকাটি যেভাবে এজেন্ডা সেটিং করে মাঠে নেমেছিল এবং জনগণের সম্মতি অর্জনের জন্য পরিকল্পিতভাবে প্রচারণার আশ্রয় নিয়েছিল, সেই আস্তিক-নাস্তিক ইস্যুকে তারা আরও মানুষের কাছে ছড়িয়ে দেয় ফেসবুক ও টুইটার থেকে জামায়াতে ইসলামীর অঙ্গসংগঠন বাংলাদেশ ছাত্রশিবিরের নানা ফ্যান পেজের মাধ্যমে। সংবাদপত্র, টিভি চ্যানেল ও সামাজিক যোগাযোগের নানা ওয়েবসাইটে শাহবাগবিরোধী আস্তিক-নাস্তিক প্রচারণা বলা চলে একপ্রকার ঝড়ই তোলে।

১ মার্চ ২০১৩ তারিখে *আমার দেশ* পত্রিকায় প্রকাশিত হয়, 'আমার দেশ

সম্পাদক মাহমুদুর রহমানকে ইসলামের সৈনিক উল্লেখ করে হেফাজতে ইসলামের আমির আল্লামা শাহ আহমদ শফী বলেছেন, কিছু জনবিচ্ছিন্ন নাস্তিক ও বামপন্থীদের শাহবাগ আন্দোলনের আড়ালে আল্লাহ, রাসুল (সা.) ও ইসলামের বিভিন্ন প্রতীকগুলোকে অব্যাহতভাবে অবমাননা ও নাস্তিক মুরতাদদের মুখোশ উন্মোচন করায় সরকারের রোষানলে পড়েছেন মাহমুদুর রহমান। তাকে নানাভাবে হয়রানি করা হচ্ছে।...মুসলমানদের মালিকানাধীন হয়েও দেশের অধিকাংশ মিডিয়া যখন প্রত্যক্ষ-পরোক্ষভাবে ইসলামের বিপক্ষে ও নাস্তিক মুরতাদদের পক্ষে নির্লজ্জ অবস্থান নিয়েছে, এমন কঠিন পরিস্থিতিতে মাহমুদুর রহমান জীবনের ঝুঁকি নিয়ে আল্লাহ, রাসুল (সা.) ও ইসলামের পক্ষে জোরালো অবস্থানে লড়ে গিয়ে তিনি একজন দৃঢ় ইমানদারের পরিচয় দিয়েছেন।'[৪২]

ইসলামিক ফাউন্ডেশন সরকারি একটি প্রতিষ্ঠান। তাদের বিরুদ্ধে ব্লগারদের আশকারা দেওয়ার অভিযোগ করে ১ মার্চ ২০১৩ তারিখে *আমার দেশ* পত্রিকায় প্রকাশিত হয়, 'মহানবী (সা.)-এর অবমাননাকারী নাস্তিক, মুরতাদ ও ইসলামবিদ্বেষীদের বিরুদ্ধে গড়ে ওঠা আলেম-ওলামা ও তৌহিদী জনতার আন্দোলন প্রতিহত করতে ব্যাপক তৎপরতা চালাচ্ছে ইসলামিক ফাউন্ডেশন। এক সপ্তাহ ধরে নানা তৎপরতার পাশাপাশি সবশেষ গতকাল বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদের উত্তর গেট প্রতি শুক্রবার বন্ধ রাখার ঘোষণা দিয়েছেন ফাউন্ডেশনের ডিজি। এ ছাড়া বায়তুল মোকাররমসহ সারা দেশের কোনো মসজিদ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতে দেওয়া হবে না বলেও ঘোষণা দেন তিনি।...সংশ্লিষ্ট একাধিক সূত্রমতে মহানবী (সা.)-এর অবমাননাকারী নাস্তিক ব্লগারদের শাস্তির দাবিতে গত ২২ ফেব্রুয়ারি বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদসহ সারা দেশের মসজিদ থেকে বের হওয়া সব স্তরের আলেম-ওলামা ও ইসলামি দলগুলোর মিছিলে পুলিশের হামলা ও সংঘর্ষের ঘটনায় সরকারি মহলে তোলপাড় শুরু হয়। এ ধরনের আন্দোলন দমনে নানা কৌশল খুঁজতে থাকে প্রশাসন।'[৪৩]

২ মার্চ ২০১৩ তারিখে পত্রিকাটি লিড সংবাদ করে এভাবে, 'ইসলামবিদ্বেষী সরকারের পতন না হওয়া পর্যন্ত তৌহিদী জনতার আন্দোলন থামবে না।'[৪৪]

ব্লগার রাজীব হত্যার কারণ অন্যদিকে নেওয়ার চেষ্টা করে তাঁকে ইসলামবিদ্বেষী লেবেল দেওয়ার মাধ্যমে পুরো শাহবাগ আন্দোলনকে নাস্তিকতার আন্দোলনের লেবেল দিয়েছিল পত্রিকাটি। ৩ মার্চ ২০১৩ তারিখে পত্রিকাটির শিরোনাম ছিল, 'ছাত্রশিবিরকে জড়ানোর চেষ্টা ডিবির : ব্লগার রাজীব হত্যায় জড়িত অভিযোগে নর্থ সাউথের ৫ ছাত্র গ্রেপ্তার : আটকদের দাবি তারা ষড়যন্ত্রের শিকার'। আরও উল্লেখ করা হয়, 'প্রচণ্ড ইসলামবিদ্বেষী ব্লগার রাজীব হায়দার ওরফে থাবা বাবার লাশ

উদ্ধার করেছে পুলিশ। তিনি থাবা বাবা নামে একটি ব্লগে ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে কুৎসা রটনা করেছেন। এ ঘটনায় তার কয়েকজন বান্ধবী ও স্ত্রীকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে পুলিশ।'[৪৫]

নাস্তিকতার ইস্যুটি মানুষের ধর্মীয় অনুভূতিতে চরমভাবে আঘাত করে। বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে শাহবাগের আন্দোলন সম্পর্কে। এই বিভ্রান্তি ও ধর্মীয় অনুভূতিকে লুফে নেয় ইসলামপন্থী একটি দল হেফাজতে ইসলাম।[৪৬]

হেফাজতে ইসলামের উত্থান

২৪ ফেব্রুয়ারি শাহবাগের নাস্তিক ব্লগারদের শাস্তির দাবিতে দেশজুড়ে হরতাল ডাকে ইসলামি দলগুলো। এই হরতালে সমর্থন দেয় বিএনপি। ১৫ মার্চ মুন্সিগঞ্জে শাহবাগের আন্দোলন নিয়ে প্রথম কথা বলেন বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া। ইসলামি দলগুলোর মতো তিনিও শাহবাগের আন্দোলনকারীদের নাস্তিক বলে সমালোচনা করেন। ওই জনসভায় তিনি আরও বলেন, 'শাহবাগে আন্দোলনকারী যুবকেরা নিরপেক্ষ নয়। তারা আওয়ামী লীগের দলীয় কর্মী। তারা নাস্তিক। তারা হিন্দু, বৌদ্ধ, ইসলাম কোনো ধর্ম মানে না। আল্লাহ-রাসুল কিছুই মানে না। তারা বিচার নিয়ে খেলা শুরু করেছে। তারা রায় মানে না, বিচার মানে না, আদালত মানে না।'[৪৭]

যুদ্ধাপরাধের বিচারের জন্য আটককৃতদের অধিকাংশই বিএনপির নেতৃত্বাধীন ১৮-দলীয় জোটের অন্যতম শরিক জামায়াতে ইসলামীর সদস্য। আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল মানবতাবিরোধীদের বিচারপ্রক্রিয়ার শুরু থেকেই খালেদা জিয়া অভিযুক্তদের রাজবন্দী দাবি করে মুক্তি দাবি করেছিলেন। বিএনপি-জামায়াত জোটের আশঙ্কা ছিল, সরকার শাহবাগের আন্দোলনকারীদের মাঠে নামিয়ে দ্রুত বিচার করতে চাইছে। হেফাজতে ইসলামকে সমর্থন দিয়ে বেগম জিয়া সরকারকে আলটিমেটাম দিয়ে হুমকি দিয়ে বলেন, সরকার গণজাগরণ মঞ্চ বন্ধ না করলে, বিএনপি নিজেই পাল্টা মঞ্চ তৈরি করবে। এরপর পাল্টা ওই মঞ্চ থেকে গণজাগরণ মঞ্চ বন্ধ করার জন্য সারা দেশ থেকে মানুষ আসতে বলা হবে। খালেদা জিয়ার এই বক্তব্যের পরই হেফাজতে ইসলাম ৬ এপ্রিল ঢাকায় জনসভা করার ঘোষণা দেয়। আর ওই জনসভা থেকে ১৩ দফা দাবিতে ৫ মে ঢাকা অবরোধের ঘোষণা দেওয়া হয়।

মার্চের মাঝামাঝি থেকেই হেফাজতে ইসলামকে বেশ গুরুত্ব দিয়ে সামনে নিয়ে আসে *আমার দেশ*। ১৮ মার্চ ২০১৩ তারিখে পত্রিকাটিতে উল্লেখ করা হয়, 'আল্লাহ ও রাসুলের জঘন্য অবমাননাকারী নাস্তিক ব্লগার এবং তাদের পৃষ্ঠপোষক ও পক্ষাবলম্বনকারীদের অপপ্রচার ও বিভ্রান্তিমূলক বক্তব্যে কান না দিয়ে দাবি আদায়ে

সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক সংগঠন হেফাজতে ইসলামের ৬ এপ্রিল দেশের প্রতিটি জেলা থেকে ঢাকা অভিমুখে লংমার্চসহ সব প্রতিবাদ কর্মসূচি সর্বাত্মকভাবে পালন করার জন্য দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন হেফাজতে ইসলামের বাংলাদেশের আমির আল্লামা শাহ আহমদ শফী। নাস্তিক ব্লগারদের প্রতিহত করার ঘোষণা দিয়েছেন বৃহত্তর রংপুরের তৌহিদী জনতা।'[৪৮]

২৮ মার্চ ২০১৩ তারিখে লেখা হয়, 'নাস্তিক ব্লগারদের শাস্তির দাবিতে দেশের বিভিন্ন স্থানে নেওয়া হয়েছে ব্যাপক প্রস্তুতি। প্রস্তুতি সভা থেকে জানা গেছে, কর্মসূচিতে বাধা দিলে লাগাতার হরতাল দেওয়া হবে।'[৪৯] ৭ এপ্রিল ২০১৩ তারিখে *আমার দেশ*-এ প্রকাশিত হয়, 'সরকারের কণ্টকাকীর্ণ বাধার বৃত্ত, পদে পদে নিপীড়ন আর প্রভাবশালীদের রক্তচক্ষুসহ বহুমুখী ষড়যন্ত্রের কূটচালকে চূর্ণ করে সারা দেশে ইসলামি চেতনার মহাজাগরণ ঘটেছে। শাহবাগি নাস্তিক মুরতাদদের বিরুদ্ধে ইমানি শক্তিতে জেগে উঠেছে বাংলাদেশ। গতকাল মহাসাগরের ঊর্মি তুলে রাজধানী ঢাকার কেন্দ্রস্থলের পুরোটাই ছিল মুসলিম জনতার দখলে। হেফাজতে ইসলামের আহ্বানে অগণিত তৌহিদী জনতার এ জমায়েতকে প্রাণের ভালোবাসা দিয়ে সেবা দিয়েছে ঢাকাবাসী। আসমুদ্রহিমাচলে নাস্তিকদের বিরুদ্ধে এমন বুলন্দ আওয়াজও কেউ শোনেনি। জনতার এই মহাসমুদ্র থেকে নাস্তিকদের বিরুদ্ধে যে গর্জন ওঠে তা সাগরের কলধ্বনিকে ম্লান করে দেয়।'[৫০]

৫ মে ঢাকা অবরোধ করে হেফাজতে ইসলাম। দুপুরে মতিঝিলের শাপলা চত্বরে এসে জড়ো হয় তারা। শাপলা চত্বরের সমাবেশ থেকে নাস্তিক ব্লগারদের বিচারসহ ১৩ দফা দাবিতে লাগাতার অবস্থান ধর্মঘটের ঘোষণা দেয় বিক্ষোভকারীরা। ভাঙচুর, জ্বালাও পোড়াও শুরু করে হেফাজতের কর্মীরা। বাস, ট্রাকে আগুন, কমিউনিস্ট পার্টির অফিসে আগুন, বইয়ের দোকানে আগুন, মতিঝিলের শাপলা চত্বরজুড়ে শুরু হয় তাণ্ডব। সরকারের পক্ষ থেকে হেফাজতের সমর্থকদের বারবার সরে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। কিন্তু অবস্থান ছাড়ে না হেফাজতে ইসলাম। রাতে মতিঝিল থেকে আন্দোলনকারীদের সরিয়ে দিতে অভিযান চালায় আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী। শুরু হয় যৌথ বাহিনীর অপারেশন। অপারেশনে দেশজুড়ে হেফাজতের কর্মীদের সঙ্গে সংঘর্ষে মারা যায় ২৭ জন।'[৫১]

পুলিশি অভিযান ও মৃতের সংখ্যা নিয়ে ধোঁয়াশা

হেফাজতের অবস্থানে পুলিশের অভিযান ও মৃতের সংখ্যা নিয়ে দেশজুড়ে আলোচনা শুরু হয়। রাতে এই অভিযানে মতিঝিল ও এর আশপাশের এলাকায় বাতি নিভিয়ে অপারেশন পরিচালনা করা হয়। পুলিশের পক্ষ থেকে বলা হয়, হেফাজতের তাণ্ডবে পাওয়ার স্টেশনে বিদ্যুৎ ছিল না। আর বিএনপি-জামায়াত সমর্থকেরা প্রশ্ন তোলে, ইচ্ছাকৃতভাবে বিদ্যুৎ নিভিয়ে এই অভিযান পরিচালিত হয়েছে, যাতে করে ধ্বংসযজ্ঞ চালানো যায় এবং মৃতের সংখ্যা গোপন রাখা যায়। ৫ মে সারা দিন দেশজুড়ে হেফাজতে ইসলামের কর্মীদের সঙ্গে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সংঘর্ষে সাধারণ মানুষসহ মৃতের সংখ্যা ৩০ ছাড়ায়নি। হেফাজতে ইসলাম দাবি করতে থাকে, তাদের দুই থেকে তিন হাজার কর্মী র‍্যাব-পুলিশের হামলায় ৫ মের রাতে মারা গেছে। রাতের আঁধারে হেফাজতকর্মীদের লাশ সরিয়ে ফেলেছে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী। বিএনপি-জামায়াত জোটও তাদের দাবির সঙ্গে একাত্ম হয়ে প্রচার করতে শুরু করে, সেই রাতে যৌথ বাহিনীর অপারেশনে আড়াই হাজার হেফাজতকর্মীকে মেরে ফেলা হয়েছিল। যদিও তারা তাদের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে কোনো তালিকা দিতে পারেনি। তাদের এমন দাবির পরিপ্রেক্ষিতে সে সময়কার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহীউদ্দীন খান আলমগীর জানান, '৫ ও ৬ মে ২০১৩ তে সমগ্র ঢাকা শহরে নয়জন মারা গেছে।'[৫২]

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমসহ বিভিন্ন গণমাধ্যমে বিএনপির ক্রমাগত প্রচারণা, মৃতের সংখ্যা নিয়ে ধোঁয়াশা তৈরি এবং সরকারের বক্তব্যের পর জনমনে মৃতের আসল সংখ্যা নিয়ে দ্বিধা তৈরি হয়। ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার এক বিবৃতিতে জানান, নিহতের সংখ্যা ১১ জন, যাঁদের মধ্যে একজন পুলিশও আছেন। আর ডিএমপি কমিশনারের বক্তব্য এমন এক সময়ে আসে, যখন সামাজিক যোগাযোগের সাইটগুলোতে যৌথ বাহিনীর অপারেশনে হেফাজতে ইসলামের মৃতের সংখ্যা নিয়ে ঝড় বইছিল। সামাজিক যোগাযোগের ওয়েবসাইটগুলোর বিভিন্ন পেজে বলা হচ্ছিল, মৃতের সংখ্যা তিন হাজারের বেশি। ডিএমপি কমিশনার এই সময় হেফাজতে ইসলামের প্রচারণার কথাও বলেন, তাঁর এই মন্তব্যটি পড়লে বিষয়টি আরও পরিষ্কার হয়ে উঠবে, 'যদি তিন হাজার মানুষ মারা গিয়ে থাকেন, তাদের আত্মীয়স্বজন, বন্ধুরা তো আছেন, তাঁরা কোথায়? প্রাণহানি ঘটাতে পারে, এমন কোনো অস্ত্র আমরা ব্যবহার করিনি। সংবাদকর্মীদের উপস্থিতিতেই পুরো অভিযানটি পরিচালনা করা হয়েছে।'[৫৩]

'বিএনপি বা জামায়াত বা হেফাজতের প্রচারণা ছিল যে এই অভিযানটি এতটাই নির্মম ছিল যে তা ২৫ মার্চের গণহত্যাকেও হার মানিয়েছে।'[৫৪] বিএনপি বা হেফাজত বারবার করে আড়াই হাজার বা তিন হাজার মৃতের সংখ্যা দাবি করলেও আজ পর্যন্ত নিহতদের কোনো সঠিক তালিকা দিতে পারেনি। সাভারে

রানা প্লাজা ধসের পর আত্মীয়স্বজন জড়ো হয়েছিলেন আটকে পড়াদের খোঁজে, মৃতের খোঁজে। মতিঝিলে লাশের খোঁজে কেউই আসেনি; বরং বিভিন্ন গণমাধ্যমে দেখা গেছে, যাদের মৃত দেখানো হচ্ছিল, সেই নামে কোথাও কেউ নেই। কেউ মাদ্রাসায় পড়াশোনা করছেন, আবার একই নাম-ঠিকানার ব্যক্তিকে বারবার করে তালিকায় সংযোজন করা হয়েছে। 'অধিকার' নামের বেসরকারি সংগঠন এ রকমই একটি তালিকা প্রকাশ করে ৬১ জনের মৃতের তালিকা প্রকাশ করে, যা নিয়ে বিতর্কের সূত্রপাত হয়।

জামায়াতে ইসলামীর ছাত্রসংগঠন ইসলামী ছাত্রশিবিরের ফেসবুক পেজ বাঁশের কেল্লায় দাবি করা হয়, মৃতের সংখ্যা আড়াই হাজারের বেশি। অনেক লাশ সরকারি নানা সংস্থা সরিয়ে নিয়েছে। শুধু সামাজিক যোগাযোগের সাইটগুলোই নয়, বিএনপিঘেঁষা সংবাদপত্র ও টিভি চ্যানেল প্রত্যক্ষভাবে না বললেও বিএনপি ও জামায়াতে ইসলামীর নেতানেত্রীদের সাক্ষাৎকার ও তাদের সমাবেশ-মিছিলে সংবাদের মাধ্যমে মৃতের সংখ্যা যে হাজার ছাড়িয়েছে, সে এজেন্ডা মানুষের মধ্যে নিবিষ্ট করার চেষ্টা করে। এর বাইরে ছিল না *আমার দেশ* পত্রিকাও। ১৯১৯ সালে ভারতের জালিয়ানওয়ালাবাগে ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর গুলিবর্ষণে মারা যায় তিন হাজারেরও বেশি। *আমার দেশ* পত্রিকা শাপলা চত্বরে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর অভিযানকে সেই জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে তুলনা করে। *দি ইকোনমিস্ট*, আল-জাজিরার মতো আন্তর্জাতিক কিছু গণমাধ্যমের ভূমিকাও ছিল ধোঁয়াশাচ্ছন্ন। *দি ইকোনমিস্ট* এই অভিযানে 'গণহত্যা' হয়েছে বলে খবর ছাপায়। আর আল-জাজিরা জানায়, শাপলা চত্বরে অভিযানে মারা যাওয়ার সংখ্যা নিয়ে সরকার লুকোচুরি করছে। সরকারের দাবি করা সংখ্যার চেয়ে মারা গেছে আরও বেশি। সঙ্গে যোগ হয় বেসরকারি মানবাধিকার সংস্থা 'অধিকার'। 'অধিকার' তাদের প্রতিবেদনে দাবি করে যে তাদের কাছে ৬১ জন মৃতের তালিকা আছে। কিন্তু একই সঙ্গে তারা এই তালিকা বাংলাদেশ সরকার ও গণমাধ্যমের কাছে দিতে অস্বীকৃতি জানায়।[৫৫] শুধু দেশে নয়, আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা হিউম্যান রাইটস ওয়াচ আসলে কতজন মারা গেছে, তা খুঁজে বের করার জন্য একটি কমিশন গঠনের জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানায়।[৫৬]

অর্থাৎ দেশের ভেতর বিএনপি, জামায়াত ও হেফাজতে ইসলামের ভুল তথ্যের প্রচারণা, বিএনপিপন্থী গণমাধ্যমের পক্ষপাতমূলক অবস্থান ও আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমের ধোঁয়াশাচ্ছন্ন পক্ষপাতমূলক সংবাদ জনগণকে বিভ্রান্ত করেছে, দ্বিধাগ্রস্ত করেছে প্রকৃত মৃতের সংখ্যা নিয়ে।

৫ জুন ২০১৩ সালে খুলনা, সিলেট, বরিশাল ও রাজশাহী সিটি করপোরেশন

নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করে নির্বাচন কমিশন। এই নির্বাচনে বিএনপির সঙ্গে প্রচারণায় যোগ হয় হেফাজতে ইসলাম। তারা প্রচারণায় দাবি করতে থাকে, ৫ মের রাতে তাদের দুই হাজারের বেশি কর্মীকে পুলিশ হত্যা করেছে। জনসভায় হেফাজতের নেতারা এই নির্বাচনকে আস্তিক ও নাস্তিকদের মধ্যে যুদ্ধ বলেও মন্তব্য করেন। আওয়ামী লীগ শাহবাগের আন্দোলনকে সমর্থন করে নাস্তিকদের সমর্থন দিয়েছে বলেও অভিযোগ করেন তাঁরা। প্রতিটি সিটি করপোরেশন নির্বাচনে পরাজিত হন আওয়ামী লীগের প্রার্থীরা। আওয়ামী লীগ এই পরাজয়ের জন্য দায়ী করে হেফাজতে ইসলামের মিথ্যা প্রচারণাকে। ইংরেজি দৈনিক *ডেইলি স্টার* ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের পরাজয় নিয়ে একটি অনুসন্ধানী প্রতিবেদন করে, যার শিরোনাম ছিল 'নাস্তিক কার্ডের প্রচারণায় জয়'। ওই প্রতিবেদনে বলা হয়, 'সিটি করপোরেশনগুলোতে হেফাজতে ইসলাম আওয়ামী লীগ সরকারকে নাস্তিকদের আশকারা দেওয়ার জন্য দায়ী করেছে। একই সঙ্গে আওয়ামী লীগকে ভোট দিলে নাস্তিকদেরই ভোট দেওয়া হবে, এমন তুলনা করেছে সংগঠনটি। বরিশালে সংবাদপত্রটির প্রতিবেদক ১০ জন ভোটারকে প্রশ্ন করেছিলেন, ৫ মে তে সরকার যে হাজার হাজার হেফাজতকর্মীকে হত্যা করেছে, তা সত্য কি না। আর উত্তরদাতাদের প্রায় সবাই বলেছেন, সরকারের বিরুদ্ধে হেফাজতকর্মীদের গণহত্যার অভিযোগ সত্য। এই মিথ্যা প্রচারণার জন্যই আওয়ামী লীগের এমন পরাজয় বলেও উল্লেখ করা হয়।[৫৭]

এই ষড়যন্ত্রে কে লাভবান আর কে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে? ষড়যন্ত্র-তত্ত্বের একটি বিশেষ দিক হচ্ছে, এটি বিরুদ্ধবাদীদের বিপক্ষে বিশ্বাসহীনতা তৈরি করে। এই বিশ্বাসহীনতা কোনো না কোনোভাবে তার কার্যক্রমের মাধ্যমে প্রতিফলন ঘটে। আগেই উল্লেখ করেছিলাম 'গণহত্যা' শব্দ যখন ব্যবহৃত হয় তখন এটি মনোজগতে ব্যাপক প্রভাব তৈরি করতে সমর্থ হয়। 'গণহত্যা' এমন একটি প্রত্যয়, যা বিরুদ্ধবাদীদের বিরুদ্ধে প্রচারণায় ব্যবহার করা হয়।

ওপরের আলোচনা থেকে আমরা একটি পর্যবেক্ষণ দাঁড় করাতে পারি, আর তা হলো, বিএনপিপন্থী গণমাধ্যম 'গণহত্যার' কথা বলে একটি এজেন্ডা বাস্তবায়নের চেষ্টা করেছে। গণমাধ্যম, সামাজিক যোগাযোগের ওয়েবসাইট, বিএনপি-জামায়াতের নেতা-কর্মী ও দেশি-বিদেশি মানবাধিকার সংগঠন হেফাজতের প্রচারণাকে আরও উসকে দিয়েছে। বিভিন্ন মাধ্যম থেকে প্রাপ্ত তথ্য যখন একই দিকনির্দেশ দেয় এবং প্রকৃত ঘটনা থেকে প্রাপ্ত তথ্য যখন ভিন্ন দিকনির্দেশনা দেখায় তখনই মনোজগতে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়। যাকে অতিক্রিয়া প্রভাব বা সিনার্জিস্টিক ইফেক্ট বলা হয়। একই সঙ্গে আন্তব্যক্তিক যোগাযোগ, গণযোগাযোগ ও মানবাধিকার সংগঠনের প্রচারণা এই প্রভাবকে বাড়িয়েছে

অনেক গুণ। আর একে মানুষের মনের গহিন কোণে নিয়ে গেছে ধর্ম বা আস্তিক-নাস্তিক প্রচারণা। বিশ্বের প্রতি ১০০ জন মুসলিমের মধ্যে প্রায় নয়জন বসবাস করে বাংলাদেশে। ফলে ধর্মকে যখন রাজনীতির সঙ্গে গুলিয়ে জনগণের দিকে তা নিক্ষেপ করা হয়, সেটি হয়ে ওঠে বেশ কার্যকর। আমরা একটি লেখচিত্রের মাধ্যমে দেখাতে পারি—



চিত্র-২ : বাংলাদেশের জনগণের ওপর হেফাজতে ইসলামের অতিক্রিয়া প্রভাব বা সিনার্জিস্টিক প্রভাব

উপসংহার

রাষ্ট্রবিজ্ঞানী থমাস ফার্গুসন তাঁর *গোল্ডেন রুল* গ্রন্থে বলেছেন, 'রাজনৈতিক দল ও নির্বাচনে প্রধান অনুদানদাতারা যদি কোনো একটা ইস্যুতে একমত হন, তাহলে প্রতিযোগী দলগুলো ওই ইস্যু নিয়ে আর মুখ খোলে না'।[৫৮] যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবিতে সংগঠিত শাহবাগের গণজাগরণ মঞ্চের মূল উদ্দেশ্যের সরাসরি বিরোধিতা করা বিএনপি, জামায়াত জোটের পক্ষে করা সম্ভব ছিল না। ১৯৭১-এ স্বাধীনতাযুদ্ধে সংঘটিত মানবতাবিরোধী হত্যাযজ্ঞের বিচারের বিপক্ষে যাওয়া মানে সরাসরি ঘোষণা দিয়ে দেশের স্বাধীনতার অস্তিত্বের বিপক্ষে চলে যাওয়া; যা বিএনপির মতো

বড় একটি রাজনৈতিক দল, যারা নিজেদের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তি হিসেবে পরিচিতি পেতে চায়, তাদের পক্ষে কখনোই সম্ভব নয়। কিন্তু যুদ্ধাপরাধীদের বিচার মানেই জোটের শক্তি হ্রাস, কারণ বিএনপি-জামায়াত জোটের অনেক নেতাই মানবতাবিরোধী অপরাধে অভিযুক্ত। তাই যুদ্ধাপরাধের বিচার তারাও চায় এমন ধুয়া তুলে 'গণজাগরণ মঞ্চের' জাগরণকে বিভক্ত করাই ছিল একমাত্র বিকল্প এবং পরিকল্পিতভাবে আস্তিকতা-নাস্তিকতার দোহাই দিয়ে সেই মূল চেতনাকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা হয়েছে। শিখণ্ডী হিসেবে খাড়া করা হয়েছে হেফাজতে ইসলামকে। হেফাজতে ইসলামকে যৌথ বাহিনীর অপারেশনে চলে যেতে বাধ্য করা হলে শুরু হয় মৃতের সংখ্যা নিয়ে নতুন করে বিভ্রান্তি সৃষ্টির চেষ্টা। বিএনপি-জামায়াতসমর্থিত নেতারা ও গণমাধ্যমগুলো চেষ্টা করেও হাজার হাজার মৃতের তালিকা দেখাতে পারেনি আজ পর্যন্ত। কিন্তু ক্রমাগতভাবে জনগণকে তাদের নেতিবাচক প্রচারণার মাধ্যমে প্রভাবিত করার চেষ্টা করেছে। তৈরি করেছে বিভ্রান্তি, যার মূল উদ্দেশ্য ছিল গণমাধ্যম বা ওই বিশেষ দলের এজেন্ডার প্রতি সম্মতি জ্ঞাপন।

পুঁজিবাদী সমাজকাঠামোয় গণমাধ্যম ক্ষমতাবানদের পক্ষেই সাফাই গায়, তারই প্রমাণ পাওয়া গেছে ইতিহাসের বিভিন্ন ঘটনায় গণমাধ্যমের ভূমিকা থেকে। Walgrave (2005) বলেন, উপসাগরীয় যুদ্ধ থেকে ২০০২ সালের ইরাক আগ্রাসন, প্রতিটিতে মার্কিন গণমাধ্যম চেষ্টা করেছে যুদ্ধবাজ সরকারের পক্ষে জনমত তৈরি করতে। যুদ্ধের এজেন্ডাকে মানুষের মনে নিবিষ্ট করার চেষ্টা করে মার্কিন গণমাধ্যমগুলো।[৫৯]

মিডিয়ায় অগ্রাধিকার প্রদান ও পক্ষপাতিত্বের সমালোচনা করতে গিয়ে আমরা খোদ মিডিয়ার ওপরই অন্তত কিছু তথ্যের জন্য নির্ভর করি। মিডিয়ার ওপর আমাদের অতিরিক্ত নির্ভরশীলতা বিভ্রান্তির সুযোগ সৃষ্টি করে। মিডিয়া শুধু জনগণের কাছে বার্তা ও প্রতীক সম্প্রসারণ করে না, বৃহত্তর সমাজে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোতে খাপ খাওয়ার উপযোগী করে জনগণকে মূল্যবোধ, বিশ্বাস ও আচরণবিধিতে দীক্ষিত করে তোলে। কিন্তু যখন খোদ মিডিয়ার নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গিতে সংকীর্ণতার সৃষ্টি হয়, তখনই দেখা দেয় বিভ্রম, প্রচারণাব্যবস্থার ক্রিয়াশীলতা যাচাই করা তখন দুরূহ হয়ে পড়ে। গণমাধ্যমগুলো তখন আগ্রাসীভাবে মত প্রকাশ করতে থাকে এবং গণমানুষের স্বার্থের চেয়ে মিডিয়ার নিজস্ব স্বার্থ রক্ষাই প্রকট হয়ে ওঠে।

এই প্রবন্ধে মিডিয়াকে দেখা হয়েছে বিশেষ সামাজিক উদ্দেশ্য সাধনকারী প্রপঞ্চ হিসেবে। কিন্তু সে উদ্দেশ্য এমন নয় যে বিচক্ষণভাবে রাজনৈতিক দায়িত্ব পালনের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যাবলি প্রচারের মাধ্যমে রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়ার ওপর অর্থপূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করবে; বরং মিডিয়া ব্যস্ত নিজ উদ্দেশ্য পূরণে

বিভ্রান্তি সৃষ্টিকারী নিয়ামক হিসেবে। প্রচারণা মডেল অনুযায়ী, মিডিয়ার সামাজিক উদ্দেশ্য হলো দেশ, সমাজ, ধর্ম বিশ্বাস ও রাষ্ট্রব্যবস্থা এবং জনগণের ওপর আধিপত্যকারী বিশেষ অধিকারভোগী গোষ্ঠীগুলোর গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক এজেন্ডাগুলো সমর্থন করা, জনমনে প্রোথিত করা ও জনগণের সম্মতি আদায় করা। মিডিয়াগুলো তাদের ক্রমবর্ধমান স্বাধীনতা ও কর্তৃপক্ষকে চ্যালেঞ্জ করার ক্ষেত্রে বহুদূর অগ্রসর হয়েছে এবং এত দূর অগ্রসর হয়েছে যে গণতন্ত্রকে টিকিয়ে রাখতে হলে ক্ষেত্র বিশেষে অবশ্যই তাদের লাগাম টেনে ধরতে হবে।

তথ্যসূত্র

১. http://www.passia.org/seminars/99/media_and_communication/rami2.html

২. Edward S. Herman and Noam Chomsky, *Manufacturing Consent: The Political Economy of the Mass Media,* New York: Pantehon Books, 1988.

৩. William J. Severin and James W. Tankard, *Communication Theories,* New York: Guilford Press, 1987.

৪. Michael J. Muin, 'Agenda Setting Theory and the Role of the Media in Shaping Public Opinion for the Iraq War,' research paper in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Arts in the Department of Communication University of Central Missouri, 2011. http://centralspace.ucmo.edu/xmlui/bitstream/handle/10768/26/MMuin_Communication.pdf?sequence=1

৫. Bryan Hayes, 'The Gulf War: The Bush Administration and Pentagon's Mobilization of the Press to Achieve Favorable American Public Opinion,' Military History Online, 2010, available at http://www.militaryhistoryonline.com/20thcentury/articles/gulfwarpressmobilization.aspx

৬. এডওয়ার্ড এস হারম্যান ও নোয়াম চমস্কি, *সম্মতি উৎপাদন : গণমাধ্যমের রাজনৈতিক অর্থনীতি,* পৌষ ১৪১৪, জানুয়ারি ২০০৮, পৃ. ২৮.

৭. Doug Newsom and Alan Scott, *This is PR: The Realities of Public Relations,* Third Edition, Wadsworth Publication Co., 1985-1981. p: 169.

৮. Sam Black and Melvin L. Sharpe, *Practical Public Relations: Common Sense Guidelines for Business and Professional People.* 1985 http://libguides.usc.edu/content.php?pid=83009&sid=618409

৯. Edward S. Herman and Noam Chomsky, *Manufacturing Consent: The Political Economy of the Mass Media,* Vol. CI. No. 26,000

১০. http://www.prothom-alo.com/opinion/article/8813/ আমার দেশ-এর সাংবাদিকতা

১১. এডওয়ার্ড এস হারম্যান ও নোয়াম চমস্কি, *সম্মতি উৎপাদন : গণমাধ্যমের রাজনৈতিক অর্থনীতি,* পৌষ ১৪১৪, জানুয়ারি ২০০৮, পৃ. ৩৬-৩৭

১২. Gallup, Lesli, *When to Forgive and Forget: Engaging Hanoy and out laws,* New York Times, April 15, 1993

১৩. এডওয়ার্ড এস হারম্যান ও নোয়াম চমস্কি, *সম্মতি উৎপাদন : গণমাধ্যমের রাজনৈতিক অর্থনীতি,* পৌষ ১৪১৪, জানুয়ারি ২০০৮, পৃ. ৪১

১৪. জন. ই. রিলি, *ফরেন পলিসি* (বসন্ত ১৯৮৩, বসন্ত ১৯৮৭) রিলি, সম্পা, *আমেরিকান পাবলিক ওপিনিয়ন ইউ এস ফরেন পলিসি* ১৯৮৭, শিকাগো কাউন্সিল অন ফরেন রিলেশনস, পৃ. ৩৩

১৫. এডওয়ার্ড এস হারম্যান ও নোয়াম চমস্কি, *সম্মতি উৎপাদন : গণমাধ্যমের রাজনৈতিক অর্থনীতি,* পৌষ ১৪১৪, জানুয়ারি ২০০৮, পৃ. ২৬-২৯

১৬. http://www.studymode.com/essays/Saddam-Hussein-The-u-s-Portrayal-Of-12772.html

১৭. http://pages.gseis.ucla.edu/faculty/kellner/papers/gulfwarrevisited.htm

১৮. Martin J. Manning and Clarence R.Waytt, *Encyclopedia of Media and Propoganda in Wartime America,* 2010, p. 810

১৯. S. Iyengar, and A. Simon, *News coverage of the Gulf crisis and public opinion,* Communication Research, 1993.

২০. http://www.gallup.com/poll/1963/amer...orthwhile.aspx

২১. http://www.arabnews.com/news/451770)

২২. http://www.livescience.com/25110-negative-messages-mulsims-media.html

২৩. http://cojme.unl.edu/mosaic/2012/12/17/improvement-stereotyped-portrayals-muslims-linger/#sthash.T4LwRbCL.dpuf

২৪. http://en.wikipedia.org/wiki/Iraq_and_weapons_of_mass_destruction)

২৫. 'U.S.officials Guilty of War Crimes for Using 9/11 As a False Justification for the Iraq War, WashingtonsBlog.October24, 2012, http://www.washingtonsblog.com/2012/10/5-hours-after-the-911-attacks-donaldrumsfeld-said-my-interest-is-to-hit-saddam-he-also-said-go-massive-sweep-it-all-up-things-related-and-not-and-at-2.html

২৬. http://georgewbush-whitehouse.archives.gov/news/releases/2002/09/20020912-1.html

২৭. http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/shows/truth/why/said.html

২৮. Muin, Michael J. প্রাগুক্ত

২৯. http://www.theguardian.com/media/2012/jun/15/rupert-murdoch-tony-blair-iraq-alastair-campbell

৩০. http://www.nieman.harvard.edu/reports/article/100831/The-Press-and-Publi-Misperceptions-About-the-Iraq-War.aspx

৩১. Grant R. Jeffrey, *War on Terror: Unfolding Bible Prophecy,* Kindle Edition, March 24, 2010

৩২. 'U.S. Officials Guilty of War Crimes for Using 9/11 As a False Justification for the Iraq War,' WashingtonsBlog.October 24, 2012 http://www.washingtonsblog.com/2012/10/10/5-hours-after-the-911-attacks-donald-rumsfeld-said-my-interest-is-to-hit-saddam-he-also-said-go-massive-sweep-it-all-up-things-related-and-not-and-at-2.html

৩৩. Kai Hafez, 'The Iraq War 2003 in Western Media and Public Opinion: A Case Study of the Effects of Military (Non-) Involvement in Conflict Perception,' 2003. Available at:

http://www.uni-erfurt.de/fileadmin/user-docs/philfak/kommunikationswissenschaft/files_publikationen/hafez/Hafez-Irak.pdf (Accessed on 30th September, 2013)]
৩৪. 'U.S. Officials Guilty of War Crimes for Using 9/11 As a False Justification fot the Iraq War,' WashingtonsBlog. October 24, 2012 http://www.washingtonsblog.com/2001/10/5-hours-after-the-911-attacks-donald-rumsfeld-said-my-interest-is-to-hit-saddam-he-also-said-go-massive-sweep-it-all-up-things-related-and-not-and-at-2.html
৩৬. http://www.gallup.com/poll/8038/seventytwo-percent-americans-support-war-against-iraq.aspx
৩৬. Nadine Murshid, 'The Shahbag Uprising War Crimes and Forgiveness,' *Economic and Political Weekly*, March 2013.
৩৭. http://www.amardeshonline.com/pages/details/2013/02/10/187279)
৩৮. http://www.amardeshonline.com/pages/details/2013/02/10/187768#.UiHMXtKBkg4
৩৯. http://www.amardeshonline.com/pages/details/2013/02/15/188030#.Uu6DTT2Syr4
৪০. http://www.amardeshonline.com/pages/details/2013/03/02/190232
৪১. http://www.amardeshonline.com/pages/details/2013/03/01/190103#.UwmVo2KSyr5
৪২. http://www.amardeshonline.com/pages/details/2013/03/01/190112
৪৩. http://www.amardeshonline.com/pages/details/2013/03/01/190112
৪৪. http://www.amardeshonline.com/pages/details/2013/03/01/190114
৪৫. http://www.amardeshonline.com/pages/details/2013/03/02/190246
৪৬. http://www.amardeshonline.com/pages/details/2013/03/03/1950387
৪৭. http://www.amardeshonline.com/pages/details/2013/02/18/188548#.Uu58fD2Syr5
৪৮. http://www.amardeshonline.com/pages/details/2013/03/16/192173#.Uu6FwD2Syr4
৪৯. http://www.amardeshonline.com/pages/details/2013/03/18/192450#.UwmzH2KSyr4
৫০. http://www.amardeshonline.com/pages/details/2013/03/28/193988#.Uwm1OGKSyr4
৫১. http://www.amardeshonline.com/pages/details/2013/04/07/195470#.Uwm2CGKSyr4
৫২. http://www.thedailystar.net/beta2/news/22-more-killed/
৫৩. http://www.newagebd.com/detail.php?date=2003-05-07&nid=48361
৫৪. http://www.bbc.co.uk/bengali/news/2013/05/130508_sg_hefazat_missing.shtml
৫৫. http://www.newagebd.com/detail.php?date=2013-05-08&nid=48401#.Ukun2tlzhZg
৫৬. http://odhikar.org/wp-content/uploads/2013/06/Fact-finding_Hefazate-Islam_Bangla.pdf
৫৭. http://www.hrw.org/news/2013/05/10/bangladeshindependent-body-should-investigate-protest-deaths
৫৮. http://archive.thedailystar.net/beta2/news/triumph-of-atheist-card/
৫৯. Thomas Feguson, *Golden Rule: The Investment Theory of Party Competition and the Logic of Money-Driven Political Systems*, University of Chicago Press, June, 1995, pp. 28-29
৬০. Stefaan Walgrave and Joris Verhulst, *The 2003 Iraqi war in the media: Politics, media, and public opinion in eight countries.* 2005. http://www.m2p.be/publications/00101561.pdf

অর্থনীতির ইতিহাস

পলাশীর যুদ্ধ ও সম্পদ পাচারের সূত্রপাত

এম মোফাখ্খারুল ইসলাম

সারসংক্ষেপ

এ প্রবন্ধের দুটো অংশ। প্রথম অংশে লেখক খুবই সংক্ষেপে পলাশী ষড়যন্ত্র সম্পর্কে অধ্যাপক রজত রায় ও সুশীল চৌধুরীর মতামত পর্যালোচনা করেছেন। দ্বিতীয় অংশে পলাশী যুদ্ধের অব্যবহিত পরবর্তীকালে (অর্থাৎ ১৮০০ সাল পর্যন্ত সময়ে) বাংলা থেকে ইংরেজ কোম্পানি যতটুকু সম্পদ পাচার করেছিল তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়েছেন। নবাব সিরাজউদ্দৌলা বিভিন্ন ষড়যন্ত্র ও প্রতিকূলতার মুখোমুখি হয়ে ২৩ জুন ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে[১] চূড়ান্তভাবে পরাজিত হন। প্রবন্ধের প্রথম অংশে এ ঘটনার কিছু বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হবে। আলোচনার কেন্দ্রে থাকবে দুটো প্রশ্নে বিতর্ক : ইংরেজরা কি নবাবের অভ্যন্তরীণ শত্রুদের আমন্ত্রণে এ ষড়যন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল, নাকি তারাই মূল ভূমিকা পালন করেছিল, যদি তা-ই হয় তাদের উদ্দেশ্য কী ছিল? প্রবন্ধের দ্বিতীয় অংশে পলাশীর 'লুণ্ঠন' (Palashi drain) এবং ইংল্যান্ডে সম্পদ পাচারের সূত্রপাতের ওপর আলোকপাত করা হবে।

মুখ্য শব্দগুচ্ছ : পলাশীর যুদ্ধ, ষড়যন্ত্র, ইংরেজদের ভূমিকা, সম্পদ পাচার, পাচারের পরিমাণ নিয়ে বিতর্ক।

পটভূমি

প্রথম থেকেই তরুণ নবাব সিরাজউদ্দৌলার ইংরেজ কোম্পানির প্রতি তিক্ততা ছিল। এর সর্বজনবিদিত তিনটি কারণ ছিল—অতিরিক্ত দুর্গ নির্মাণ প্রশ্ন, ১৭১৭ সালে সম্রাট ফররুখ শিয়ারের দেওয়া দস্তকের অপব্যবহার এবং তিপ্পান্ন লাখ রুপির তহবিল আত্মসাৎ করে কলকাতায় পালিয়ে যাওয়া কৃষ্ণদাসকে ফেরত দিতে অস্বীকৃতি। এ সমস্যাগুলো তাঁর ক্ষমতা গ্রহণের আগে থেকেই ছিল। তরুণ নবাব কোম্পানিকে অতিরিক্ত দুর্গ নির্মাণ বন্ধ, দস্তকের অপব্যবহারের অবসান এবং কৃষ্ণদাসকে ফিরিয়ে দিতে নির্দেশ দেন। কিন্তু কোম্পানি নবাবের কোনো কথাতেই

কর্ণপাত করেনি। অন্যদিকে কোম্পানির কলকাতার কর্তাব্যক্তিরা এমন আচরণ করেন যে নবাবের প্রতি তাদের বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা নেই। অপরদিকে তারা সিরাজউদ্দৌলার খালা ঘসেটি বেগমের পছন্দমতো সিংহাসনের অপর দাবিদার শওকত জংকে সমর্থন করতে থাকে। এভাবে নবাব এবং কোম্পানির মধ্যে আরেকটি বিবাদের সূত্রপাত হয়। যা হোক, প্রথম দিকে নবাব ত্বরিতগতিতে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রমাণ দেন। তিনি তাঁর খালাকে গৃহবন্দী ও কলকাতা দখল করেন এবং তাঁর খালাতো ভাই শওকত জংকে পরাজিত করেন। নবাবের স্বল্পকালীন শাসনকালের মধ্যে এটাই ছিল সবচেয়ে ভালো সময়, কিন্তু এখানেই তাঁর পতনের সূত্রপাত। পতনের সূচনা ঘটে মাদ্রাজ কাউন্সিল থেকে প্রেরিত কর্নেল ক্লাইভ এবং অ্যাডমিরাল ওয়াটসনের দ্বারা কলকাতা পুনরুদ্ধারের মাধ্যমে। নবাব কলকাতা পুনরুদ্ধারের এক সাহসী প্রচেষ্টা গ্রহণ করেন কিন্তু তিনি ব্যর্থ হন এবং আলীনগরের অবমাননাকর চুক্তি স্বাক্ষর করেন। এ চুক্তির আওতায় কোম্পানি সব বাণিজ্যিক সুযোগ-সুবিধা ফিরে পায়, আর্থিক ক্ষতি পূরণের প্রতিশ্রুতি লাভ করে, কলকাতাকে সুরক্ষিত করা এবং মুদ্রা তৈরি করার অধিকার লাভ করে। অতঃপর ইংরেজ কোম্পানি ফরাসিদের অধীনে থাকা চন্দননগর দখল করে।

ঘটনার অগ্রগতি সম্পর্কে এখানে যে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে ঐতিহাসিকদের মধ্যে সে বিষয়ে মতপার্থক্য খুবই কম। যা হোক, ঐতিহাসিকদের মধ্যে ভিন্নমত রয়েছে, এ সময়ের পরবর্তীকালের ঠিক আগে তিন মাসের কিছু ঘটনা নিয়ে। এ প্রসঙ্গে রজত রায় ও সুশীল চৌধুরীর মধ্যকার মতপার্থক্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। রজত রায়ের মতে, নবাবের গুরুত্বপূর্ণ সভাসদ (মীর জাফর, ইয়ার লতিফ খান, খাজা ওয়াজিদ) এবং প্রদেশের বড় শেঠরা (জগৎ শেঠ ও উমিচাঁদ) সিরাজউদ্দৌলাকে সিংহাসনচ্যুত করার জন্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। তারা প্রত্যেকেই নিজ নিজ স্বার্থ দ্বারা তাড়িত হয়েছিল। যেমন মীর জাফর প্রদেশের নবাব হওয়ার উদ্দেশ্যে, জগৎ শেঠ নতুন নবাবকে ঋণ দিতে অস্বীকার করায় তাকে যে অপমান করা হয় তার প্রতিশোধ নিতে, উমিচাঁদ তার ব্যক্তিগত আর্থিক সুবিধার জন্য এ ষড়যন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত হয়। আর এ ষড়যন্ত্রকারীদের পেছনে ছিল বেশ কিছু প্রভাবশালী জমিদার। প্রদেশে এ ধরনের ষড়যন্ত্র কোনো নতুন বিষয় ছিল না, এ সময়ে নতুনত্ব ছিল এই যে ষড়যন্ত্রকারীরা ইংরেজ কোম্পানিকে তাদের পরিকল্পনার সঙ্গে যুক্ত করে। কিন্তু ষড়যন্ত্রকারীরা ঘুণাক্ষরেও বুঝতে পারেনি যে রাজনৈতিক ক্ষমতা বিদেশিদের কাছে হস্তান্তর করতে হবে, সে ক্ষমতা তারা নিজেরা কুক্ষিগত করতে চেয়েছিল। বিদেশিদের সাহায্য না পেলেও অভ্যন্তরীণ শত্রুরা ক্ষমতা দখলের জন্য বদ্ধপরিকর ছিল। চন্দননগর দখল করার পর ক্লাইভ ও ওয়াটসন মাদ্রাজে ফিরে যাওয়ার পরিকল্পনা করছিল। রাজদরবারে

নবাবের আহ্বানে তারা সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে কেন ক্লাইভ ও ওয়াটসন তাদের মত পরিবর্তন করেছিল এবং পলাশীর ষড়যন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল? রজত রায়ের মতে, সিরাজউদ্দৌলা আলীনগর চুক্তির ও চন্দননগর হারানোর পরও ফরাসিদের তার দরবারে আশ্রয় দিয়েছিল এবং ফরাসি জেনারেল বুশির কাছে সামরিক সহায়তা চেয়েছিল, যা ইংরেজদের আতঙ্কের কারণ ছিল। এ পরিস্থিতিতে তারা উপলব্ধি করে যে ক্ষমতাসীন নবাবকে আর বিশ্বাস করা যায় না, সুতরাং তার স্থানে এমন কাউকে বসাতে হবে, যাকে তারা বিশ্বাস করতে পারে। এভাবে রজত রায়ের মতে, পলাশী ষড়যন্ত্রের পেছনে অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক শক্তি জোরালো ভূমিকা পালন করেছিল।[২]

সুশীল চৌধুরী এর বিপরীত অবস্থান গ্রহণ করেছেন। তিনি যুক্তি দেখিয়েছেন যে ইংরেজ কর্মকর্তারাই এ নাটকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। তার মতে, যদিও মুর্শিদাবাদের কিছু সভাসদ সিরাজউদ্দৌলার প্রতি অসন্তুষ্ট ছিলেন, কিন্তু প্রাপ্ত তথ্যাবলি পরীক্ষা করলে ক্লাইভ ও ওয়াটসন যখন মাদ্রাজ থেকে বাংলায় পৌছান তখন এখানে ষড়যন্ত্রের কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। কিন্তু একসময় তারা মুর্শিদাবাদের বিদ্যমান পরিস্থিতির সুযোগে ষড়যন্ত্রের সিদ্ধান্ত নেন। প্রকৃতপক্ষে মাদ্রাজ কাউন্সিল যে নির্দেশ দিয়ে ক্লাইভ ও ওয়াটসনকে বাংলায় পাঠায় তার মধ্যেই এ ষড়যন্ত্রের বীজ নিহিত ছিল। কাউন্সিলের পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল, 'শুধু কলকাতা পুনরুদ্ধার নয়', 'প্রচুর ক্ষতিপূরণ' আদায় ও চন্দননগর দখল এবং একই সঙ্গে এমন কাউকে ক্ষমতায় বসাতে হবে যিনি ফরাসিদের প্রতি সহানুভূতিশীল হবে। সুশীল চৌধুরী এরপর বলেন, ষড়যন্ত্রের জন্য প্রয়োজনীয় শর্ত হলো ক্ষমতাসীন নবাবের বিপক্ষে অসন্তোষ তৈরি করতে হবে। অতএব এ কথা পরিষ্কার যে মাদ্রাজ কাউন্সিল কেবল আগের সব সুযোগ-সুবিধাসহ কলকাতাই ফেরত চায়নি, একই সঙ্গে তারা ফরাসিদের বিতাড়ন ও বাংলায় 'ক্ষমতার পরিবর্তন' চেয়েছিল। এভাবে দেখা যায় যে যখন রজত রায় অভ্যন্তরীণ শক্তির ওপর অধিক জোর দিয়েছেন তখন সুশীল চৌধুরী মনে করেন ইংরেজ কোম্পানিই প্রধান ভূমিকা পালন করেছিল।[৩]

ইংরেজ কোম্পানি কেন কলকাতা পুনরুদ্ধার করতে চেয়েছিল, এর সুযোগ-সুবিধাগুলো ফিরিয়ে আনতে চেয়েছিল এবং ক্ষতিপূরণ দাবি করেছিল তা সহজেই বোঝা যায়। কিন্তু কেন কোম্পানি একটি ষড়যন্ত্রের সূত্রপাত করেছিল সিরাজউদ্দৌলার পরিবর্তে মীর জাফরের মতো একজনকে ক্ষমতায় বসানোর জন্য? এ প্রশ্নের উত্তর খোঁজার জন্য আমাদের সামনে সমকালীন পর্যবেক্ষক এবং পরবর্তী ভাষ্যকারদের অনেক মত রয়েছে : ক. সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুরা মুসলমানদের স্বৈরশাসনে অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছিল খ. হিন্দু ব্যবসায়ী শ্রেণীর স্বার্থ জড়িত ছিল

ইংরেজ কোম্পানির সঙ্গে গ. বাংলার অভ্যন্তরীণ সংকট ঘ. সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর সঙ্গে নবাবের সম্পর্কচ্ছেদ। সুশীল চৌধুরী এসব মতামতকে প্রত্যাখ্যান করার পেছনে অনেক তথ্যপ্রমাণ দিয়েছেন। নিজের বক্তব্যের পক্ষে তিনি বলেন, ব্রিটিশদের হস্তক্ষেপ করতেই হতো, কেননা কোম্পানির কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ব্যক্তিগত ব্যবসা বিপন্ন হয়ে পড়েছিল। তত্ত্বগতভাবে বলতে গেলে কোম্পানির কর্মচারীদের মূল দায়িত্ব ছিল কোম্পানির নিজস্ব ব্যবসা পরিচালনা করা, কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে তাদের সৌভাগ্যের চাবিকাঠি তাদের ব্যক্তিগত ব্যবসাই ছিল তাদের মূল উদ্বেগ। কিন্তু আরমেনিয়ান বণিকদের সহায়তায় পরিচালিত ফরাসিদের ব্যক্তিগত ব্যবসার ফলে ১৭৩০ সালের দিকে ইংরেজদের ব্যক্তিগত বাণিজ্য কমে আসে এবং ১৭৪০ সালের দিকে সংকট আরও ঘনীভূত হয়। ১৭৫০ সালের দিকে ব্রিটিশদের বিপক্ষে ফরাসি-বাংলা জোট গঠনের সম্ভাবনা ইংরেজ কোম্পানির জন্য এক সংকটপূর্ণ পরিস্থিতি তৈরি করে। এই পরিস্থিতিতে কোম্পানির কর্মচারীদের ব্যক্তিগত ব্যবসা ফিরে পেতে হলে ফরাসিদের বিতাড়িত করতে হতো এবং রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করতে হতো, যা শুধু ব্যক্তিগত ব্যবসায়ের স্বার্থই সংরক্ষণ করত না, সরবরাহের উৎস, বাজারসমূহ, বণিক ও তাঁতশিল্পের ওপরও নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত করবে।[৪] সুশীল চৌধুরীর মতে, ইংরেজ কোম্পানির কর্মচারীদের এ ধরনের আচরণ এবং তাদের ব্যবসা বাড়ানোর কার্যাবলি এবং যদি সম্ভব হয় এ প্রক্রিয়ায় ব্রিটেনের জাতীয় স্বার্থ রক্ষা করা (যা ছিল তাদের কাছে গৌণ) উপসাম্রাজ্যবাদ হিসেবে বর্ণনা করা যায়।[৫]

এ পর্যায়ে কয়েকটি মন্তব্য প্রাসঙ্গিক হবে আমাদের, যদি সুশীল চৌধুরীর তথ্যের ওপর নির্ভর করতে হয় তবে বলতে হয় যে কোম্পানি মাদ্রাজ কাউন্সিলের নির্দেশের বাইরে চলে গিয়েছিল। ক্লাইভ ও ওয়াটসনকে বলা হয়েছিল ক্ষমতায় একটি পরিবর্তন আনার জন্য (অর্থাৎ ক্ষমতাসীন নবাবের পরিবর্তে অন্য কাউকে ক্ষমতায় বসাতে), বাংলা জয় করার জন্য নয়। সুশীল চৌধুরী যথার্থই উল্লেখ করেছেন যে ইংরেজ ও ফরাসি কর্মকর্তারা মাঝেমধ্যে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের কথা বলতেন। দ্বিতীয়ত, সুশীল চৌধুরী কোম্পানির কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ব্যক্তিগত ব্যবসা রক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন, যা কোম্পানির পলাশী ষড়যন্ত্রে জড়ানোর পেছনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারণ, সুশীল চৌধুরীর এই যুক্তি একেবারেই নতুন। ফরাসিদের উঠতি বাণিজ্যের বিপরীতে ইংরেজ কোম্পানির কর্মচারীদের ব্যক্তিগত বাণিজ্য হ্রাস পাওয়ার তার যুক্তির পক্ষে তিনি যে তথ্য-উপাত্ত উল্লেখ করেছেন তা প্রণিধানযোগ্য। কিন্তু এখানে মনে হচ্ছে তিনি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র সমস্যার (যেমন ব্যক্তিগত বাণিজ্য) ওপর অধিক জোর দিচ্ছেন এবং ফরাসি-বাংলা জোট গঠনের মতো বড় বিষয়কে খাটো করে দেখছেন। এ

হুমকিকে মাদ্রাজ কাউন্সিল গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করেছিল কেননা ক. দাক্ষিণাত্যে অ্যাংলো-ফরাসি প্রতিদ্বন্দ্বিতার অভিজ্ঞতা খ. সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধের প্রভাব[৬] গ. ক্ষমতাসীন নবাবের ফরাসিপ্রীতি ও ইংরেজবিদ্বেষ। কলকাতা পুনরুদ্ধার, আলীনগর চুক্তির অবসান এবং চন্দননগর দখলের পরও সিরাজউদ্দৌলা যখন ফরাসি কর্মকর্তাকে তার দরবারে আশ্রয় দিয়েছিলেন এবং বুশির সঙ্গে সামরিক সহায়তার জন্য নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করেছিলেন। এসব অবশ্য ইংরেজ কোম্পানির জন্য সিরাজউদ্দৌলাকে অপসারণ করে অধিক বিশ্বাসযোগ্য কাউকে ক্ষমতায় বসানো বিষয়ে নতুন আবশ্যকতা যোগ করেছিল। মনে হচ্ছে যে এটা ছিল সেই পর্যায় যখন ইংরেজ কর্মকর্তারা উমিচাঁদের মাধ্যমে মুর্শিদাবাদ দরবারের ষড়যন্ত্রকারীদের সঙ্গে সমঝোতা শুরু করেছিল। আমরা যদি পলাশী যুদ্ধের কারণ খুঁজতে এভাবে এগোতে থাকি দেখতে পাব যে এ ক্ষেত্রে রজত রায়ের যুক্তি অধিক গুরুত্ব বহন করে। দুর্ভাগ্যক্রমে, পলাশী-পূর্ব মীর জাফরের সঙ্গে বোঝাপড়া[৭] এমন কিছু প্রমাণ করে না যে ইংরেজ কোম্পানির কোনো রাজনৈতিক অভিলাষ ছিল : কোম্পানি ফরাসি হুমকিতে অধিক উদ্বিগ্ন ছিল, সুতরাং তারা মীর জাফরের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি আদায় করে যে কোম্পানির শত্রুকে (ফ্রান্স) তার নিজের শত্রু হিসেবে গ্রহণ করবে।

এরপর দেখা যায় যে সিরাজউদ্দৌলাকে ক্ষমতাচ্যুত করে নতুন নবাবকে ক্ষমতায় বসানোর স্বার্থে মুর্শিদাবাদের সভাসদ ও ইংরেজ কোম্পানি একত্র হয়। তার পরও প্রশ্ন থেকে যায় যে কে প্রথম কার সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল এবং কে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল? সুশীল চৌধুরীর মতে, কেবল কোম্পানি ষড়যন্ত্র গঠনের প্রথম পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি, কোম্পানি এর চূড়ান্ত রূপ দান করেছিল এবং তা বাস্তবায়িত হয়েছিল। অন্যদিকে রজত রায়ের মতে, ষড়যন্ত্র গঠনে প্রথম পদক্ষেপ অভ্যন্তরীণভাবেই নেওয়া হয়েছিল। সমস্যার প্রকৃতি থেকে এটা প্রকৃতপক্ষে নির্ণয় করা কঠিন যে কোন পক্ষ প্রথম পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল। ক্লাইভের ষড়যন্ত্রে যোগ দেওয়ার প্রস্তাব নিয়ে আলোচনার কার্যবিবরণী থেকে রজত রায় যে উদ্ধৃতি দিয়েছেন তাতে মনে হয় নবাবের দরবারের অসন্তুষ্ট ব্যক্তিরাই ক্ষমতা দখলের জন্য অধিক আগ্রহী ছিল। উদ্ধৃতিটি এরূপ : 'নবাব সকল শ্রেণী ও পেশার মানুষদের নিকট ঘৃণিত; কর্মকর্তাদের প্রতি তাঁর দুর্ব্যবহার তার প্রতি সেনাবাহিনীর আনুগত্যও কমিয়ে দিয়েছিল এবং একটি বিপ্লব ছিল সর্বসাধারণের দাবি, এটা অবশ্যম্ভাবী ছিল যে একটি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে (এবং সফলভাবেই) আমরা সহায়তা করি আর না করি।[৮]

ষড়যন্ত্রকারীদের পক্ষে মীর জাফর ও ইংরেজ কোম্পানির পক্ষে ক্লাইভের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরের পর ১৭৫৭ সালের ২৩ জুন পলাশীতে দুই পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ হয়।

ইংরেজদের দলে ছিল গোলন্দাজ পদাতিকসহ ৯০০ গোরা, ১০০ দেশি তোপচী এবং ২১০০ তেলেঙ্গা। অনেকের মতে, ৫০ হাজার সেনা ছিল। কিন্তু অবস্থাদৃষ্টে মনে হয় মীর জাফরের অধীন সৈন্যসংখ্যা ছিল তিন হাজার, যারা যুদ্ধে অংশ নেয়নি, আর যারা যুদ্ধে অংশ নিয়েছিল তাদের সংখ্যা সাত-আট হাজার। কিন্তু প্রকৃত বিচারে পলাশীর যুদ্ধ কোনো বড় যুদ্ধ ছিল না। বলতে গেলে সেটি যুদ্ধই নয়, ইংরেজিতে যাকে বলে Skirmish অর্থাৎ বিচ্ছিন্ন সংঘাত। প্রথমদিকে যুদ্ধে নবাবের সৈন্যবাহিনী সাফল্য অর্জন করেছিল, যদিও মীর জাফর এতে অংশ নেয়নি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মীর জাফরের বিশ্বাসঘাতকতায় নবাবের বাহিনী পরাজিত হয়। পাটনায় পালিয়ে যাওয়ার পথে সিরাজউদ্দৌলা ধৃত হন এবং পরে মুর্শিদাবাদে ঘাতকের হাতে নিহত হন। সন্ধির শর্ত মোতাবেক মীর জাফর বাংলার মসনদে উপবিষ্ট হন।

সুশীল চৌধুরী তাঁর প্রারম্ভিক মন্তব্যে বলেছেন, '১৭৫৭ সালে ইংরেজদের বিজয়ের মাধ্যমে যে বিপ্লব ঘটেছিল, তা কেবল ভারতের ইতিহাসেই নয়, বিশ্বের ইতিহাসেও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বস্তুত পলাশীই ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করে।'[৯] এ প্রসঙ্গে কিছু বক্তব্য প্রাসঙ্গিক হবে। প্রথমত, 'ব্রিটিশদের বাংলা বিজয়ে' পলাশীই প্রধান ভূমিকা পালন করেনি। এটা সত্য যে ইংরেজ কোম্পানি, বিশেষ করে ক্লাইভ খুব ক্ষমতাধর হয়ে উঠেছিল। কিন্তু এটা এক দিনে হয়নি। কয়েকটি পরিস্থিতি ক্লাইভের উত্থানে সহায়ক পরিবেশ তৈরি করেছিল। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, যেহেতু মীর জাফর ক্লাইভকে ৩০ মিলিয়ন রুপি দিয়ে দেউলিয়া হয়ে পড়েছিল, সে তার সৈন্যদের বেতনাদি পরিশোধ করতে না পারায় তার সৈন্যরা বিদ্রোহ করল। নবাবের আমন্ত্রণে ক্লাইভ এই বিদ্রোহ মোকাবিলা করে, কিন্তু এর জন্য মূল্য দিতে হয়েছিল। এভাবে পরিস্থিতি যতই তার আয়ত্তের বাইরে যাচ্ছিল, মীর জাফর ততই ক্লাইভের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ছিল। দ্বিতীয়ত, কোম্পানি বাংলায় যে ক্ষমতা অধিকার করেছে তার আনুষ্ঠানিক কোনো ভিত্তি ছিল না। তৃতীয়ত, ইংরেজ কোম্পানি পলাশীতে বিজয়ী হয়েছে নবাবের সেনাপতির (মীর জাফরের) বিশ্বাসঘাতকতায়। কিন্তু মীর জাফরের বিরুদ্ধে 'মহা বিশ্বাসঘাতকতার' অভিযোগ আনা যায় না। কারণ সে যুদ্ধের গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে সৈন্য পাঠাতে অস্বীকার করেছিল, এ জন্যও নয় যে সে চেয়েছিল ইংরেজরা জয়ী হোক, সে নিজে নবাব হতে চেয়েছিল। এই পরিপ্রেক্ষিতে বক্সারের যুদ্ধ বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল। কারণ এ সময়ে ইংরেজরা কেবল মীর কাসিমের (তৎকালীন বাংলার নবাব) সৈন্যবাহিনীকেই নয়, মুগল সম্রাট শাহ আলম ও অযোধ্যার নবাবকেও পরাজিত করে। অধিকন্তু এ যুদ্ধের ফলাফল ষড়যন্ত্র দ্বারা নয় বরং ইংরেজদের উন্নত যুদ্ধ শক্তির মাধ্যমে নির্ধারণ হয়। আবার বক্সার যুদ্ধ জয়ের

ফলেই ইংরেজ কোম্পানি বাংলার দিউয়ানি লাভ করেছিল, যা তাদের কর্তৃত্বকে একটি আনুষ্ঠানিক ভিত্তি দান করে। এভাবে বিবেচনা করলে বক্সার জয়ই ইংরেজদের প্রকৃত ক্ষমতার উৎস।

সম্পদ পাচারের সূত্রপাত

উনিশ শতকের সপ্তম দশকের অন্যতম আলোচ্য বিষয় ছিল ভারত থেকে ইংল্যান্ডে সম্পদের পাচারের প্রসঙ্গ। দাদাভাই নওরৌজি থেকে শুরু করে প্রত্যেক জাতীয়তাবাদী লেখক এ বিষয় নিয়ে বারবার কথা বলেছেন এবং সম্পদ পাচার প্রশ্নটি ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে অভিযোগের একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রে পরিণত হয়। ঔপনিবেশিক আমলাতন্ত্র এ বক্তব্যের বিরোধিতা করে। এভাবে যে বির্তকের সূত্রপাত হয়েছিল তা অদ্যাবধি চলছে। যা হোক, যদিও সম্পদের পাচার বিষয়টি নিয়ে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে প্রবল বিতর্ক শুরু হয়েছিল, কিন্তু সম্পদের পাচার শুরু হয়েছিল বহু আগেই, বস্তুত পলাশীর পরাজয়ের ঠিক পরেই। ঔপনিবেশিক কালের আগে বাংলা থেকে কোম্পানির রপ্তানির (বিশেষ করে সুতি বস্ত্র) প্রায় ৭০ ভাগ মূল্য পরিশোধ করা হতো ইংল্যান্ড থেকে আমদানি করা সোনা রুপা দ্বারা[১০], কারণ আনীত পণ্যের বাজার এখানে খুব সীমিত ছিল। আঠার শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাংলা থেকে কোম্পানির রপ্তানির পরিমাণ বেড়ে যায়। কিন্তু আগের মতোই আমদানি ছিল রপ্তানির চেয়ে অনেক কম। এ অবস্থায় সোনা-রুপার বাংলামুখী প্রবাহ বিদ্যমান থাকার কথা ছিল। কিন্তু তা ঘটেনি। অন্যদিকে পলাশীর পরপরই সোনা-রুপার প্রবাহ কেবল বন্ধই হয়নি, বরং এ সময় তার উল্টো স্রোত বইতে শুরু করল। এভাবে, রপ্তানির উদ্বৃত্ত কোনো বিনিময় ছাড়াই ইংল্যান্ডে নিষ্ক্রমণ হতে থাকে। সম্পদ নিষ্ক্রমণ হতে থাকে দুই ভাবে: ক. কোম্পানির কর্মচারীদের ব্যক্তিগত ব্যবসায়ের মাধ্যমে; ও খ. ১৭৫৭-৬৫ সাল পর্যন্ত কোম্পানির নিজস্ব ব্যবসায়িক ক্ষমতাবলে এবং ১৭৬৬ সাল পরবর্তীকালে ক্ষমতাসীন শাসক হিসেবে।

কোম্পানির কর্মচারীদের ব্যক্তিগত সম্পদের উৎস কী ছিল এবং কীভাবে এ সম্পদ ইংল্যান্ডে স্থানান্তর হতো? ব্যক্তিগত সম্পদ কয়েকটি পন্থায় অর্জিত হতো। প্রথমত, কোম্পানির বিভিন্ন পদস্থ কর্মকর্তা-কর্মচারী, পরিচালক ও গভর্নর জেনারেলসহ সবাই পলাশী-পূর্ব বংশানুক্রমিক নবাবদের কাছ থেকে প্রচুর পরিমাণে উপহার-উপঢৌকন পেত। বস্তুত, প্রত্যেক নতুন নবাবের ক্ষমতায় বসানোর অনুষ্ঠানটি ছিল কোম্পানির জন্য কিংবদন্তির সেই প্যাগোডা-ট্রি ঝাঁকি দেওয়ার মতোই একটি উপযুক্ত সুযোগ। পলাশী পরবর্তীকালে যখন মীর জাফর নবাব হলেন তখন ব্রিটিশ কর্মকর্তা এবং সৈন্যরা ১২ লাখ পাউন্ড পেয়েছিল[১১] যা থেকে ক্লাইভ নিজে পেয়েছিল ৩১,৫০০ পাউন্ড। যখন নাজিমুদ্দৌলা ১৭৬৫ সালে

ক্ষমতা গ্রহণ করলেন তখন উপহার ২৩০ হাজার পাউন্ড বাড়ল।[১২] ১৭৫৭ থেকে ১৭৬৫ সাল পর্যন্ত বাংলায় নবাব পরিবর্তনের মাধ্যমে কোম্পানির কর্মকর্তা-কর্মচারীরা আনুমানিক ২.২ মিলিয়ন অঙ্কের অর্থ লাভ করে। এ সময়ে ১০.৭ মিলিয়ন থেকে ৩.৭ মিলিয়ন পাউন্ড নগদ এবং ৭.০ মিলিয়ন ভূমি রাজস্ব ছাড়াই কোম্পানি ওই বাড়তি আয় করেছিল।[১৩] ব্যক্তিগত পর্যায়ে ক্লাইভ ছিল সর্বোচ্চ সুবিধা ভোগকারী এবং পলাশীর ঠিক পরেই তিনি তাঁর বাবাকে জানান যে মীর জাফর তাঁকে ৩ মিলিয়ন পাউন্ডের মতো অর্থ দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল এবং 'তার দানশীলতা আমাকে আমার নিজ দেশ ত্যাগে সামর্থ্য জুগিয়েছিল, যা ছিল আমার আশাতীত'।[১৪] ১৭৬৫ সাল পর্যন্ত উপহার পাওয়ার এ রীতি প্রচলিত ছিল, কেননা গভর্নর হেস্টিংস এবং উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা উপহার হিসেবে ৬.৩ মিলিয়ন রুপি মূল্যের মুক্তা ও রত্ন গ্রহণ করেছিলেন।

কোম্পানির কর্মচারীদের ব্যক্তিগত বাণিজ্য ছিল তাদের অর্থ উপার্জনের আরেকটি উৎস। কোম্পানি বাংলা থেকে যেসব পণ্য রপ্তানি করত তা বিনা শুল্কে দেশের ভেতর দিয়ে চলাচলের অনুমতি দেওয়া ছিল। পলাশীর জয় কোম্পানিকে এক কর্তৃত্বপূর্ণ অবস্থান দিয়েছিল এবং এর যেসব কর্মচারী দেশের অভ্যন্তরে বাণিজ্যে লিপ্ত ছিল, তারাও এখন এ সুবিধা দাবি করে। অধিকন্তু তারা শিগগিরই লবণ, তামাক ও সুপারির ব্যবসা শুরু করে, যা আগে ইউরোপীয়দের জন্য নিষিদ্ধ ছিল। কোম্পানির কর্মচারী এবং গোমস্তারা বিনা শুল্কে পণ্য এক স্থান থেকে অন্য স্থানে বহন করত, যেখানে অন্য সব ব্যবসায়ীর জন্য নির্ধারিত ছিল চড়া শুল্ক। এ প্রক্রিয়ায় স্থানীয় বাণিজ্য ধ্বংস করা হয় এবং ভারতের অন্য অংশ থেকে আসা ও প্রতিবেশী দেশের সঙ্গে বাণিজ্য প্রতিরোধ করা হয়েছিল এবং স্থলবাণিজ্য প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। কোম্পানির কর্মচারীদের ব্যক্তিগত বাণিজ্যের অনেক প্রমাণ অনেক ইংরেজ লেখক তাঁদের লেখায় রেখে গেছেন। উদাহরণস্বরূপ, ঐতিহাসিক জেমস মিল দুঃখ প্রকাশ করে বলেন যে কোম্পানির কর্মচারীদের আচরণ 'ক্ষমতা ও স্বার্থের সবচেয়ে লক্ষণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করে, যা ন্যায়বিচার এমনকি লজ্জার সকল বোধকে শেষ করে দেয়'।[১৫] এ ধরনের ব্যক্তিগত বাণিজ্য ১৭৬৫ সালের দিকে বন্ধ হয়। যা হোক, খুব শিগগির কোম্পানির কর্মচারীরা একটি নতুন উপায় তৈরি করতে চেষ্টা শুরু করে, যেহেতু ১৭৭০ সালের দুর্ভিক্ষ প্রদেশে আঘাত হানে। ইংরেজদের গোমস্তারা চাল ব্যবসায়ীদের বাধ্য করে সবচেয়ে কম দামে চাল বিক্রি করতে এবং তারপর তারা তা সবচেয়ে বেশি দামে বিক্রি করে। অধিকন্তু গোমস্তাদের সাহায্যে তারা তাঁতিদের অর্ধেক মূল্যে ভাগ বসায়। ওয়ারেন হেস্টিংসের শাসনকালে লাভজনক গোপন চুক্তি কোম্পানির কর্মচারীদের অন্য একটি লাভজনক আয়ের উৎস ছিল। উদাহরণস্বরূপ স্টিফেন সালিভান নামের এক ইংরেজ এক সিলিং ও

বিনিয়োগ না করে পাওয়া একটি আফিম কন্ট্রাক্ট অন্য একজন ইংরেজের কাছে ৪০ হাজার পাউন্ডে বিক্রি করে, পরবর্তী সময়ে সে আবার একই কন্ট্রাক্ট আরেকজনের কাছে ৬০ হাজার পাউন্ডে বিক্রি করেন এবং চূড়ান্ত ক্রয়কারী প্রচুর লাভ করেছিল। ব্রিটেনের কেউ কেউ কোর্ট অব ডিরেক্টর থেকে 'ভারতের একজন বণিকের মতোই এখানে ব্যবসা-বাণিজ্য করার' অনুমোদন পেয়েছিল। স্বাধীন বণিক হিসেবে পরিচিত এরাও বাংলায় প্রচুর ব্যক্তিগত ঐশ্বর্য তৈরি করেছিল।[১৬]

১৭৫৭ থেকে ১৭৬৫ সালে দিউয়ানি লাভ করার মাধ্যমে কোম্পানির নিজস্ব ব্যবসা শুরু হয় এবং ১৭৬৫ সাল থেকে ইংরেজ শাসকেরা ক্ষমতাবলে বাংলা থেকে অর্থ পাচারের অন্য উপায় বের করে। এ পাচারের তিনটি অংশ ছিল—ক. কোনো সামঞ্জস্যপূর্ণ বিনিময় ছাড়াই ইংল্যান্ডে বিনিয়োগ এবং পণ্য রপ্তানি খ. চীনা বাণিজ্যে অর্থায়ন গ. বোম্বে ও মাদ্রাজের প্রশাসনিক ব্যয় এবং তাদের রপ্তানি ব্যয় মেটানো। প্রথম আট-নয় বছর কোম্পানির এ ধরনের নিষ্ক্রান্ত অর্থের উৎস ছিল রাজনৈতিক ও সামরিক সেবা দেওয়ার বিনিময়ে ভারতীয় শাসকদের কাছ থেকে প্রাপ্ত বিরাট অঙ্কের অর্থ এবং ১৭৫৭ সালে ক্লাইভ কর্তৃক কোম্পানির জন্য জমিদারি অধিকারপ্রাপ্ত চব্বিশ পরগনা ও ১৭৬০ সালে প্রাপ্ত বর্ধমান, চট্টগ্রাম ও মেদিনীপুর থেকে। এ ধরনের আয়ের উদ্বৃত্ত প্রকৃত ব্যয়ের পর তার রপ্তানি পণ্য ক্রয়ের জন্য ব্যবহার করা হতো। এ উদ্বৃত্তের আনুমানিক হিসাব প্রায় ৩ মিলিয়ন পাউন্ড। ১৭৫৭-৬৬ সময়কালে কোম্পানির আমদানি বাণিজ্য ছিল এক মিলিয়ন পাউন্ডেরও কিছু ওপরে। এভাবে কোম্পানি যদি ১৭৫৭ (১৭৯৭ সাল পর্যন্ত) সালের পর আর সোনা-রুপার বার আমদানি না করে, তাহলে পলাশী-পরবর্তী প্রথম নয় বছরে কোম্পানির সরাসরি সম্পদ পাচারের পরিমাণ হবে প্রায় দুই মিলিয়ন পাউন্ড।[১৭]

কোম্পানিকে মূলত যে সম্পদ পাচারের জন্য অধিক দায়ী করা হয় তা হলো বাংলার ভূমি রাজস্বের উদ্বৃত্তের বিনিয়োগ। ১৭৬৬ সাল থেকে এ ধরনের বিনিয়োগ নিয়মিত শুরু হয়। দিউয়ানি লাভের পর বাংলার 'অবিশ্বাস্য' সম্পদের ব্যাপারে ইংল্যান্ডে কতগুলো ধারণা তৈরি হয়। কোম্পানির কর্মকর্তাদের অপরিসীম সম্পদ তৈরি এবং ইংল্যান্ডে এর প্রভাব (তথাকথিত 'নবাবদের' বিলাসবহুল জীবনযাপন) এ ধারণাগুলোর জন্য সবচেয়ে বেশি দায়ী ছিল। এ সময় কোম্পানির মালিক ও ব্রিটিশ সরকার বাংলার ভূমি রাজস্ব দাবি করতে শুরু করে। ১৭৬৬ থেকে ১৭৮০ সালে অর্থ পাচার বন্ধ হওয়া পর্যন্ত কোম্পানির সব চাহিদা ও প্রয়োজন মেটানোর জন্য এর পরিমাণ ছিল প্রায় ১০ মিলিয়ন পাউন্ড।[১৮] একপর্যায়ে অ্যাডাম স্মিথ মত প্রকাশ করেন যে, 'এটা প্রতীয়মান হয় যে বণিকদের একটি কোম্পানি সার্বভৌম হওয়া সত্ত্বেও নিজেদের সার্বভৌম ভাবতে অক্ষম...। এক অদ্ভুত যুক্তিতে তারা সার্বভৌমত্বের ধারণাকে বণিকদের স্বার্থের পরিপূরক হিসেবে বিবেচনা করে।' এ

উক্তি বস্তুত সঠিক প্রতীয়মান হবে যদি আমরা বাংলার শাসক হিসেবে কোম্পানির আচরণের দিকে লক্ষ করি। যা হোক, সমস্যাটা হলো ব্রিটিশ সরকারও বণিকদের লালসায় প্রভাবিত হয়েছিল। তবে কোম্পানি সরকার দ্বারা সম্পদ পাচারের আলোচনা এগিয়ে নিতে আমাদের এ বিতর্কের মুখোমুখি হতে হবে যে ১৭৮৩-৯৩-এর দশকে ইউরোপের জন্য রপ্তানিপণ্য কখনোই ব্যয়ের উদ্বৃত্ত রাজস্ব দ্বারা ক্রয় করা হয়নি। কিন্তু কোম্পানির একটি বার্ষিক রাজস্ব প্রতিবেদনে দেখায় যে এ বছরগুলোতে উদ্বৃত্ত ছিল এবং নিষ্ক্রমণ সত্যিকার অর্থে চলমান ছিল। এটা সত্য যে যদি মাদ্রাজ, বোম্বে, ফোর্ট মার্লবোরো এবং সেন্ট হেলেনার ঘাটতি বিবেচনা করি তবে উদ্বৃত্ত পাব না। কিন্তু আমরা এ ধরনের একটি হিসাব গ্রহণ করে বাংলার সম্পদ নিষ্ক্রমণের বিষয়টিকে প্রত্যাখ্যান করতে পারি না।[১৯]

১৭৫৭ সালে আরেক ধরনের নিষ্ক্রমণ শুরু হয় যখন চীনে কোম্পানির বিনিয়োগের তহবিল সরবরাহের জন্য বাংলা থেকে রুপা রপ্তানি শুরু করে। যেহেতু এর বিনিময়ে বাংলায় কোনো পণ্য আমদানি করা হয়নি, সুতরাং এটিও ছিল বাংলা থেকে ইংল্যান্ডে এক প্রকার পাচার। যদিও এভাবে সম্পদ পাচারের কোনো সঠিক হিসাব আমাদের কাছে নেই, কিন্তু সিলেক্ট কমিটির সদস্যদের মতানুসারে ১৭৬৬ সালে এ বাবদ বরাদ্দ ছিল তিন লাখ পাউন্ড। ১৭৮২-৮৩ সালের সিলেক্ট কমিটি প্রতিবছর এর আনুমানিক গড় হিসাব দেখায় এক লাখ পাউন্ড। আবার শুরুর দিকে বোম্বাই ও মাদ্রাজেও সম্পদ পাচার হয়েছিল। একটা আনুমানিক হিসাব করা হয়েছিল যে দিউয়ানি লাভের পর বার্ষিক আড়াই থেকে তিন মিলিয়ন রুপি এ দুটি প্রেসিডেন্সিতে পাঠানো হতো। এর একটি অংশ প্রশাসনিক ব্যয় মেটানোর জন্য এবং আরেকটি অংশ রপ্তানিপণ্য ক্রয়ের জন্য ব্যবহৃত হতো। অন্যদিকে গোপন কমিটির (১৭৭৩) মতে, ১৭৬১-৬২ থেকে ১৭৭০-৭১ সাল পর্যন্ত মাদ্রাজ ও বোম্বাই প্রেসিডেন্সিতে মোট পাচারের পরিমাণ ছিল ২.৩ মিলিয়ন পাউন্ড।

পাচারের পরিমাণ নির্ণয় ও এর প্রভাব

আমাদের কাছে কোম্পানির বাংলা থেকে বিভিন্ন সময়ের সম্পদ পাচারের মোট চারটি হিসাব রয়েছে। প্রথমত, বি. কে. গুপ্তার এক হিসাবমতে, ১৭৫৭-৬৬ সালের মধ্যে বাংলা থেকে মোট পাচারকৃত অর্থের পরিমাণ পাঁচ মিলিয়নের একটু বেশি। এর বিবরণ টেবিল ১-এ দেওয়া হলো। এভাবে, এ ঐতিহাসিকের মতে, ২.৮ মিলিয়ন পাউন্ড ১৭৫৭-৬৫ সালের মধ্যে ইংল্যান্ডে স্থানান্তর করা হয়েছিল। কিন্তু এ তথ্য কোম্পানির কর্মচারীদের ব্যক্তিগত অর্থ পাচারের পরিমাণের সঙ্গে সংযুক্ত নয়। এন কে সিনহার হিসাব অনুসারে ১৭৯৩ সাল পর্যন্ত ইউরোপে গড় অর্থ পাচারের যোগফল দাঁড়ায় ১৬ মিলিয়ন পাউন্ড।[২০] এ হিসাবও এ অর্থে অসম্পূর্ণ যে এখানে চীন, মাদ্রাজ ও বোম্বাইতে অর্থ পাচারের হিসাব যোগ করা হয়নি। ১৭৮৬ সালে জেমস গ্রান্ট এক হিসাবে দেখান ১৮০ মিলিয়ন রুপি (১.৮ মিলিয়ন পাউন্ড) পাচার হয়েছিল প্রদেশের বাইরে।[২১] কিন্তু পুনরায় এই হিসাবও অসম্পূর্ণ, কারণ এতে মাদ্রাজ ও বোম্বাইয়ের পাচার যোগ করা হয়নি। হল্ডেন ফারবার[২২] ১৭৮২-৯৩ সালের পাচারের একই হিসাবে উপনীত হয়েছেন। প্রিন্সেপের[২৩] মতে, প্রতিবছর বাংলা থেকে চার থেকে পাঁচ মিলিয়ন পাউন্ডের মাঝামাঝি পরিমাণ অর্থ পাচার হতো। জে সি সিনহা আরেকটি হিসাব দেন, যেখানে তিনি ১৭৫৭-৮০ সাল পর্যন্ত সামগ্রিকভাবে ৩৮.৪ মিলিয়ন পাউন্ডের একটি হিসাব দেন (টেবিল ২)।

টেবিল ১ : ইংল্যান্ডে সম্পদ পাচার ১৭৫৭-৬৬ সাল

পাচারের স্থান	অর্থের পরিমাণ (পাউন্ড)
ইংল্যান্ডে রপ্তানি	৩,৭৫২,২২১
ইংল্যান্ড থেকে রপ্তানি	৯,৭৭,৩৩৬
ইংল্যান্ডে উদ্বৃত্ত	২,৭৭৪,৮৮৫
ভারত ও চীনের অন্য অংশে রপ্তানি	২,৭৩৩,৬১০
ওই সব অঞ্চল থেকে রপ্তানি	৪,২৩,৯২০
উদ্বৃত্ত	২,৩০৯,৬৯০
মোট উদ্বৃত্ত	৫০,৮৪,৫৪০

উৎস : ফজলুল হকের উদ্ধৃতি, *নবাব সিরাজউদ্দৌলা ও বাংলার মসনদ* (ঢাকা, ২০০৪) পৃ. ১০০

টেবিল ২ : ইংল্যান্ডে সম্পদ পাচার ১৭৫৭-৮০ সাল

উৎস	পরিমাণ (পাউন্ডে)
১. বিদেশি কোম্পানির বিল ক্রয়	২৪ মিলিয়ন
২. কোম্পানির হিসাবে ১৭৫৭-৬৫	২ মি.
৩. চীন থেকে রুপা রপ্তানির কারণে	২.৪ মি.
৪. উদ্বৃত্ত রাজস্বের বিনিয়োগ কোর্ট অব ডিরেক্টরের বিল বিক্রয় থেকে, ১৭৬৬-৮১	১০ মি.
মোট	৩৮.৪ মিলিয়ন

উৎস : জে এস সিনহা, *ইকোনমিক অ্যানালস অব বেঙ্গল* (লন্ডন, ১৯২৭), পৃ. ৫২.

যা হোক, এ হিসাবও অসম্পূর্ণ। কারণ এতে দুটি উপায়ে ইংল্যান্ডের সোনা-রুপার রপ্তানির আর্থিক মূল্য সংযোজন করা হয়নি: ক. চীনে বেসরকারি ইংরেজদের ব্যক্তিগত ব্যবসা খ. বাংলার সরকার কর্তৃক বোম্বে ও মাদ্রাজে। অর্থনৈতিক পাচারকার্য পরবর্তী বছরগুলোতেও অব্যাহত ছিল এবং ১৮৩৮ সালে মার্টিনের লেখায় প্রতিবছরে পাচারের পরিমাণ দেখানো হয় তিন মিলিয়ন পাউন্ড, এভাবে পাচার বৃদ্ধির একটি পরিপূর্ণ কার্যকাল নির্দেশ করে।

ইংরেজ কোম্পানির সমসাময়িক উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা যেমন লর্ড কর্নওয়ালিস, জন শোর, জন সালিভান, জন ম্যালকম, জর্জ উইংগেট এবং রাজনীতিবিদ যেমন এডমন্ড বার্ক মনে করতেন, পাচার ছিল অন্যায্য এবং এর ফলে বাংলার অর্থনীতিতে প্রতিকূল প্রভাব পড়েছিল। কার্ল মার্ক্স একই অবস্থান নিয়েছিল এবং শুরুতে যেমন উল্লেখ করা হয়েছে, দাদাভাই নওরোজির এবং আর সি দত্তের মতো জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকেরাও এ মতাবলম্বী ছিলেন। অন্য চরম মতটি প্রকাশিত হয়েছিল জন ফারবারের দ্বারা, তিনি যুক্তি দেখান যে ভারতীয় সম্পদের বার্ষিক প্রেরণের ফলে ভারতের কোনোই ক্ষতি হতো না। অন্য পক্ষে—

> এখানে অন্তত একটি সম্ভাবনা ছিল যে ১৭৮৩ এবং ১৭৯৩-এর মধ্যবর্তী সময়কালে ভারতের ইউরোপীয়দের কার্যক্রম মূলত ধ্বংসের চেয়ে সম্পদ তৈরিতে নিয়োজিত ছিল... স্বর্ণের বারের মাধ্যমে পাচার বন্ধের তাৎক্ষণিক ফলাফল ছিল বাংলার এক-ষষ্ঠাংশ তাঁতি ও সুতা কাটা কারিগরের বেকারত্ব। আমরা বলতে পারি না যে যদি আঠারো শতকের শেষ ভাগে ইউরোপীয়রা ভারতে খ্যাতি, ঐশ্বর্য ও ক্ষমতার সন্ধানে না আসলে ভারত সামগ্রিকভাবে আরও সুখী ও সমৃদ্ধ হতে পারত কি না।[২৪]

জেমস গ্রান্ট ইংল্যান্ডে পাচারকে বৈধতা দিয়ে বলেন যে মোগল সরকারও বাংলা থেকে ১০ মিলিয়ন রুপি আদায় করত।[২৫] থিওডোর মরিসন মনে করেন, রপ্তানি উদ্বৃত্ত হলেই তাকে পাচার বলা যায় না। এ ছাড়া তিনি এ বিষয়ের ওপরও জোর দেন যে কেউ যখন সম্পদ পাচারের কথা বলেন তখন তাদের এ বিষয়ও মনে রাখা প্রয়োজন যে এ সময়ে ভারতে আধুনিক সেনাবাহিনী গঠন, বেসামরিক এবং বিচারসংক্রান্ত প্রশাসন গঠন, একটি আইনি অবকাঠামো গঠন, ব্যাংকিং, সেচব্যবস্থা এবং রেলওয়ে নেটওয়ার্ক গড়ে উঠেছিল।[২৬] পি জি মার্শালও একই বিষয়ে জোর দেন।[২৭] এডমন্ড বার্ক জেমস গ্রান্টের যুক্তির প্রত্যুত্তরে বলেন যে যদি মুগলরা ত্রাস ও নিপীড়নের মাধ্যমে সম্পদের ভান্ডার গড়ে তোলে, তবু তারা ছিল দেশীয় মজুতদার,... অনেক বিশৃঙ্খলা এবং ক্ষমতার ওপর স্বল্প রাজনৈতিক প্রহরা, প্রকৃতিও ছিল তখন মুক্ত, সম্পদ অর্জনের উৎসগুলোও সম্পূর্ণ শুকিয়ে যায়নি এবং দেশের বাণিজ্য ব্যাপক বিস্তার লাভ করেছিল।[২৮] ১৯৪৭-এর পরবর্তী সময়ের অনেক ভাষ্যকারও অর্থনৈতিক পাচারের সমালোচনা করেন এবং এর ক্ষতিকর প্রভাবগুলোর ওপর দীর্ঘ আলোচনা করেন। বস্তুত, শুরুতে যেমন বর্ণনা করা

হয়েছে সম্পদ পাচারের ওপর বিতর্ক বর্তমানেও চলছে।

অর্থ পাচার বিষয়ে প্রতিটি মতামতের ওপর মন্তব্য করা এ অধ্যায়ে সম্ভব নয়। কিন্তু এ কথার পুনরাবৃত্তি করা প্রয়োজন যে নিশ্চিতভাবেই ইংল্যান্ডে সম্পদ পাচার হতো এবং মোগল সম্রাট বাংলা থেকে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ আদায় করত, এ অজুহাতে এ সত্যকে আড়াল করা যাবে না। অথবা ভারতে সুশাসন সূচনার দ্বারা এ পাচারকে বিচার করা যাবে না। ব্রিটিশ সেনাবাহিনী এবং বেসামরিক প্রশাসন এ সম্পদ দিয়ে ভারতের উন্নয়নের চেয়ে ইংল্যান্ডের সুবিধায় বেশি ব্যবহার করেছে। আরও অধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হলো প্রদেশের জিডিপির কোন অংশটি ইংল্যান্ডে পাঠানো হয়েছিল? ইরফান হাবিবের মতে, বাংলা, বিহার, বেনারস ও উত্তর সরকারের মোট জিএনপি ১৭৮৪-৮৯ সালের মধ্যে ২০ কোটি রুপির নিচে ছিল। ১৭৮৩/৮৪-১৭৯২/৯৩ সালের ফারবারের হিসাব (১.৭৮ মিলিয়ন পাউন্ড) গ্রহণ করে ইরফান হাবিব দেখান যে এটা ছিল মোট জিএনপির শতকরা নয় ভাগ।[২৯] অন্যদিকে, অমিয় বাগচি প্রস্তাব করেন যে বাংলা থেকে বাহ্যিক পাচারের পরিমাণ সম্ভবত ছিল মোট দেশজ বস্তুগত উৎপাদনের ৩ থেকে ৪ শতাংশ। তিনি মনে করেন যে আরও ২ থেকে ৩ শতাংশ সরকার কর্তৃক আরোপিত যুদ্ধব্যয় হিসেবে যোগ হতে পারে। তাহলে দেখা যায় যে হিসাবের আওতায় জনগণের বিনিয়োগ সম্ভাবনাময় সম্পদের ৫ থেকে ৬ শতাংশ পাচার হয়।[৩০] কোন হিসাবটি বেশি নির্ভরযোগ্য তা বাছাই করা বেশ কষ্টসাধ্য। যা হোক, আমরা যদি ইরফান হাবিবের হিসাব ধরে এগিয়ে যাই দেখা যাবে যে ১৭৫৭-৮০ এ সময়ে বাংলা থেকে একটি উল্লেখযোগ্য পরিমাণ সম্পদ পাচার হয়। অন্যভাবে বলা যায় যে বাংলাকে একটি উল্লেখযোগ্য পরিমাণে অর্থ ছাড়তে হয়েছে, যা এ দেশের সরকার বা জনগণ কোনো উৎপাদনশীল খাতে বিনিয়োগ করতে পারত। রপ্তানি উদ্বৃত্ত বিভিন্ন সমাজের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। কিন্তু ভারতের ক্ষেত্রে রাজনীতিকের ক্ষমতার ব্যর্থতার কারণে এ সম্পদের ওপর একটা দীর্ঘ সময় ধরে কোনো নিয়ন্ত্রণ ছিল না।

এ প্রক্রিয়ায় দুটি শ্রেণী বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে—কৃষক ও তাঁতি। কৃষক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে কারণ তারা বর্ধিত হারে ভূমি রাজস্ব দিতে বাধ্য ছিল এবং এভাবে উদ্বৃত্ত তৈরিতে অবদান রাখত, এ উদ্বৃত্তের দ্বারাই প্রদেশ থেকে রপ্তানি পণ্য (বিশেষত সুতিবস্ত্র) সংগ্রহ করা হতো। প্রসঙ্গক্রমে, দিউয়ানি লাভের তিন বছরের মধ্যে কোম্পানি ভূমি রাজস্ব প্রায় ৭০ শতাংশ বর্ধিত করে এবং ১৭৭০ সালের দুর্ভিক্ষের সময়েও কোনো ছাড় দেওয়া হয়নি, যা জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশের প্রাণ কেড়ে নেয়। তাঁতিদের সম্বন্ধে বলতে গেলে তারা তাদের উৎপাদিত পণ্য কোম্পানির প্রতিনিধিদের (গোমস্তা) কাছে বাজারমূল্যের কমে বিক্রি করতে বাধ্য থাকত। মাঝেমাঝেই তারা গোমস্তাদের দ্বারা শারীরিক নির্যাতনের শিকার হতো।

এভাবে কৃষকেরা উচ্চ ভূমি রাজস্ব দিতে এবং তাঁতিরা নিম্ন মূল্যে পণ্য বিক্রয় করতে বাধ্য হতো।[৩১]

ব্রিটিশ অর্থনীতির ওপর এর প্রভাব আলোচনা করতে গিয়ে অনেক ভাষ্যকার দৃঢ় অবস্থান নিয়ে বলেন যে এ অর্থ পাচার শিল্পবিপ্লব সূচনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল। এ মতের গুরুত্বপূর্ণ দুজন সমর্থক হলেন ব্রুকস এডামস ও ওয়ালটার কানিংহাম। তারা দুজনই বাংলার সম্পদের ব্যাপক পাচার এবং ইংল্যান্ডে যন্ত্র বা প্রযুক্তির উদ্ভাবনের খুব গভীর সম্পর্ক নির্ণয় করেছেন, যা শিল্পক্ষেত্রে উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধিতে ভূমিকা রেখেছিল।[৩২] অনেক ভাষ্যকার, বিশেষভাবে মার্ক্সবাদীরা জোর দিয়েছেন ব্রিটিশ বাজারজাতকারীদের ভারতে বাজার দখল করা, যা শিল্পবিপ্লবে তাদের সফল করেছিল, কিন্তু ব্রুকস এডামস এবং কানিংহাম জোর দেন বাংলা থেকে সম্পদ পাচারের ভূমিকার ওপর। এ ধরনের তর্কের বৈধতা নির্ভর করে একটি প্রশ্নের ওপর, শিল্পবিপ্লবের শুরুর দিকে বাংলা থেকে অর্থ পাচার বিনিয়োগে কী পরিমাণ অবদান রেখেছিল। ইরফান হাবিব প্রয়োজনীয় সংখ্যাতাত্ত্বিক প্রমাণ উপস্থাপনের চেষ্টা করেছেন। তাঁর মতে, ১৮০১ সালে ভারত থেকে প্রদেয় করের বিক্রয়মূল্য ৪.২ মিলিয়ন পাউন্ড, যাকে তিনি ধরেছেন ইংল্যান্ডের জাতীয় আয়ের দুই শতাংশ। এ ধরনের হিসাবের ওপর ভিত্তি করে তিনি একটি উপসংহারে পৌঁছান যে এ নিষ্ক্রমণ মূল ব্রিটিশ দেশীয় বিনিয়োগের প্রায় ৩০ শতাংশে গিয়ে পৌঁছায়।[৩৩] তাঁর এ হিসাবে অভিহিত মূল্য গ্রহণ করা কঠিন হবে।[৩৪] যা হোক, আমরা যদি ধারণাও করি যে বাংলা থেকে পাচারকৃত অর্থের অবদান ছিল ৩০ শতাংশ, তাহলেও আমরা ব্রুক এডামস ও কানিংহামের মতো এ সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারি না যে শিল্পবিপ্লবে এর চূড়ান্ত অবদান ছিল।

উপসংহারে পৌঁছানোর আগে অন্য একটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন। জে এন সরকার ১৭৫৭ সালের ২৩ জুন পলাশীর যুদ্ধে সিরাজউদ্দৌলার পতনের ওপর আলোকপাত করতে গিয়ে বলেন,

> আজকের ঐতিহাসিকগণ আজ থেকে দুই শতাব্দী পেছনে তাকিয়ে দেখলে জানবেন যে এটা ছিল গৌরবময় পরিবর্তনের একটা ধীর ও অলক্ষ্য আরম্ভ, যেমনটি বিশ্বের ইতিহাসে অন্যত্র কখনো দেখা যায়নি... যখন ক্লাইভ নবাবকে আক্রমণ করলেন, মোগল সভ্যতা অকেজো বুলেটের মতো হয়ে পড়ল। ইতিবাচক ক্ষেত্রে এর ক্ষমতা ও জীবনীশক্তি নিঃশেষ হয়ে গেল...এ রকম একটি নৈরাশ্যজনক সমাজের ওপর ইউরোপের যুক্তিবাদী উন্নত সমাজ এর অফুরন্ত প্রাণশক্তি নিয়ে আঘাত হানল। প্রথমেই ইংরেজদের দ্বারা পরিচালিত একটি সৎ ও দক্ষ প্রশাসন এদেশের উপর আরোপিত হলো। ... এক প্রজন্মেরও কম সময়ে পলাশী থেকে ওয়ারেন হেস্টিংস (১৭৫৭-১৭৬৬) পর্যন্ত বিশ বছরেই এ দেশ মধ্যযুগের বিবর্ণ ধর্মতান্ত্রিক শাসন থেকে মুক্তি লাভ করে। শিক্ষা, সাহিত্যিক সমাজ, ধর্ম—প্রতিটি ক্ষেত্রই পশ্চিমের সঞ্জীবনী ছোঁয়ায় এক নতুন বেগ লাভ করে। প্রাচ্যের স্থির সমাজের শুষ্ক হার স্বর্গ থেকে প্রেরিত জাদুকরের জাদুদণ্ডের অধীনে, প্রথমে ধীরগতিতে সক্রিয় হয়ে ওঠে....। এটা ছিল প্রকৃত অর্থে পুনর্জাগরণ, ইউরোপের মতোই প্রসারিত, গভীর এবং অধিক বিপ্লবী...।[৩৫]

এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই যে মোগল সভ্যতার পতন, ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির রাজনৈতিক ক্ষমতার উত্থান এবং একটি প্রকৃত রেনেসাঁ আরম্ভে যদুনাথ সরকার উচ্ছ্বসিত হয়েছিলেন। প্রথম থেকেই বাংলার বুদ্ধিজীবীরা, রামমোহন থেকে শুরু করে প্রায় সবাই সমভাবাবেগ প্রকাশ করেন। যা হোক সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হলো যদুনাথ রেনেসাঁর শুরুর সময় (১৭৫৭-১৭৭৬) হিসেবে অন্য সবার চেয়ে ভিন্নমত পোষণ করেন। কিন্তু এটা সর্বজনস্বীকৃত এবং আমাদের এ প্রবন্ধের বর্ণনা থেকে এটা পরিষ্কার হওয়া প্রয়োজন যে ব্রিটিশ শাসনের (কোম্পানি অথবা রাজ) প্রাথমিক বছরগুলো সবচেয়ে অন্ধকারাচ্ছন্ন সময়। উদাহরণস্বরূপ- জন স্ট্রেসি[৩৬], যার পূর্বপুরুষগণ ভারতে উচ্চপদ গ্রহণ করেছিলেন, স্বীকার করেন যে যদিও সুদূর ভবিষ্যতে ব্রিটিশ শাসন ভারতের জন্য উপকারী প্রমাণিত হবে, অন্তত পনেরো বছরের জন্য বাংলার গ্রামগুলো ইংরেজ কোম্পানির দ্বারা পরিকল্পিত উপায়ে বিধ্বস্ত করা হয়েছে মারাঠাদের তুলনায় এবং এর কর্মকর্তাদের ব্যক্তিগত লোভ ছিল এর চালিকাশক্তি। আরও সাম্প্রতিক সময়ে আসলে আমরা দেখি এন কে সিনহা পর্যবেক্ষণ করেছেন যে পলাশী পরবর্তীকালে 'বিশ্ব ইংরেজ কোম্পানির কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বন্ধনমুক্ত করে দিয়েছিল এবং তারাও তাদের স্বৈরতান্ত্রিক শক্তি নিয়ে বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছিল'।[৩৭] সিনহা এখানে উল্লেখ করেননি যে ইংরেজরা তাদের রাজনৈতিক ক্ষমতা দ্বারা কী করেছিল, কিন্তু তার মূল বার্তাটি এখানে যথেষ্ট পরিষ্কার। সুতরাং এটা বিস্ময়কর যে জে এন সরকার কীভাবে পলাশীর ঠিক পরে বাংলায় কোম্পানি এবং এর কর্মচারীদের দুষ্কৃতির বিষয়ে বিস্মৃত হলেন।

উপসংহারে বলা যায়, আমরা এ প্রবন্ধটি শুরু করেছি পলাশীর ষড়যন্ত্রে ইংরেজ কোম্পানি এবং মুর্শিদাবাদ দরবারের ষড়যন্ত্রকারীদের ভূমিকা এবং তাদের স্বতন্ত্র উদ্দেশ্য সম্পর্কে দুজন বিখ্যাত লেখকের মতবিরোধ সম্পর্কে আলোচনার মাধ্যমে। আমরা প্রস্তাব করেছি যে কারা অধিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল এবং কোম্পানির সুদূরপ্রসারী উদ্দেশ্য কী ছিল তা সঠিকভাবে নির্ণয় করা খুব কঠিন, আঠারো শতকের মাঝামাঝিতে তাদের বাংলার রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের পরিকল্পনা ছিল বলে মনে হয় না। এরপর আমরা আলোচনা করেছি পলাশী পরবর্তী অর্থনৈতিক পাচারের প্রশ্ন। উল্লেখ করেছি যে ১৭৮০ সালে বাংলা জিডিপির প্রায় ১০ শতাংশ পাচার হয়েছিল এবং এ ধরনের বিশাল অঙ্কের পাচার বাংলার অর্থনীতির ওপর উল্লেখযোগ্য নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছিল।

তথ্যসূত্র

১. পলাশীর যুদ্ধে সাধারণ মানুষ ছিল নিরব দর্শক। একজন প্রত্যক্ষ সাক্ষী হিসেবে ক্লাইভ বলেন, "অধিবাসীদের যারা সে ঘটনার দর্শক ছিলেন তার পরিমাণ অবশ্যই কয়েক হাজার এবং যদি তারা ইউরোপীয়দের ধ্বংস করতে চাইতো, তাহলে শুধু লাঠি এবং পাথর ছুড়েই তা করতে পারতো" শেখ বারাসাত হোসেনের উদ্বৃতি, *উনবিংশ শতাব্দীর বাংলায় ভারতর্চচা*, (কলকাতা, ২০০৯), পৃষ্ঠা. ৩০৩।

২. রজনীকান্ত রায়, *পলাশির ষড়যন্ত্র ও সেকালের সমাজ*, (কলকাতা, ১৯৯৪), অধ্যায়- ৪।

৩. সুশীল চৌধুরী, *দ্য প্রিলিউড টু এম্পায়ার, পলাশি রেভ্যুলেশন, ১৭৫৭* (নিউ দিল্লি, ২০০০), বিশেষভাবে পঞ্চম অধ্যায়।

৪. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা. ৮০।

৫. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা. ৮০।

৬. ক্লাইভ ও ওয়াটসন ১৭৫৬ সালে মাদ্রাজ থেকে যাত্রা শুরু করে এবং একই সালের মে মাসে 'সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধের' সূত্রপাত ঘটে। তাই আমরা এটা ধরে নিচ্ছি যে ডিসেম্বর মাসের মধ্যে যুদ্ধের সংবাদ মাদ্রাজে পৌছেছিল।

৭. রজতকান্ত রায়, ১৯৯৪, পৃষ্ঠা. ২২৯-৩০।

৮. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা. ২২৩।

৯. সুশীল চৌধুরী, ২০০০, পৃষ্ঠা. ১।

১০. ১৭০৮-৫৭ সালের মধ্যে সোনার বারের আমদানি ছিল ১৯,৬৯৮,৭০৯ পাউন্ড। যেখানে পণ্যদ্রব্যের আমদানির পরিমাণ ছিল ৬,৮১৮,৭৪৯ পাউন্ড। এর মধ্যে পশমি দ্রব্যের পরিমাণই ছিল ৭১ শতাংশ। বিস্তারিত দেখুন, বি এল গাঙ্গুলি, *ইন্ডিয়ান ইকনমিক থট* (নিউ দিল্লি, ১৯৭৮) পৃ. ২১।

১১. আর. সি. দত্ত, *দ্য ইকনমিক হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়া*, ভলিউম ১, (নিউ দিল্লি, ১৯৭০), পৃষ্ঠা. ২২।

১২. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা. ২২।

১৩. সুশীল চৌধুরী, ২০০০, পৃষ্ঠা. ১৬২।

১৪. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা. ১৬৩।

২৫. আর. সি. দত্তের উদ্বৃতি, ১৯৭০, পৃষ্ঠা. ২০।

৩৬. বিস্তারিত দেখুন, এন. কে. সিনহা, *ইকনমিক হিস্ট্রি অব বেঙ্গল*, ভলিউম ১, (কলকাতা, ১৯৬৫), পৃষ্ঠা. ২২৫।

৪৭. জে. সি. সিনহা, *ইকনমিক এনালস অব বেঙ্গল* (লন্ডন, ১৯২৭), পৃষ্ঠা. ৪৮।

৫৮. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা. ৫১।

৬৯. এন. কে. সিনহা, ১৯৬৫, পৃষ্ঠা. ২৩১।

২০. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা. ২৩১।

২১. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা. ২৩৬।

২২. হল্ডেন ফারবার, *দ্য জন কোম্পানি ওয়ার্ক* (কেমব্রিজ, ১৯৪৮), পৃষ্ঠা. ৩১৬।

২৩. অমিয় কে. বাগচির উদ্বৃত, *দ্য পলিটিক্যাল ইকনমি অব আন্ডারডেভেলপমেন্ট* (কেমব্রিজ, ১৯৪৮), পৃষ্ঠা. ৮১।

২৪. ফারবার, পৃষ্ঠা. ২১১-১২।

২৫. এন. কে. সিনহা, ১৯৬৫, পৃষ্ঠা. ২৩২।

২৬. টি. মরিসন, *ইকনমিক ট্রানজিশন ইন ইন্ডিয়া*, সুবোধ কে. মুখোপাধ্যায়ের উদ্বৃত, *বাংলার আর্থিক ইতিহাস (অষ্টাদশ শতাব্দী)*, পৃষ্ঠা. ১৪২।

২৭. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা. ১৪২।

২৮. আর. সি. দত্তের উদ্বৃত, পৃষ্ঠা. ৩৩।

২৯. ইরফান হাবিব, *এসেস ইন ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি* (নিউ দিল্লি, ১৯৫৫), পৃ. ২৭৪। এ গ্রন্থে ৩৬০ পৃষ্ঠায় ১৮৮২ সালে ভারতের মোট সম্পদ পাচারের পরিমাণ দেখানো হয়েছে ১,৩৫৫ মিলিয়ন রুপি বা জিডিপি'ও ৪.১৪ শতাংশ। তিনি বলেন "এভাবে সঞ্চয়ের ধারাবাহিক ক্ষতি যে কোন অর্থনীতিকে পঙ্গু করে দেয়।

৩০. অমিয় বাগচি, ১৯৪৮, পৃষ্ঠা. ৮১।

৩১. দেখুন, এন. কে. সিনহা, ভলিউম ১ ও ২।

৩২. তারা চাঁদ, *হিস্ট্রি অব দ্য ফ্রিডম মুভমেন্ট ইন ইন্ডিয়া*, ভলিউম ১, (নিউ দিল্লি, ১৯৬১), পৃষ্ঠা. ৩৮৮-৮৯।

৩৩. ইরফান হাবিব, ১৯৫৫, পৃষ্ঠা. ২৭৪।

৩৪. এ হিসাবের মূল উৎস আমি সংগ্রহ করতে পারিনি। তাই আমি এ তথ্য বা হিসাব সম্পর্কে কিছু বলা থেকে বিরত থাকলাম।

৩৫. জে. এন. সরকার, *হিস্টোরি অব বেঙ্গল*, ভলিউম ২, (ঢাকা, ২০০৬), পৃষ্ঠা. ৪৯৭-৯৮।

৩৬. তারা চাঁদ, পৃষ্ঠা. ৩৯০।

৩৭. এন. কে. সিনহা, ১৯৬৫, পৃষ্ঠা- ৩২।

অনুবাদ : **রেহানা পারভীন**

সীমান্ত চিন্তা

মিয়ানমার-বাংলাদেশ সীমান্তে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অস্ত্র ও গ্যাসপ্রবাহ

ভিলেম ভ্যান শেন্ডেল

সারসংক্ষেপ

মিয়ানমার-বাংলাদেশ সীমান্তভূমি জায়গাটি বিশ্বের প্রান্তিক এলাকা ধরা হয় বলে সাম্প্রতিক বিশ্বের শক্তির তালিকায় বাংলাদেশ বা মিয়ানমার কোনোটাই তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়। মিয়ানমার-বাংলাদেশ সীমান্তভূমির সীমানা চিহ্নিত নেই এবং না থাকার কারণে সাগরে মিয়ানমারের এলাকা চিহ্নিত করার জন্য এবং বঙ্গোপসাগর থেকে আগত জাহাজগুলোকে দিকনির্দেশনা দেওয়ার জন্য নাফ নদীর মুখে বয়াগুলো অবস্থিত। সীমানা চিহ্নিত না থাকার কারণে সীমান্তে বসবাসকারীদের সম্পত্তি লুট করা সাধারণ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং যখন তারা আত্মরক্ষা করতে যায়, তখন সহজেই হতাহতের ঘটনা ঘটে। অস্ত্রের চোরাচালান, হেরোইনের ব্যবসার কাজে সীমান্ত গুরুত্বপূর্ণ পথ হিসেবে কাজ করছে। সীমান্ত এলাকার জনগণ বহু বছরের ভাষা, ধর্ম ও সামাজিক গোষ্ঠীর মিশ্রণের ফল। মিয়ানমার ও পাকিস্তান বা বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠা সীমান্তে কিছু শক্তির ভারসাম্যে বাধা সৃষ্টি করেছে এবং সেখানে সংখ্যালঘু তৈরি হয়েছে। সাম্প্রতিক সময়ে সীমান্ত এলাকা দুটি ভূরাজনৈতিক খেলায় মেতে উঠেছে। প্রথমটি হলো এশিয়ান হাইওয়ে, দ্বিতীয়টি হলো মিয়ানমার-বাংলাদেশ সীমান্তে প্রাকৃতিক গ্যাস। জীবাশ্ম জ্বালানি সম্পর্কে আন্তর্জাতিক আগ্রহ হঠাৎ করে মিয়ানমার-বাংলাদেশ সীমান্তের গুরুত্ব বাড়িয়ে দিয়েছে। বাংলাদেশ-ভারত-মিয়ানমারের ক্যাম্পেইনের ফলে মিয়ানমার-বাংলাদেশের বেশির ভাগ জনগোষ্ঠী দক্ষিণ-পূর্ব ও দক্ষিণ এশিয়া এবং বহির্বিশ্বে এই সীমান্ত এলাকা পরিচিতি পাচ্ছে। অন্যান্য সীমান্তের মতো মিয়ানমার-বাংলাদেশ সীমান্ত গবেষণার জন্য জরুরি। প্রবন্ধটি লেখকের অনুমোদন সাপেক্ষে *কিয়োটো রিভিউ অব সাউথইস্ট এশিয়া* (আগস্ট ২০০৬) থেকে নেওয়া হয়েছে।

মুখ্য শব্দগুচ্ছ : মিয়ানমার-বাংলাদেশ সীমান্ত, নদীর বয়া, দক্ষিণ এশিয়া এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, সীমান্ত অধিবাসী, সীমান্তে অবাধে যাতায়াত, সীমান্ত বাণিজ্য, সীমান্তে সংখ্যালঘু ও প্রবাসী, সীমান্তের ভূরাজনীতি।

প্রারম্ভিক কথা

মিয়ানমার-বাংলাদেশ সীমান্তভূমি প্রথম দর্শনে বিশ্বের প্রান্তিক এলাকা বলে মনে হয়। সাম্প্রতিক বিশ্বের শক্তির তালিকায় বাংলাদেশ বা মিয়ানমার কোনোটাই তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়। এসব সমাজের সীমানা বা ঘটনাপ্রবাহের আবেদন বিশ্ব গণমাধ্যমে নেই বললেই চলে। বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের জাতীয় গণমাধ্যম, এমনকি সীমান্তসংক্রান্ত লেখায়ও তাদের সংযোগকারী সীমান্তভূমির কথা খুব কমই দৃশ্যপটে আসে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, যখন আমরা মিয়ানমারের সীমান্ত সম্পর্কে পড়ি, তখন সেটাকে মিয়ানমার ও থাইল্যান্ডকে সংযোগকারী সীমানা ধরে নিই; আবার যখন বাংলাদেশের সীমানা সম্পর্কে পড়ি, তখন সেটা হয় বাংলাদেশ-ভারত সীমান্ত।



তাই এমন সীমানা সম্পর্কে আলোকপাত করা কেন দরকার, যার কোনো গুরুত্ব সেখানকার অধিবাসী ছাড়া বিশ্বের কোথাও নেই? এর অনেক কারণ আছে। প্রথমত, প্রচলিত ধারণা বা রাজনীতিবিদেরা যেসব বিষয়কে প্রান্তিক করে ফেলেন, বাস্তবে তা এতটা প্রান্তিক হওয়া মোটেও উচিত নয়। দ্বিতীয়ত, রাষ্ট্র ও সমাজ, রাষ্ট্র ও জাতি, রাষ্ট্র ও শাসনব্যবস্থা একই বলে যে অনুমান রয়েছে, সীমান্ত থেকে বিশ্বকে দেখলে এই অনুমানকে চ্যালেঞ্জ করে।[১] তৃতীয়ত, ট্রান্সন্যাশনালিজম সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে শুধু প্রবাসী ও আর্থিক বাজার সম্পর্কে আলোচনা করলে চলবে না, আরও কমিউনিটি 'যারা সীমান্তে বসবাস করে, বেঁচে থাকে, নিয়মিত পার হয় এবং সেখানে নেটওয়ার্ক তৈরি করে', তাদেরও আলোচনায় আনতে হবে।[২]

মিয়ানমার-বাংলাদেশ সীমান্তকে খুব কাছ থেকে দেখলে কিছু অপ্রত্যাশিত কাজের গুরুত্ব পরিলক্ষিত হয়। আমি এখানে সীমান্ত সম্প্রদায় ও আন্তর্জাতিক প্রবাহের মধ্যে সংযোগ তুলে ধরব, যা বৃহৎ পরিসরে গবেষণার কাজে লাগবে।[৩]

নদীর বয়া

নাফ নদী বঙ্গোপসাগরে এসে মেশার আগে মিয়ানমার ও বাংলাদেশের বিভিন্ন পর্বতমালা পার হয়ে এসেছে। পেছনে আরাকান পর্বতমালা এবং সামনে একটি বয়া, যার গুরুত্ব সাধারণ পর্যবেক্ষকের মতো স্পষ্ট বা দৃশ্যমান নয়।

এই বয়াটি দুটি বিশ্বের মধ্যে সীমানা চিহ্নিত করে। এটি বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের সর্বদক্ষিণের সীমানা চিহ্নিতকারী হিসেবে কাজ করে এবং দুটি প্রতিবেশী রাষ্ট্রের ভূমি অধিকারের মধ্যে বৈধ কর্তৃত্ব স্থাপন করে। অনেক রাজনীতিবিদের জন্য এটি বিশ্বের দুটি রাজনৈতিক অঞ্চলের মধ্যে সীমানা নির্ধারণকারী হিসেবে পরিচিত। এখানে আসিয়ান সার্কের সঙ্গে মিলিত হয়। আসিয়ান মানে দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় জাতিসমূহের সংস্থা, কিছু দেশের সমন্বয়, যারা নিজেদের দশ জাতি, এক সম্প্রদায় হিসেবে পরিচয় দেয়। মিয়ানমার ১৯৯৭ সালে এখানে যোগ দেয়। অপরপক্ষে, বাংলাদেশ সাত সদস্যবিশিষ্ট পূর্বের সংস্থা সার্কের (দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা) সদস্য। বয়াটি এভাবে বিশ্বের দুটি অঞ্চল দক্ষিণ এশিয়া ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াকে পৃথক করেছে। দুটি অঞ্চলই তুলনামূলকভাবে নতুন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তীকালে রাজনীতিকদের দ্বারা গঠিত। একাডেমিকগণ অঞ্চলভিত্তিক শিক্ষা তৈরি করেছেন। এটি তাঁরা এমনভাবে তৈরি করেছেন, যা রাজনৈতিক সীমারেখা অনুসরণ করে এবং এটি অনুমান করা হয় যে মিয়ানমার দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অংশ এবং বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার অংশ।[৪] এর ফলে ৬০ বছর ধরে বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের বেশির ভাগ ছাত্রছাত্রী নিজেদের আলাদা ভেবে এসেছে।

কিন্তু ওই সময়ের পূর্বে দৃশ্যপট ভিন্ন ছিল। মিয়ানমার ও বাংলাদেশ পূর্বে একটি রাষ্ট্র দ্বারা শাসিত হতো, তা হলো ব্রিটিশ ভারত। আন্তর্জাতিক সীমানা হিসেবে মিয়ানমার ও বাংলাদেশকে পৃথককারী লাইন তুলনামূলকভাবে নতুন। এটি ব্রিটিশ ভারতের জেলাসমূহের পৃথককারী লাইন হিসেবে এসেছে। ১৯৩৭ সালে যখন এই বিশাল কলোনি বা উপনিবেশ ব্রিটিশ মিয়ানমার ও ব্রিটিশ ভারতে বিভক্ত হয়, তখন এই সীমান্ত আধা আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পায়। এটি সম্পূর্ণ আন্তর্জাতিক হয় যখন ব্রিটিশরা ভারত বা পাকিস্তান (১৯৪৭) এবং মিয়ানমার (১৯৪৮) ছেড়ে যায়। ব্রিটিশ ভারত বিভাজনের ফলে ভারত ও পাকিস্তান দুটি স্বাধীন রাষ্ট্রের সূচনা হয়। এ দুটি রাষ্ট্রের সঙ্গে তখন স্বাধীন মিয়ানমারের সীমান্ত সংযুক্ত। ১৯৭১ সালে পাকিস্তানে একটি যুদ্ধ হয়, যার ফলাফল হিসেবে বাংলাদেশ নামে নতুন রাষ্ট্রের সূত্রপাত ঘটে। এর ফলে মিয়ানমার-পাকিস্তান সীমান্ত মিয়ানমার-বাংলাদেশ সীমান্তে পরিণত হয়। এই প্রবন্ধে শুধু মিয়ানমার ও বাংলাদেশ সীমান্ত নিয়ে আলোচনা করা হবে।

আশ্চর্যজনকভাবে এসব বিন্যাসের পরও এখন পর্যন্ত সীমান্ত কোথায় অবস্থিত

অথবা কতটুকু, সে ব্যাপারে কোনো চুক্তি নেই। মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা সিআইএ ও বাংলাদেশ সরকারের মতে, এটি ১৯৩ কিলোমিটার, কিন্তু মিয়ানমার উৎসের মতে এটি ২৭২ কিলোমিটার।[৫] এটিই একমাত্র সীমান্ত, যা ১৯৬৬, ১৯৮০ ও ১৯৯৮-এর ভূমি সীমান্ত চুক্তিতে চিহ্নিত নেই।[৬] স্বাভাবিকভাবেই সীমানা চিহ্নিত না থাকার কারণে সীমান্তে সংঘর্ষের ঘটনা ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। শুধু সাগরে মিয়ানমার এলাকা চিহ্নিত করার জন্য এবং বঙ্গোপসাগর থেকে আগত জাহাজগুলোকে দিকনির্দেশনা দেওয়ার জন্য নাফ নদীর মুখে বয়াগুলো অবস্থিত। সীমানা খুবই অস্পষ্ট যখন থেকে এটি তৈরি হয়েছে। বিভক্তির পর নাফ নদীর কিছু দ্বীপে মিয়ানমার কর্তৃত্ব স্থাপিত হয়। তখন পাকিস্তান কর্তৃপক্ষ ঢাকা, চট্টগ্রাম ও কক্সবাজারের কার্যালয়ে কাগজপত্র ও মানচিত্রের জন্য সাঁড়াশি অভিযান চালিয়েছে, যাতে দ্বীপগুলোর মালিকানা দাবি করতে পারে। কিন্তু তারা স্বীকার করে যে ১৯৩৭ সালে মিয়ানমারের পৃথককরণের পর নাফ নদীসহ চট্টগ্রাম ও আরাকান জেলাসমূহের সীমানা চিহ্নিত হয়নি। এ সম্পর্কে সাম্প্রতিক রেকর্ড হলো রাজস্ব নিষ্পত্তি মানচিত্র, যা ১৯২৯ সালে তৈরি।[৭]

নব্বইয়ের দশকের শুরুতে নাফ নদীর সঙ্গে সংযুক্ত তাম্বুরু জলপ্রণালি নিয়ে এত দিন পর্যন্ত ব্যবহার করে আসা নাসাকা বাহিনী ও বাংলাদেশের সীমান্তরক্ষীদের মধ্যে বিবাদ হয়। ২০০০ সালের এপ্রিলে মিয়ানমার শেষ পর্যন্ত স্বীকার করে যে এই জলপ্রণালি তাদের নাগালের বাইরে। আরও পূর্ব দিকে সীমান্ত ভূমির ওপর দিয়ে গেছে এবং এখানে সীমান্তের অনিশ্চয়তার ফলাফল মারাত্মক হতে পারে। মিয়ানমারের সশস্ত্র বাহিনী বিভিন্ন স্বাধীনতাকামী বিদ্রোহী গোত্রের সঙ্গে খণ্ডযুদ্ধে লিপ্ত। নব্বইয়ের দশকের শুরুতে কর্তৃপক্ষ সীমান্তে মাইন পোঁতা শুরু করেছিল।[৮]

> এসব বোমা বা মাইন জীবন নেওয়ার ক্ষেত্রে বৈষম্য করে না। এর শিকার যাঁরা হচ্ছেন, তাঁদের মধ্যে বাংলাদেশ বর্ডার গার্ড, নাসাকা বাহিনীর নিরাপত্তারক্ষী, মিয়ানমারের সশস্ত্র বাহিনী, রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশকারী ও বাংলাদেশি কাঠুরে রয়েছে। ছয় বছরে বোমায় ৩৫ বাংলাদেশি নিহত হয়েছেন এবং ২২টি বন্য হাতি ধ্বংস হয়েছে।[৯]

সীমান্ত নিয়ন্ত্রণ নিয়ে মিয়ানমার সীমান্তরক্ষী ও কিছু বিচ্ছিন্নতাবাদী যেমন রোহিঙ্গা সলিডারিটি সংস্থার (আরএসও) মধ্যে প্রায়ই সংঘর্ষ হয়। একবার আরএসও বিদ্রোহীরা বাংলাদেশের সীমান্তে মানব মাইন পুঁতে রাখা ১১ জন রক্ষীকে হত্যা করেছিল। আরেক সংঘর্ষে একজন সীমান্তরক্ষী এবং দুজন রোহিঙ্গা যোদ্ধা নিহত হয়েছিলেন এবং দুই পক্ষ থেকে ৩২ জন আহত হয়েছিলেন।[১০]

সংঘাতপূর্ণ ফলাফল কমানোর জন্য প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলো ১৯৯৮ সালের সেপ্টেম্বরে রেঙ্গুনে একটি সভার আয়োজন করে।[১১] নভেম্বরে একটি ভূ-সীমান্ত চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় এবং তখন থেকে সীমান্ত আলাদা হওয়া শুরু হয়। রাষ্ট্র দুটি এই চুক্তির কোনো রকম অগ্রগতি অর্জন করতে পারেনি। কারণ, যখন থেকে সীমানা

চিহ্নিতকরণ শুরু হয়, তখন থেকে লেমুছড়ি সীমান্তে একটি শক্তিশালী বোমা বিস্ফোরিত হয় এবং সব কাজ বন্ধ হয়ে যায়। ২০০১ সালে যখন নাফ নদীতে বাঁধ তৈরির ব্যাপারে মিয়ানমার-বাংলাদেশের মধ্যে বিরোধ হওয়ার ফলে এবং সীমানা চিহ্নিতকরণের অভাবে ঐকমত্যে পৌঁছানো কঠিন ছিল।[১২] এসব সংঘর্ষের পর একটি জয়েন্ট সার্ভে কমিশন গঠিত হয়, কিন্তু কোনো অগ্রগতি হয়নি।

সীমান্ত অধিবাসী হিসেবে

দুই প্রজন্ম ধরে এখানকার অধিবাসীরা একটি আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত সীমান্তের অন্তর্ভুক্ত জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত হচ্ছে। তাদের অভ্যস্ততার ধরন বিভিন্ন রকম : একটি অথবা দুটি ভাষা আয়ত্ত করা (যদিও সবাই বাংলা অথবা মিয়ানমারের ভাষায় কথা বলে না), দুটি মুদ্রা ব্যবহার করা, অবৈধ সীমান্ত ব্যবসা রোধ করা, সীমান্তের অপর প্রান্তের আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা, সীমান্তে শরণার্থী খোঁজা এবং যখন জরুরি দরকার হয়, তখন সেখানকার সৈন্যদের শান্ত করা। সীমান্ত অধিবাসী হওয়া মানে একটি আজীবন অসমাপ্ত প্রকল্প। এটি যেমন স্থানীয় বিষয় দ্বারা গঠিত, তেমনি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক শক্তি দ্বারাও গঠিত হয়। নিম্নলিখিত উদাহরণগুলোয় এসবের ভিন্ন সমন্বয় প্রকাশ পায়।

সীমান্ত উপেক্ষা করা



যদি রাষ্ট্রগুলো ভূখণ্ডের নিয়ন্ত্রণ নিতে চায়, তাহলে অচিহ্নিত সীমান্তে সংঘর্ষের সৃষ্টি হয়। মিয়ানমার-বাংলাদেশ সীমান্তের অধিকাংশ অংশই সীমান্তরক্ষীহীন থাকে। তাই সীমান্তে জনগণের যাতায়াত তেমন পর্যবেক্ষণে নেই। পূর্বের কঠিন পার্বত্য ভূখণ্ডে মাত্র কয়েকটি সীমান্ত ঘাঁটি রয়েছে এবং রাষ্ট্র এখানে অনুপস্থিত। বাংলাদেশ বর্ডার গার্ডসের মহাপরিচালক অভিযোগ করেন, ১০০ কিলোমিটার পর্যন্ত সীমানা চিহ্নিত নেই এবং নিরাপত্তা নেই কারণ, এখানে কোনো সীমান্ত ঘাঁটি নেই।[১৩] অদৃশ্য বা প্রহরীবিহীন সীমান্ত কোনো সামাজিক বাস্তবতা নয়। যথাযথ নিয়ন্ত্রণের অভাবে সীমান্তের কাছে বসবাসকারী স্থানীয় লোকজন যেমন : ম্রু, মারমা, সাক ইত্যাদি অবাধে যাতায়াত করছে, দুটি দেশের জমিতে চাষাবাদ করছে এবং দুই জায়গাতেই আত্মীয়তা ও সামাজিকতা বজায় রাখছে। রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের অভাব থাকায় তারা বিভিন্ন সন্ত্রাসী কার্যক্রমে জড়িত হয়ে থাকে। সীমান্তে বসবাসকারীদের সম্পত্তি লুট করা সাধারণ ব্যাপার এবং যখন তারা নিজেদের আত্মরক্ষা করতে যায়, তখন সহজেই হতাহতের ঘটনা ঘটে। উদাহরণস্বরূপ, বাংলাদেশি ম্রু অধিবাসীদের যখন মিয়ানমার দিক থেকে ডাকাত আক্রমণ করেছিল, তখন তারা শক্ত প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল। গ্রামবাসী তিনজনকে মেরেছে এবং ১৩ জনকে আহত করেছে, যেখানে শুধু দুজন গ্রামবাসী আহত হয়েছে। অপহরণ করে মুক্তিপণ আদায় আরেক রকম সীমান্ত অপরাধ, যা কিছু বিদ্রোহী গোষ্ঠী দ্বারা সংঘটিত হয় তাদের অর্থনৈতিক জোগানের জন্য। যেমন : আরাকান গণতান্ত্রিক সংস্থা মারমা পুরুষদের জোর করে অপহরণ করে বাংলাদেশ থেকে মিয়ানমায় নিয়ে যায়।[১৪]

বাণিজ্যপ্রবাহে এগিয়ে যাওয়া

বাংলাদেশের দক্ষিণ সীমান্তে কিছু ভূমি মিয়ানমারের দিকে প্রসারিত হয়েছে। রাস্তাটি টেকনাফের ছোট নদীবন্দরে শেষ হয়েছে। নাফ নদীর প্রশস্ততার ফলে সূর্যের আলো মিয়ানমার দিকের একটি প্যাগোডার ওপর পড়ে। মরিচাপড়া উপকূলের মরিচাপড়া জাহাজ এবং কাঠের নৌকাগুলো জোয়ার আসার অপেক্ষায় থাকে। নৌকাগুলো শুধু উচ্চ জোয়ারের সময় কর দিয়ে ঢুকতে পারে। যে নৌকাগুলো মিয়ানমার ও বাংলাদেশি পতাকা বহন করে, তারা ছোট ও পুরোনো। ফলে টেকনাফ একটি ঘুমন্ত এলাকার মতো দেখায় এবং এটি নিরাশাজনক।

টেকনাফ ও মংডুতে বিশ্বের অধিকাংশ দেশ থেকে অবৈধ পণ্য পাচার হয়। স্থানীয় ব্যবসায়ীরা দিনের বেলা যাতায়াতের অনুমতি পান এবং অনেকে অনুমতি ছাড়াই আসা-যাওয়া করেন। বৈধ পণ্য সিঙ্গাপুর থেকে আগত হিসেবে তালিকাভুক্ত হয়। বাংলাদেশ-মিয়ানমারের ব্যবসা প্রমোশন কাউন্সিলের প্রেসিডেন্টের মতে, এসব পণ্যসহ বাংলাদেশ মিয়ানমার থেকে ১৭০ মিলিয়ন ডলার আমদানি করে।[১৫] আনুষ্ঠানিক বাণিজ্যে কিছু পণ্যকে দেখানো হয় কিন্তু বেশির ভাগ বাণিজ্য অবৈধ পণ্যের মাধ্যমেই হয়। এর মধ্যে ৯০ শতাংশের ওপর চোরাচালান পণ্য রয়েছে।[১৬] মিয়ানমার-বাংলাদেশ সীমান্তে যেসব পণ্য আমদানি-রপ্তানি হয়, সেগুলোর অবস্থা আশাব্যঞ্জক। মিয়ানমারের দিক থেকে পণ্য থাইল্যান্ড থেকে আসে নাইলন, দড়ি, হোসপাইপ, প্রসাধনী, মাছ। চায়না থেকে আসে ইলেকট্রনিক পণ্য ও চিনামাটির তৈরি বাসনপত্র, যা সড়কপথে মিয়ানমার হয়ে আসে। মিয়ানমার নিজে কাপড়, মসলা, চিংড়ি, ধান, সিগারেট, হুইসকি, বিয়ার, লবণ ও প্রাচীন জিনিসপত্র

সরবরাহ করে। অস্ত্র ও যুদ্ধের উপকরণ এখান দিয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে প্রবেশ করে।

ছোটখাটো অস্ত্রের চোরাচালান দেখে বোঝা যায়, কীভাবে এই এলাকার বিদ্রোহ ও অননুমোদিত বাণিজ্য একে অপরের সঙ্গে সম্পৃক্ত। আরাকান ও চিন রাষ্ট্রের (মিয়ানমার) বিদ্রোহী গোষ্ঠী, পার্বত্য চট্টগ্রাম ও উত্তর-পূর্ব ভারতের বিদ্রোহী গোষ্ঠীগুলো সীমান্তপথ দিয়ে আসা সরবরাহের ওপর নির্ভরশীল। কিছু অস্ত্র নদীপথে বাংলাদেশ সমুদ্রবন্দরে আসে, তারপর ভারতে পাচার হয়। বাকিগুলো মিয়ানমারের মাধ্যমে সড়কপথে আসে। পাচারকৃত অস্ত্র বিভিন্ন রকম যেমন: হাতবন্দুক ও চকলেট বোমা মহেশখালীতে তৈরি হয়; রাইফেলস, সাবমেশিন বন্দুক, অ্যান্টি-ট্যাঙ্ক যন্ত্র, রকেট লঞ্চার তৈরি হয় যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, ইসরায়েল, চীন ও বেলজিয়ামে।[১৭] স্মল আর্মস সার্ভে ২০০১ অনুযায়ী এই অঞ্চলে অস্ত্রের জন্য বাংলাদেশ সবচেয়ে বড় ট্রানজিট পয়েন্ট। একদিকে এসব অস্ত্র আফগানিস্তান ও পাকিস্তান হয়ে এবং অন্যদিকে থাইল্যান্ড, সিঙ্গাপুর, মিয়ানমার ও কম্বোডিয়া থেকে বাংলাদেশে আসে। সেখান থেকে এসব অস্ত্র সাধারণত উত্তরে ভারতের বিদ্রোহীদের কাছে এবং উত্তর-পূর্ব বা দক্ষিণে এলটিটিইর কাছে যায়।[১৮]

সমুদ্রের কাছের শহর কক্সবাজার এসব ক্ষুদ্র অস্ত্র বাণিজ্যের মাধ্যমে লাভবান হয়। এখানে বাইরের ও বাংলাদেশের ক্রেতারা বহুলাংশে সমুদ্রপথে আসা নতুন বাণিজ্যপণ্যের জন্য আসে। কক্সবাজার সীমান্তের স্থানীয় অস্ত্র বাজারের সঙ্গে সংযুক্ত। যেমন বলা যায় 'ত্রিমুখী পয়েন্ট', যেখানে ভারত, মিয়ানমার, বাংলাদেশ মিলিত হয়েছে। চিন আর্মির সদস্য লালদিনা বলেছেন, এখানে সব পাবেন। যেমন: ছোট বন্দুক থেকে রকেট লঞ্চার, রাশিয়ান কালাশনিকভ থেকে চায়নিজ একে-৪৭, আমেরিকান এম-১৬ থেকে জার্মান এইচকে-৩৩।[১৯] সীমান্তে বাণিজ্য বাড়ার ফলে আগের তুলনায় স্থানীয় উদ্যোক্তা ও রাজনীতিকদের কাছে অবৈধ অস্ত্র বেশি পাওয়া যায় এবং সীমান্ত রাজনীতি আগের চেয়ে বেশি রক্তক্ষয়ী হয়ে গেছে।

আশির দশকে মিয়ানমার হেরোইনের ব্যবসায় সীমান্ত গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যপথ হিসেবে ব্যবহৃত হতো। শান প্রদেশে (পূর্ব মিয়ানমার) হেরোইন তৈরিতে সামরিক বাহিনীর বাধার কারণে এটি বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তের কাছে চিন প্রদেশ স্থাপিত হয়। বিপুল পরিমাণ মিয়ানমার হেরোইন উত্তর-পূর্ব ভারত ও বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকার বাজারে প্রবেশের জন্য চালান করা হতো। এসব বাণিজ্যপথের মাধ্যমে স্থানীয় বাজারগুলোর উন্নতি হয়। শিগগিরই টেকনাফ সীমান্ত হেরোইন ব্যবহারকারীদের মনোযোগের জায়গায় পরিণত হয়। বর্তমানে এই অঞ্চল বিশ্বব্যাপী হেরোইন চলাচলের জন্য অখণ্ড ভূমিতে পরিণত হয়েছে। হেরোইন একটি নিয়মিত বাণিজ্যপণ্যে পরিণত হয়েছে এবং বাংলাদেশের সীমান্তে কিছু আফিম, পপি উৎপাদন শুরু হয়েছে।[২০]

মিয়ানমার থেকে বাংলাদেশে বিভিন্ন রকম পণ্য বাণিজ্য হয়, কিন্তু টেকনাফের নৌকাগুলোতে একইভাবে বিভিন্ন ধরনের পণ্য বাহিত হয়ে মংডু যায়। এর মধ্যে কিছু পণ্য বাংলাদেশের, বাকিগুলো ভারত অথবা আরও দূর থেকে আসে। মিয়ানমায় বাংলাদেশি ও ভারতের পণ্যগুলোর মধ্যে রয়েছে সার, পুরোনো ধাতু, ডাল, বিস্কুট, কেরোসিন, ডিজেল, গর্ভনিরোধক পণ্য, এমনকি চাল।

স্থানীয় অর্থনীতি এই বাণিজ্যের ওপর নির্ভরশীল এবং এখান থেকে সুবিধা পেয়ে থাকে। এই ব্যবসা পরিচালনাকারীরা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই স্থানীয় নন, তাঁরা শহরে বসবাসকারী বড় ব্যবসায়ী এবং তাঁদের সঙ্গে সরকারের গুরুত্বপূর্ণ সংযোগ রয়েছে, যার ফলে এই বাণিজ্য নিষিদ্ধ হয় না। প্রকৃতপক্ষে উচ্চপদস্থ আমলা ও রাজনীতিক এসব অবৈধ ব্যবসার পরিচালক ও অর্থ জোগানদাতা হিসেবে কাজ করেন। কখনো কখনো এগুলো সম্পূর্ণভাবে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। মংডুতে সীমান্তের কাছে অবস্থিত মিয়ানমার মিলিটারি ইন্টেলিজেন্স ব্যাটালিয়ন এমআই-১৮-এর ক্ষেত্রে এমনটিই ঘটেছিল। বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষ ধরার আগে এই ইউনিট তাদের ছয়জন ক্রুবিশিষ্ট সমুদ্রগামী জাহাজ 'স ম্র্যাট রাদানা' নিয়মিত চোরাচালানের কাজে ব্যবহৃত হতো।[২১]

মিয়ানমার ও বাংলাদেশের সব রকম অবৈধ বাণিজ্যে অনেক লাভ হয় কিন্তু এটি কিছুটা বিপজ্জনকও। সীমান্ত ব্যবসায়ীদের আইনের চাইতে বিশ্বাসের ওপর নির্ভর করতে হয় এবং নাফ নদী এমন একটি জায়গা হিসেবে পরিচিত, যেখানে বিশ্বাস সহজেই ভাঙে এবং ব্যবসায়িক অংশীদার লুটেরা হিসেবে পরিণত হতে পারে। এভাবে মংডুর লোকজন (যারা এখন বাংলাদেশের সীমান্তে বসবাস করে) মিয়ানমার পাচারকারীদের কাছ থেকে পণ্য লুট করে এবং তাদের নদীর পানিতে ডুবিয়ে মারে।[২২]

সংখ্যালঘু ও প্রবাসী

১৯৪৭ সালে প্রতিষ্ঠিত আন্তর্জাতিক সীমানা জাতীয় নাগরিকত্বের নতুন ধারণা সৃষ্টি করে। সীমান্ত এলাকার জনগণ বহু বছরের ভাষা, ধর্ম ও সামাজিক গোষ্ঠীর মিশ্রণের ফলাফল। মিয়ানমার ও পাকিস্তান বা বাংলাদেশে জাতি গঠন সীমান্তে শক্তির ভারসাম্যে পার্থক্য সৃষ্টি করেছে, যার ফলে সেখানে কিছু গোষ্ঠী জাতীয় সংখ্যালঘুতে পরিণত হয়েছে। কখনো কখনো সংখ্যালঘুত্বের কারণ অর্থনৈতিক হয়ে থাকে।[২৩] পাকিস্তান বা বাংলাদেশের দিকের রাখাইন, আরাকানভাষী বৌদ্ধদের বেলায় এটি হয়েছে। সীমান্ত প্রতিষ্ঠার পর তারা আবিষ্কার করে যে তাদের জীবিকা বয়নশিল্প হুমকির মুখে এবং তাদের কোথাও যাওয়ার ক্ষমতা

নেই। বিভক্তির ফলে তাদের কাঁচামাল, সিল্ক ও বাজার দুটিই বন্ধ হয়ে যায়। নতুন আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যের বাধার কারণে তাদের তৈরি করা সিল্ক টেক্সটাইল মিয়ানমারের বাজারে পৌঁছাতে পারে না। অনেকে সিগারেট ও চুরুট উৎপাদনে ঝুঁকেছে, যা স্থানীয় তামাক ব্যবহার করে করা যেত। পাকিস্তান সরকার দ্বৈত কর প্রথমে তামাকের ওপর, পরে সিগারেট ও চুরুটের ওপর আরোপ করার আগে এর একটা সমাধানের সম্ভাবনা ছিল। এই কর বসানোর পর বাজার খুঁজে না পাওয়ায় সিগারেট ও চুরুট উৎপাদন বন্ধ হয়ে যায়। স্থানীয় পণ্যের চাইতে বিদেশি সিগারেট ও চুরুটে বাজার ছেয়ে যায় এবং সেগুলো অনেক কম মূল্যে বিক্রি হয়। এর ফলে রাখাইনরা তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে জীবন বাঁচানোর তাগিদে মিয়ানমায় চলে যায়।[২৪] তার পর থেকে বাংলাদেশ থেকে রাখাইন সম্প্রদায় মিয়ানমায় চলে যেতে থাকে এবং এখানে তাদের পরিমাণ ক্রমশ কমে যায়।

সহিংস রাজনৈতিক ধরনের সীমান্ত সংখ্যালঘু তৈরি করার আরেকটি উদাহরণ পাওয়া যায় রোহিঙ্গাদের ভাগ্য দেখলে, যারা চট্টগ্রামের বাংলা ভাষায় কথা বলে এবং ইসলাম ধর্মাবলম্বী। মিয়ানমার রাষ্ট্র রোহিঙ্গাদের মেনে নিতে পারেনি, কারণ তাদের কেউ কেউ উত্তরে আরাকানে স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিল আবার কেউ একে পাকিস্তানের সঙ্গে যুক্ত করতে চেয়েছিল।[২৫] মিয়ানমার রোহিঙ্গাদের মিয়ানমার নাগরিক হিসেবে স্বীকৃতি না দিয়ে উল্টো ১৯৪৮ সালে মিয়ানমার সামরিক বাহিনী রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে আক্রমণ পরিচালনা করেছিল।[২৬] শত শত গ্রাম আগুনে পুড়িয়ে ফেলা হয় এবং হাজার লোককে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছিল, যার ফলে তখনকার পাকিস্তানে অনেকে উদ্বাস্তু হয়ে এসেছিল। এ ঘটনার ফলে মিয়ানমার রাষ্ট্র পাকিস্তানে ও পরে বাংলাদেশে রোহিঙ্গাদের বিতাড়ন করার একটা পদ্ধতি পেয়ে যায়।[২৭] রোহিঙ্গাদের সন্ত্রস্ত ও তাড়িয়ে দেওয়ার মাধ্যমে মিয়ানমার কর্তৃপক্ষ অনেকবার এ কাজ করেছে। প্রথমে এখানকার কর্তৃপক্ষ তাদের মোহাজির (ইসলামিক উদ্বাস্তু) হিসেবে অভিনন্দন জানায় এবং কোলখোজের মতো আদর্শ গ্রামে পরিণত করার পরিকল্পনা করে।[২৮] এটাকে কখনো গুরুত্ব দেওয়া হয়নি এবং রোহিঙ্গাদের বহিরাগত হিসেবে গণ্য করা হয়। ৯০ দশকের শুরুতে দুই লাখ ৫০ হাজার রোহিঙ্গা বাংলাদেশে অবস্থিত জাতিসংঘের সীমান্ত ক্যাম্পে বাস করছিল। কিছু মিয়ানমায় ফিরে গেছে, কিছু বাংলাদেশের সমাজে মিশে গেছে এবং ২৮ হাজারের মতো এখনো টেকনাফের কাছে ক্যাম্পে রয়েছে। বাংলাদেশ সরকার তাদের অবৈধ হিসেবে গণ্য করে। অবৈধভাবে সীমান্ত পারাপারের অভিযোগে ১৯৯৯ সালে ১৭০০ জনকে কারাগারে থাকতে হয়েছিল।[২৯]

নিঃস্ব, অভাবগ্রস্ত রোহিঙ্গারা সীমান্ত এলাকায় থাকতে পারেনি। নব্বইয়ের দশকে দুই লাখের বেশির ভাগ বাংলাদেশের বড় শহরগুলোতে, মালয়েশিয়া, পাকিস্তান ও উপসাগরীয় দেশগুলোতে দেশান্তরিত হয়েছে।[৩০] কিছু রোহিঙ্গা যুদ্ধরত ইসলামিক প্রতিষ্ঠান থেকে সহায়তা পেয়েছে এবং আফগানিস্তানের যুদ্ধে যোগ দিয়েছে, যেখানে যুদ্ধক্ষেত্রে অনেক বিপজ্জনক কাজ করতে দিয়েছে।[৩১] মিয়ানমার স্টেটের অবিশ্বাসের কারণে ব্যাপক আন্তর্জাতিক প্রবাসী সম্প্রদায়ের জন্ম হয়েছে, যাদের নিজেদের রোহিঙ্গা ইন্টারনেট সম্প্রদায় ও নতুন উৎস তৈরি হয়েছে।[৩২]

অবহেলিত সীমান্তের ভূরাজনীতি

সাম্প্রতিক সময়ে সীমান্ত এলাকা দুটি ভূরাজনৈতিক খেলায় মেতে উঠেছে। প্রথমটি হলো এশিয়ান হাইওয়ে, যার উদ্যোগ ১৯৫৯ সালে ইকাফে (এশিয়া ও দূরপ্রাচ্যের অর্থনৈতিক কমিশন) এবং এখন ইউনেসকেপ (ইউনাইটেড নেশন ইকোনমিক অ্যান্ড সোশ্যাল কমিশন ফর এশিয়া অ্যান্ড দ্য প্যাসিফিক) নিয়েছে। এশিয়ান হাইওয়ে এখনো বাস্তবতার চাইতে প্রকল্প হিসেবেই রয়ে গেছে। ইউনেসকেপের মানচিত্রে দেখা যায়, এশিয়ান হাইওয়ের বাংলাদেশের অংশটি মাঝখান হয়ে উত্তর-পূর্ব ভারত এবং উত্তর মিয়ানমার দিয়ে গেছে। বাংলাদেশ সরকার এটিকে দক্ষিণ দিক দিয়ে মিয়ানমার (আরাকান) উপকূল হয়ে রেঙ্গুন (ইয়াঙ্গুন) পর্যন্ত নিতে চেয়েছিল। এভাবে বাংলাদেশ ভারতকে না জড়িয়ে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সঙ্গে বাণিজ্য করতে পারবে। ২০০২ সালে মিয়ানমার-বাংলাদেশ এশিয়ান হাইওয়ে টেকনাফ ও মংডু দিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে সম্মত হয়েছিল কিন্তু সম্প্রতি মিয়ানমার উত্তর-পূর্ব ভারত দিয়ে নেওয়ার জন্য সম্মত হয়েছে। ভারত ও মিয়ানমার এখন ইউএন এন্টারগভর্নমেন্টাল এগ্রিমেন্ট অন দি এশিয়ান হাইওয়ে নেটওয়ার্কে (২০০৪) স্বাক্ষর করেছে, কিন্তু বাংলাদেশ পিছু হটেছে।[৩৩] এটি বাংলাদেশ-মিয়ানমার ফ্রেন্ডশিপ হাইওয়ে নিয়ে কাজ শুরু করেছে, যা টেকনাফের মধ্য দিয়ে সড়কপথে ঢাকা ও ব্যাংককে যুক্ত করেছে।[৩৪] টেকনাফে একটি বড় সমুদ্রবন্দর বানানো, নাফ নদীতে সেতু তৈরি করে মংডুর সঙ্গে সংযুক্ত করা এবং বাণিজ্যের প্রসার

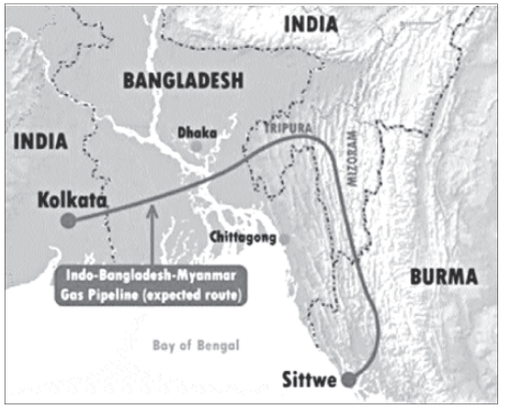

ঘটানো—এসব নিয়ে অনেক দিন যাবৎ আলোচনা চলে আসছে, কিন্তু মিয়ানমারের অনাগ্রহের কারণে এসব পরিকল্পনা ব্যর্থ হচ্ছে।

দ্বিতীয়টি হলো মিয়ানমার-বাংলাদেশ সীমান্তে প্রাকৃতিক গ্যাস। ২০০০ সাল থেকে মিয়ানমার সরকার দক্ষিণ কোরিয়া ও ভারতের তেল কোম্পানিগুলোকে (ডাইউ, দক্ষিণ কোরিয়া গ্যাস করপোরেশন, ওএনজিসি ভিদেশ এবং গ্যাস অথরিটি অব ইন্ডিয়া লিমিটেড) বঙ্গোপসাগরে মিয়ানমার উপকূলে গ্যাস উত্তোলনের অনুমতি দিয়েছে। এই উত্তোলন প্রকল্পের নাম 'স প্রকল্প', যা বেশ সফল। এখানে চার থেকে ছয় ট্রিলিয়ন কিউবিক ফিট গ্যাস রয়েছে এবং আরও সাত থেকে ১২ ট্রিলিয়ন পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।[৩৫] ভারত এই গ্যাস কেনায় আগ্রহী। সবচেয়ে সাশ্রয়ী হলো বাংলাদেশের ভেতর দিয়ে পাইপ বসানো, কিন্তু রাজনৈতিক সুবিধার কারণে অন্যান্য অগ্রাধিকার প্রাধান্য পাবে। তাই বাংলাদেশ-মিয়ানমার যখন টেকনাফ মংডু সড়ক ও পানিসংযোগ নিয়ে কাজ করছিল, তখন ভারত পদক্ষেপ নেওয়া শুরু করে। জরিপকারী দল ইতিমধ্যে রাস্তা ও গ্যাস পাইপলাইন তৈরি করার সম্ভাবনা খতিয়ে দেখছে। এটি মিজোরাম (ভারত) ও চিন স্টেটকে (মিয়ানমার) সংযোগকারী দুর্গম পাহাড়ের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ, ভারত ও মিয়ানমারের ট্রাইজাংশন পয়েন্টের পূর্বে অবস্থিত একটা পয়েন্টে শেষ হবে।

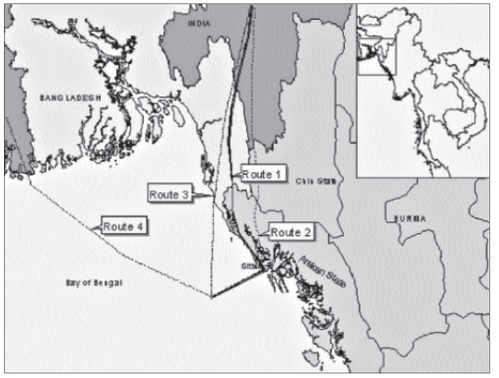

যদি মিয়ানমার এ প্রকল্পে সম্মত হয়, তাহলে ভারত মিয়ানমার গ্যাসের জোগান ঝামেলা ছাড়াই পেতে পারে এবং টেকনাফ থেকে বাণিজ্যের কাজ কোনো সমস্যা ছাড়াই বাংলাদেশকে বাদ দিয়ে করতে পারে।[৩৬] চাপ বাড়তে থাকে, যখন ২০০৫ সালে তিনটি রাষ্ট্র একটি সংযুক্ত পাইপলাইনের কথা আলোচনা করে, যা মিয়ানমার থেকে বাংলাদেশ সীমানা পেরিয়ে দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে যাবে। এর একটি ভারতের ত্রিপুরায়, আরেকটি পশ্চিম বাংলায় যাবে। বাংলাদেশ চেয়েছিল বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে মিয়ানমার গ্যাস নেওয়ার সুবিধার বিনিময়ে ভারত বাংলাদেশকে নেপাল ও ভুটান থেকে জলবিদ্যুৎ আমদানি করার জন্য ট্রানজিট দেবে। এ ছাড়া ভারত বাংলাদেশের সঙ্গে বাণিজ্য ঘাটতিও দূর করবে।

জীবাশ্ম জ্বালানি সম্পর্কে আন্তর্জাতিক আগ্রহ হঠাৎ করে মিয়ানমার-বাংলাদেশ সীমান্তের গুরুত্ব বাড়িয়ে দিয়েছে। বাংলাদেশ, ভারত, ও মিয়ানমারের আন্দোলনকারী যারা 'স গ্যাস আন্দোলন' পরিচালনা করছে, তারা এর সম্ভাব্য ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে আলোকপাত করেছে।[৩৭] এগুলো হলো জোরপূর্বক শ্রম, জনগণের স্থানচ্যুতি, ভূমি বাজেয়াপ্তকরণ, মানবাধিকার লঙ্ঘন, অবৈধ সামরিক অঞ্চলের সহায়তা করা এবং সীমান্তে পরিবেশের ক্ষতি করা।[৩৮]

এই ক্যাম্পেইন এবং দিল্লি, রেঙ্গুন ও ঢাকায় যে আলোচনা হয়েছে, তা নির্ধারণ করবে যে মিয়ানমার ও বাংলাদেশের অবহেলিত সীমান্তে কাঠামোগত উন্নয়ন, সীমান্ত অর্থনীতি, বৈধ ও অবৈধ পণ্যের এবং মানুষ পারাপারের একটা পরিবর্তন আসবে, নাকি এখন যেভাবে চলছে সেভাবে চলবে।

এই ক্যাম্পেইনের ফলে এই সীমান্ত এলাকা মিয়ানমার ও বাংলাদেশের বেশির ভাগ জনগোষ্ঠীর কাছে, দক্ষিণ-পূর্ব ও দক্ষিণ এশিয়া এবং বহির্বিশ্বে পরিচিতি পাচ্ছে। এটি এশিয়ার (দক্ষিণ-পূর্ব) বিশেষজ্ঞদের সীমান্ত গবেষণার গুরুত্ব সম্পর্কে সজাগ করে দিচ্ছে। সীমান্তের দুর্বোধ্যতা শুধুই দৃষ্টিবিভ্রাট এবং একে সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষার মধ্যে আবদ্ধ করে ফেলা মানে বেশির ভাগ সামাজিক বিজ্ঞানের বিষয়কে রাষ্ট্রীয় কেন্দ্রিকতায় আটকে ফেলা।[৩৯] অন্যান্য সীমান্তের মতো মিয়ানমার-বাংলাদেশ সীমান্ত গবেষণার জন্য জরুরি। কীভাবে স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বাহিনী মানুষের জীবনকে গঠিত করে এবং কীভাবে সীমান্ত সম্প্রদায় ও বহুজাতিক প্রবাহ সংযুক্ত, তা দেখায়।[৪০] সীমান্ত-সম্পর্কিত গবেষণা শতাব্দীর কিছু নতুন উপায় সম্পর্কে ধারণা দিতে পারে। এ ক্ষেত্রে রাষ্ট্রকেন্দ্রিক ধারণা ব্যাপকভাবে অপর্যাপ্ত মনে হয়।

তথ্যসূত্র

1. Anderson and Dowd, 1999, 602-603.
2. Rabinowitz, 1998, 142.
3. Van Schendel, 2005.
4. Van Schendel, 2002.
5. Resist, 1999; World, 2000; Basic Facts, 1996.
6. Haque, 1980, 218; Border, 2001.
7. National Archives of Bangladesh (Dhaka), Government of East Bengal, Home (Political) Department, Branch Political, B. Proceedings (20M-60/50 (3-53)), 1950.
8. Nasaka, 2000.
9. Islam, 1999.
10. Three Reported, 1998; Tension, 2000.
11. Bangladesh, 1999.
12. Flag meet, 2001.
13. DG, 2000.

14. Myanmar, 1998; Two, 1999.
15. Trade, 1999; Yangon, 2003.
16. Cf. Smith, 1986; Ghafur, Islam and Faiz, 1990-91.
17. Van Schendel, 2005, 165-168, 185-186.
18. Small Arms, 2001, 182.
19. Mizoram,. 2000; Bullet, 2001.
20. Crackdown, 2002; Poppy, 2005.
21. Bangladesh, 2003.
22. Smugglers, 2000.
23. Van Schendel, 2001.
24. U Chin, 1953.
25. Burma, 1996, 10.
26. Yunus, 1995, 3.
27. Smith, 1994a; 1994b; Ahmed, 2004.
28. Chottograme, 1949.
29. State, 1997, 254; Twenty-Five, 1999.
30. Lintner, 1993;Malaysia, 2000.
31. Lintner, 2002.
32. E.g. www.rohingyatimes.com/; www.rohingya.org/; www.geocities.com/rohingyalanguage/; www.helprohingya.tk/; Declaration, 2004.
33. Intergovernmental, 2004.
34. Highway, 2004.
35. Naing Htoo et al., 2004, 1.
36. Dhaka, 2002: Indo-Burma, 2003.
37. Arakan, 2005a; Arakan, 2005b; Mukherjee, 2005; Jockal, 2005.
38. E.g. www.shwe.org/; www.earthrights.org/burma/shwepipeline.shtml; www.oilwatch-sea.org/new/shwe.html; www.geocities.com/arakangasmovement/arakangasmovement.htm; www.petitiononline.com/agm0401/petition.html.
39. Donnan and Wilson, 1999.
40. Van Schendel, 2006.

গ্রন্থপঞ্জি

Ahmed, Imtiaz, 2004 'Refugees and Civil Society: Rohingya Refugees in Bangladesh,' in: Imtiaz Ahmed, Abhijit Dasgupta and Kathinka Sinha-Kerkhoff (eds.), *State, Society and Displaced People in South Asia* (Dhaka: University Press Limited), 281-307.

Anderson, James, and Liam O'Dowd, 1999 'Borders, Border Regions and Territoriality: Contradictory Meanings, Changing Significance,' *Regional Studies*, 33:7, 593-604.

Arakan, 2005a 'Arakan bodies opposed the tri-nations MoU on Arakan gas,' *Kaladan News*, 14 January.

----, 2005b 'Arakan gas campaigners hold press conference in Dhaka,' *Narinjara News*, 14 January.

Bangladesh, 1999 'Bangladesh, Myanmar agree to remove trade barriers,' *The Daily Star*, 19 July.

----, 2003 'Bangladesh returns a Burmese Military Intelligence-owned smuggling vessel at a flag meeting,' *Narinjara News*, 26 February.

Basic Facts, 1996 *Basic Facts on the Union of Myanmar* (Yangon: Public Relations and Information Division, Ministry of Foreign Affairs, Government of the Union of Myanmar).

Border, 2001 'Border tense as Myanmar continues to mass troops: Nasaka refuses to sign joint statement,' *The Daily Star*, 22 January.

Bullet, 2001 'Bullet smuggling rising on Bangladesh-Burma border,' *Mizzima News*, 12 June.

Burma, 1996 'Burma: The Rohingya Muslims – Ending a Cycle of Exodus?' *Human Rights Watch/Asia,* 8:9.

Chottograme, 1949 '"Chottograme Arakani mohajer," Panuapathare dui hazar loker bostir byobostha,' *Azad*, 14 April.

Crackdown, 2002 'Crackdown on poppy farmers in Bandarban,' *The Daily Star*, 12 May.

Declaration, 2004 'Declaration of the Rohingya National Convention,' *Asian Tribune*, 20 May.

DG, 2000 'DG of BDR concerned at unprotected borders of CHT, Satkhira,' *The Daily Star*, 4 July.

Dhaka, 2002 'Dhaka, Yangon agree on road link: Two taskforces formed for feasibility study,' *The Daily Star*, 18 December.

Donnan, Hastings, and Thomas M. Wilson, 1999 *Borders: Frontiers of Identity, Nation and State* (Oxford and New York: Berg).

Flag meet, 2001 'Flag meet held: Dhaka, Yangon agree to begin joint survey,' *The New Nation*, 21 January.

Ghafur, Abdul, Muinul Islam, and Naushad Faiz, 1990-91 *Illegal International Trade in Bangladesh: Impact on the Domestic Economy* (Dhaka: Bangladesh Institute of Development Studies, Phase I 1990; Phase II 1991).

Haque, Azizul, 1980 'Bangladesh 1979: Cry for a Sovereign Parliament,' *Asian Survey*, 20:2, 217-230.

Highway, 2004 'Highway for closer cooperation,' *Mizzima News*, 2 May.

Indo-Burma, 2003 'Indo-Burma joint survey in western Burma,' *Narinjara News*, 16 January.

Intergovernmental, 2004 *Intergovernmental Agreement on the Asian Highway Network* (Shanghai, UNESCAP).

Islam, Mohammad Nurul, 1999 'Where landmines take a heavy toll,' *The Independent*, 28May.

Jockal, 2005 'Burma's Shwe Gas Project: Another Nightmare?' *Mizzima News*, 30 April.

Lintner, Bertil, 1993 'Distant exile: Rohingyas seek new life in Middle East,' *Far Eastern Economic Review*, 156:4, 28 January.

----, 2002 'Championing Islamist Extremism,' *South Asia Intelligence Review*, 1:9, 16 September.

Malaysia, 2000 *Malaysia/Burma: Living in Limbo – Burmese Rohingyas in Malaysia* (New York: Human Rights Watch).

Mizoram, 2000 'Mizoram border safe haven for gun-runners, insurgents,' *The Northeast Daily*, 29 March.

Mukherjee, Supratim, 2005 'Myanmar: Cheers, jeers over giant gas find,' *Asian* Times, 14 February.

Myanmar, 1998 'Myanmar gunmen killed in Bangladesh border battle,' *ShweInc News*, 24 October.

Naing Htoo et al., 2004 *Another Yadana: The Shwe Natural Gas Pipeline Project (Burma-Bangladesh-India)* (Earth Rights Intentional) (www.earthrights.org).

Nasaka, 2000 'Nasaka won't use Tumburu canal,' *The New Nation*, 29 April.

Poppy, 2005 'Poppy cultivated on 100 acres in Bandarban destroyed,' *The Daily Star*, 9 March.

Rabinowitz, Dan, 1998 'National identity on the frontier: Palestinians in the Israeli education system,' in: Thomas M. Wilson and Hastings Donnan (eds.), *Border Identities: Nation and State at International Frontiers* (Cambridge: Cambridge University Press), 142-161.

Resist, 1999 'Resist smuggling Nasim tells BDR personnel,' *The Daily Star*, 22 March.

Small Arms, 2001 *Small Arms Survey 2001: Profiling the Problem* (Geneva/Oxford: Graduate Institute of International Studies / Oxford University Press).

Smith, Martin, 1986 'Sold Down the River: Burma's Muslim Borderland,' *Inside Asia* (July-August), 5-7.

----, 1994a *Burma: Insurgency and the Politics of Ethnicity* (London: Zed Press).

----, 1994b *Ethnic Groups in Burma: Development, Democracy and Human Rights* (London: Anti-Slavery Society).

Smugglers, 2000 'Smugglers robbed at Bangladesh-Burma water,' *Mizzima News Group*, 13 July.

State, 1997 *The State of the World's Refugees: A Humanitarian Agenda* (Oxford: UNHCR/Oxford University Press).

Tension, 2000 'Tension along Bangladesh-Myanmar border,' *The Times of India*, 18 November.

Three Reported, 1998 'Three reported dead as guards fight rebels,' *The Mekong Digest*, 28 January.

Trade, 1999 'Trade with Myanmar: Jetty on Naf River Soon,' *The New Nation*, 4 August.

Twenty-Five, 1999 'Twenty-Five Rohingyas languishing in Chandpur jail,' *The New Nation*, 27 October.

Two, 1999 'Two abducted men released in Bandarban,' *The New Nation*, 23 June.

U Chin, 1953 'Report on the Migration of Arakanese Buddhists to Burma.' (National Archives of Bangladesh (Dhaka), Government of East Bengal, Home (Political) Department, Confidential Records B. Proceedings, CR 9M-14/53 (6-54).

Van Schendel, Willem, 2001 'Working Through Partition: Making a Living in the Bengal Borderlands,' *International Review of Social History*, 46, 393-421.

----, 2002 'Geographies of Knowing, Geographies of Ignorance: Jumping Scale in Southeast Asia,' *Environment and Planning D: Society and Space*, 20, 647-668.

----, 2005 *The Bengal Borderland: Beyond State and Nation in South Asia* (London: Anthem Press).

----, 2006 'Spaces of Engagement: How Borderlands, Illegal Flows and Territorial States Interlock,' in: Willem van Schendel and Itty Abraham (eds.), *Illicit Flows and Criminal Things: States, Borders, and the Other Side of Globalization* (Bloomington: University of Indiana Press (in press)).

World, 2000 *The World Factbook 2000* (Central Intelligence Agency; www.cia.gov/cia/publications/factbook/).

Yangon, 2003 'Yangon's strict control creates trade imbalance,' *The New Nation*, 3 June.

Yunus, Mohammad, 1995 *A Memorandum on the Genocide of the Rohingya Muslims of Arakan in Burma* (Arakan: Rohingya Solidarity Organization).

অনুবাদ : **জোশিতা জিহান অর্নব**

খ্যাতি অনুস্মৃতি চিন্তা

মোখলেসুর রহমানের (সিধু ভাই) সাক্ষাৎকারভিত্তিক রচনা

আমার জীবন-কথা ও সময়

সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী

সরদার ফজলুল করিম ও মুস্তাফা নূরউল ইসলাম

[মোখলেসুর রহমান ১৯২১ সালে রংপুর জেলার নীলফামারী মহকুমার ডিমলা থানার খগাখড়ি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর ডাক নাম সিধু মিয়া। তিনি ছিলেন এক বিত্তশালী পরিবারের সন্তান। কিন্তু তাঁদের পরিবার জোতদার হিসেবে পরিচিত ছিল। উত্তরবঙ্গের তেভাগা আন্দোলনের একজন প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন। পড়াশোনা সমাপ্ত করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। কর্মজীবনে তিনি কলকাতা, ঢাকা ও চট্টগ্রামে ছিলেন অনেক দিন। পরবর্তী সময়ে চাকরি ছেড়ে দিয়ে ব্যবসা শুরু করেন। দেশভাগ-পরবর্তী সময়ে তিনি পূর্ব বাংলার সব রাজনৈতিক আন্দোলনে কখনো প্রত্যক্ষ, আবার কখনো পরোক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেছেন। ১৯৭৫-এর রাজনৈতিক পট-পরিবর্তনের পর থেকে তাঁর ভাই মসিউর রহমান (যাদু মিয়া) রাজনীতিতে সক্রিয় ছিলেন। তিনি তাঁর ভাইকে বুদ্ধি-পরামর্শ সহযোগিতা করেছেন। একজন রাজনীতিসচেতন ব্যক্তি হওয়া সত্ত্বেও কখনো সক্রিয় রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশ নেননি। বাংলাদেশের সব রাজনৈতিক নেতার সঙ্গে ছিল তাঁর নিবিড় যোগাযোগ।

এ সাক্ষাৎকারে বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলাম, শ্যামা-হক মন্ত্রিসভা গঠন, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া কর্তৃক অ্যাডমিরাল আহসানকে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর পদে নিয়োগ, পাকিস্তান সরকারের সঙ্গে শিল্পপতি আমিন ও আদমজীর রাজনৈতিক সম্পর্ক, তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানের অর্থ মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন নীতি, ব্যবসা-বাণিজ্যে অবাঙালিদের একচেটিয়া সুযোগ-সুবিধা প্রদানের কথা ইত্যাদি বিষয়ের পাশাপাশি ২১ ফেব্রুয়ারির ঘটনা, মুখ্যমন্ত্রী নুরুল আমিনের মূল্যায়ন, ভাসানীর কথা, বিএনপির গঠন, জিয়াউর রহমানের সঙ্গে তাঁর ভাই যাদু মিয়ার সম্পর্ক, বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে যাদু মিয়ার সম্পর্ক ইত্যাদি নানা বিষয়ে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসকি তথ্য উপস্থাপন করেছেন। বাংলাদেশের জাতীয় যাদুঘরের কথ্য ইতিহাস প্রকল্পের আওতায় সাক্ষাৎকারটি গ্রহণ করেছিলেন জাতীয় অধ্যাপক সরদার ফজলুল করিম (মরহুম) ও মুস্তফা নূরউল ইসলাম। গৃহীত সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতেই বর্ণনা আকারে এ রচনাটি ছাপা হলো। আর প্রকল্পটির সমন্বয়কারী ছিলেন ইতিহাসবিদ ড. সালাউদ্দিন আহমেদ।)

১. জন্ম-পরিবার

১৯২১ সালে আমার জন্ম। রংপুর জেলার ডিমলা থানার অধীনে, তখনকার নীলফামারী মহকুমায়। ডোমার স্টেশন থেকে ১০ মাইল দূরে আমাদের বাড়ি। বেশ বিত্তশালী বংশেই আমার জন্ম। আমার বাবা পৈতৃক সূত্রে প্রচুর জায়গা-জমি পেয়েছিলেন এবং নিজেও বাড়িয়েছিলেন অনেক। লোকে এ রকম বলত যে ওসমান গনি সাহেব কোনো দিন অন্যের জমির ওপর দিয়ে হাঁটেননি। অর্থাৎ চারদিকে, আমাদের বাড়ির পাশে উত্তর-দক্ষিণ, পূর্ব-পশ্চিমে যত জমি ছিল, তার সবই ছিল তাঁর নিজের। তাঁর নিজের ওই জোতদারির অংশ। আমাদের একটা ছোট জমিদারিও ছিল। ওটা ছিল পোশাকি, অর্থাৎ জাতে ওঠার জন্য। কিন্তু আসল জিনিসটা হলো জোতদারি।

জমিদারি আর জোতদারি—এ দুটোর মধ্যে একটা তফাত আছে। তফাতটা হলো সরাসরি ব্রিটিশরাজকে খাজনা দেওয়া আর একটা নিয়ম ছিল জমিদারকে খাজনা দেওয়া। এই দুটোর মধ্যে জোতদারির ব্যাপারটা হলো, জোতদার হলে খাজনা দিতে হতো জমিদারকে। আমরা জমিদারকে খাজনা দিতাম। প্রায় আট-দশজন জমিদার ছিলেন, যাঁদের খাজনা দিতে হতো।

আমরা মূলত পরিচিত ছিলাম জোতদার হিসেবে। আর আমাদের জমিদারিটা ছিল স্রেফ জাতে ওঠার জন্য। অনেকেই বলে থাকেন, সামাজিকভাবে জোতদার শব্দটা তত সম্মানজনক শব্দ ছিল না। কিন্তু সেটা ঠিক নয়। সম্মানজনক ছিল। কেননা, জোতদারদের হাতেই তো তখন ছিল টাকাপয়সা। জমিদারেরা তখন প্রায় সবাই কোর্ট অব ওয়ার্ডসে চলে গেছেন। তাঁরা প্রচুর ব্যয় করতেন। সেই ব্যয়ের জন্য বেশির ভাগ জমিদারেরই তখন দেউলে দশা। আর জমিদারেরা পেতেন কেবল খাজনা। জোতদারেরা তাঁদের কাছ থেকে যে জমিগুলো নিতেন, সেগুলো পত্তন জমি হলেও নিজেদের সরাসরি চাষাবাদের আওতায় নিয়ে আসতেন এবং সেখান থেকেই সারপ্লাস আরও অনেক বেশি থাকত। তাঁরা (জমিদারেরা) নির্দিষ্ট পরিমাণ খাজনার টাকার পরিবর্তে জমি দিতেন। সেখান থেকে কমপক্ষে তার চেয়ে আট-দশ গুণ বেশি আমরা বর্গাচাষিদের কাছ থেকে পেতাম।

আমাদের ওদিকে চাষাবাদের যে প্রথার প্রচলন ছিল, সেটা ছিল আধিয়ার প্রথা। তার মাধ্যমেই আমরা সেটা করতাম। কিন্তু জমির মালিক ছিলাম আমরা। নির্দিষ্ট একটা খাজনার পরিবর্তে জমিদারের কাছ থেকে জমি নিয়ে তারপর সেই জমি আমরা আধিয়ারকে দিয়ে চাষ করাতাম। এবং এর রিটার্ন অন্তত ওই খাজনা বা যে টাকার বিনিময়ে জমি নিতাম, তার চেয়ে আট-দশ গুণ বেশি আমরা পেতাম। এ জন্যই উদ্বৃত্ত একটা সুদ জমত জমিদারের কাছে এবং অনেক সময় তাঁরা এটা উড়িয়ে দিতেন। নানা রকম ব্যয় করে নষ্ট করে দিতেন; কিন্তু যাঁরা একটু হিসাবি

ছিলেন, তাঁরা এটাকে দুভাবে ব্যবহার করতেন। মানে আমার বাবা যেভাবে ব্যবহার করতেন আরকি। তাঁর পারিবারিক ব্যয়ভার বহন করার পর যা থাকত, তিনিও সেটা দুভাবেই ব্যবহার করতেন। একটা হলো যে লগ্নি কারবারে তাঁর এই টাকা খাটানো। যেমন ধরেন, ধানের মৌসুমে কিছু ধানের পাইকার এল, তাদের অর্থায়ন করার জন্য তখন কোনো ব্যাংক ছিল না। তাদের একটা নির্দিষ্ট টাকার পরিবর্তে, ধরুন—১০ হাজার টাকা দিলাম। শর্ত হলো, চার হাজার টাকা লাভসহ তিন-চার মাস পর ফেরত দিতে হবে। এই একটা নিয়ম ছিল। আর একটা নিয়ম ছিল যে ওই টাকা যে ধার চাইতে আসত, তাকে সুদে ধার দেওয়া হতো। এটা হলো কৃষি থেকে যে উদ্বৃত্তটা আসত, সেই উদ্বৃত্তটা বিনিয়োগ করার কোনো রাস্তা ছিল না। কাজেই এই দুভাবে তাঁরা এটা বিনিয়োগ করতেন এবং এটা আবার জমির ওপরই খরচ করতেন। এভাবে জমির বিস্তৃতিটা হতো।

ফসল বিক্রি করেই উদ্বৃত্তটা হতো। বিপুল পরিমাণ ফসল আমরা পেতাম। আট-দশ হাজার মণ ধান পেতাম, তিন-চার হাজার মণ পাট আর তামাক পেতাম। এই তিনটা ফসলই তার প্রধান উপার্জনের উৎস ছিল।

টাকাপয়সার অর্থাৎ বিত্তের একটা বর্ণনা দিলাম। পারিবারিক ঐতিহ্য, আপনারা যাকে বলেন 'শরাফতি', সে কথা বলতে গেলে বলতে হয়, সে ব্যাপারে আমি কেবল আমার বাবার প্রজন্ম সম্পর্কেই জানি এবং তাঁর বাবা যেহেতু তাঁর জন্য একটা বেশ বড় সম্পত্তি রেখে গেছেন, অনুমান করি, তাঁরও বিশাল একটা সম্পত্তি ছিল। এর আগের ব্যাপারে আমি কিছু বলতে পারব না।

২. পারিবারিক ঐতিহ্য ও শিক্ষা

আমাদের পরিবারের শিক্ষার যে ঐতিহ্য, তার শুরুটা কখন থেকে, সেটা আমি জানি না। আমি কেবল জানি আমার বাবা যখন ক্লাস সেভেন-এইটে পড়তেন, তখন তাঁর বাবা মারা যান। ফলে এর চেয়ে বেশি পড়াশোনা করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। যাকে বলে আধুনিক শিক্ষাদীক্ষা, সেটা আমাদের প্রজন্ম থেকে এসেছে।

আমাদের রংপুর-দিনাজপুরের ওই এলাকা বা তখনকার জলপাইগুড়ির সঙ্গেও আমাদের কিছু কিছু যোগাযোগ ছিল। তখনকার দিনের মুসলমান সমাজে এই ধরনের বিত্তবান পরিবার যারা ছিল, তাদেরও তো মোটামুটি একই ঐতিহ্য ছিল। তবে আমার বাবা এই ঐতিহ্যের বাইরে ছিলেন। কারণ, উনি নিজে খুব পরিশ্রমী ছিলেন এবং আমাদের, মানে আমার বোনদের লেখাপড়া শিখিয়েছেন এবং বিয়েও দিয়েছেন সেভাবে। আমাদের জোতদার পরিবারের নিয়ম ছিল, এক জোতদার আর এক জোতদার পরিবারে বিয়ে-থা দিত। কিন্তু উনি আমার দুই বোনকে শিক্ষিত পরিবারে বিয়ে দিয়েছিলেন। আমার এক ভগ্নিপতি ছিলেন জজ,

আরেকজন ছিলেন ইনকাম ট্যাক্স অফিসার। তিনি দেশবিভাগের অনেক আগেই সহকারী কমিশনার হয়ে মারা যান। কাজেই আমাদের বাড়ির ঝোঁকটাই আলাদা ছিল এবং অন্য মুসলমান পরিবারের সঙ্গে আমাদের খুব বেশি সম্প্রীতি ছিল না এবং সে ঐতিহ্যও ছিল না। আমার বাবাকে সব সময় ধুতি পরতে দেখেছি। খুব সুন্দর ধুতি পরতেন এবং ঈদের নামাজ কোনো দিন পড়তেন না। ঈদের জামাতে আমাদের বাড়ি থেকে শতরঞ্জি যেত, ঈদগাহটাও আমাদের জমির ওপরই ছিল কিন্তু উনি নিজে ঈদের নামাজ কোনো দিন পড়তেন না। আমাদের বলতেন, যাও নামাজ পড়ো, কিন্তু উনি নিজে যেতেন না। আমাদের বাড়িতে গান-বাজনার পরিবেশ ছিল, আমার বড় বোনের শিক্ষার জন্য উনি রবীন্দ্রসংগীতের শিক্ষক রেখেছিলেন ওই গ্রামের বাড়িতেই। যদি প্রশ্ন করেন, আমার বাবা ধুতি পরতেন। তারপর নামাজের প্রতি ব্যক্তিগতভাবে তাঁর আকর্ষণ তেমন ছিল না। উপরন্তু ছেলেমেয়েদের তিনি গান শেখাচ্ছেন, ইংরেজি শিক্ষা দিচ্ছেন, এ জন্য তখনকার সমাজে বা আপনাদের মতো বিত্তবান আরও যাঁরা ছিলেন, তাঁরা আমাদের কী দৃষ্টিতে দেখতেন?

এই প্রশ্নের জবাবে বলব, উনি, মানে আমার বাবা আসলে একটু উন্নাসিক প্রকৃতির লোক ছিলেন। যাঁরা আমাদের বাঁকা চোখে দেখতেন, তাঁদের ধর্তব্যের মধ্যেই আনতেন না। আমি যতটুকু জানি তাঁর বেশির ভাগ বন্ধুবান্ধবই ছিলেন অমুসলমান। মানে তাঁদের প্রায় সবাই হিন্দু ছিলেন। রংপুরে আসতেন, রংপুর থেকে গ্রামের বাড়ি ফিরতেন।

আমাদের গ্রামে জায়গা-জমি যাঁদের ছিল, তাঁদের প্রায় সবাই মুসলমান ছিলেন। হিন্দু আমাদের ওখানে থাকলেও এলাকাটা ছিল শিডিউল কাস্ট বা নিম্নবর্ণের হিন্দুদের এলাকা। কোচ, বর্মণদের সংখ্যাই ছিল বেশি। পরে এরা ক্ষত্রিয় বলে পরিচিত হয়। কিন্তু আশপাশের গ্রামে সে রকমভাবে নিম্নবর্ণের হিন্দুভুক্ত তেমন কোনো পরিবার ছিল না।

যা-ই হোক, আমার বাবা মারা যান ১৯২৮ কি ১৯২৯ সালে। তখন আমি পঞ্চম শ্রেণীতে পড়ি এবং তার আগ পর্যন্ত আমাদের বাড়িতে এবং পুরো গ্রামে একটা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির আবহাওয়া বিরাজ করত। কারণ, আমাদের গ্রামে একটা পুজো হতো। দেবীহাটি বলে একটা হাটে, সেখানে পুজোর আসর বসত। সেখানে হিন্দু-মুসলমান দুই সম্প্রদায়েরই লোকজন এসে মহররমের সময়ে লাঠিখেলার প্রতিযোগিতা করত এবং যারাই জিতত, তাদের পুরস্কার দেওয়া হতো। এসব কিছুর চল আমার বাবার সময়ও ছিল। বাবার মৃত্যুর পরও অনেককাল এটা চলেছিল। মানে সবদিক দিয়েই আমাদের গ্রামটা ছিল অসাম্প্রদায়িক। এবং স্বয়ম্ভর গ্রাম বলতে যা বোঝায়, তা-ই ছিল সেটা। সেখানে তাঁতি ছিল, সেখানে কুমার

ছিল, সেখানে নাপিত-ধোপা সবকিছুই ছিল। আমরা কেউ কেউ হয়তো সেখানকার কোনো কাপড় পরতাম না। তবে আমাদের ওখানে কোচ-বর্মণ শ্রেণি যেমন রঙিন ডুরে কাপড় পরে বুকের সঙ্গে আঁটসাঁট করে বেঁধে রাখে, তারাও তা-ই করত। ওখানে তাঁতে উৎপাদিত কাপড় ইত্যাদি স্থানীয়ভাবেই বিক্রি হতো। এ সবকিছুই এখন উঠে গেছে।

৩. পরিবারে উচ্চশিক্ষার প্রতি অনুরাগ

আমি একটা জিনিস লক্ষ করেছি, রংপুর-দিনাজপুর মিলিয়ে যে বেল্টটা, অন্তত ১৯৪০ বা ১৯৪১ সাল পর্যন্ত, সেই বেল্টের মুসলমান জোতদার পরিবারের ছেলেরা হায়ার এডুকেশনের দিকে আসেনি। চল্লিশের দশকের পর যখন ধানের দাম বাড়ল তখনই দিনাজপুর শহরের কলেজে কিছু কিছু মুসলমান ছেলেপেলে লেখাপড়া করতে এল। এ ক্ষেত্রে আমাদের পরিবারে একটা ব্যতিক্রম লক্ষ করা যাচ্ছে। সেটা হলো বিশের দশকের দিকে আমরা ইংরেজি শিক্ষার দিকে যাচ্ছি। এর কারণ অনুসন্ধান করতে গেলে যে দিকটি বেরিয়ে আসে, তা নিয়েই একটু কথা বলা যাক।

এক নম্বরে উচ্চশিক্ষার বিষয়, সেটা ছিল অনেকটা তাদের ব্যক্তিগত ব্যাপার। দুই নম্বরে বলতে গেলে বলতে হয়, প্রত্যেকেরই এ রকমের ইচ্ছা ছিল যে আমার পরিবার থেকে একটি ছেলেকে উপযুক্ত করে গড়ে আমি মরে যাব। আমার ছেলে আমার বিষয়সম্পত্তি দেখবে। সে জন্যই এ ধরনের একটা প্রবণতা ছিল। আমার বাবা ওটা খেয়াল করেননি এবং আমার যে সবচেয়ে বড় ভাই, আমি যখন ক্লাস ফাইভে পড়ি, উনি তখন ক্লাস টেনে পড়তেন, সে অবস্থায় আমার বাবা মারা যান। কিন্তু তাঁকে সংসারে বসানোর চিন্তা আমার বাবা করেননি।

৪. নিম্নবর্ণের হিন্দুদের কথা

নিম্নবর্ণের হিন্দুরা ছিল আমাদের গ্রামের একটা প্রধান অংশ। তাদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কের কথা বলতে গেলে বলতে হয়, সেটা ছিল খুব ভালো। তাদের সবাই আমাদের আধিয়ার হলেও তাদের সঙ্গে আমাদের আচরণ এমন ছিল—যদি কারও বয়স বেশি হতো, তাহলে তাকে আমরা 'ভাই' কিংবা 'মামা' কিংবা 'চাচা' বলে সম্বোধন করতাম। আমরা কোনো দিন নিজেদের মধ্যে কোনো রকম সম্পর্কগত বিভাজনরেখা টানিনি। কারণ, তখন লোকসংখ্যাও অনেক কম ছিল এবং আধিয়ার হলেও তখন যদি একটা লোকের কাছে ১০ বিঘা জমি থাকত, যেহেতু তার ফ্যামিলি ছোট ছিল, তার কোনো দিন অভাব হতো না। যেটুকু পেত সে, তা-ই দিয়ে তার ভালোভাবে চলে যেত। তারা আমাদের আধিয়ার ছিল এবং কাগজ-কলমে তারা অর্ধেক ফসলই পেত। তবে আসলে কী পেত, সেটা আলাদা

জিনিস। এটা খুবই করুণ ব্যাপার। কারণ, কথা হচ্ছে কি, আমার যে জমির ওপর আমি একটা আধিয়ার বসালাম, সেই ভিটার ওপর তার কোনো রাইট ছিল না। সে যত দিন আমাকে মন যোগিয়ে থাকতে পারত, তত দিন সে ভিটায় থাকতে পারত। ওই জমিতে যদি আমি অন্য আরেকজনকে বসাই, তাহলে তাকে আমি উচ্ছেদ করতে পারতাম এবং এভাবে অনেককে উচ্ছেদ করাও হয়েছে।

৫. এলাকায় আধিয়ার-ব্যবস্থা

আমি যখন নতুন একটা আধিয়ার বসাব, তখন তাকে আমার হালের গরু দিতে হবে। তারপর তাকে কিছু ধান দিতে হতো—বীজ ধান দিতে হতো, বাড়ি করার জন্য কিছু টাকাও দেওয়া হতো। এগুলো সবই জোতদারকে দিতে হতো এবং এর ওপর সুদ প্রদান করা হতো। আর সবচেয়ে বড় একটা এক্সপ্লয়টেশন বা শোষণ ব্যবস্থা যেটা ছিল, পরে এটা আমরা তুলে দিয়েছিলাম, আমাদের পরিবার থেকে অন্তত তুলে দিয়েছিলাম, সেটা হলো এই যে ধরুন, আজকে একটা লোক বদলালাম। তার খাবার নেই। তাকে আমি পাঁচ মণ ধান দিলাম। আজকে ধানের মূল্যে ধরুন ১০ টাকা। পাঁচ মণ ধানের দাম ১০ টাকা করে ৫০ টাকা লিখে রাখলাম। কিন্তু তার এই দাম আমি শোধ করে নেব দামের ওপর। সে যখন আবাদ করে ধানটা ঘরে তুলল, আমি তখনকার বাজারদরে আগের ধানের দামটা ধানের ওপর দিয়ে উশুল করে নেব। তখন হয়তো বাজারদর দুই টাকা। এমন হতে পারে, যখন ধানটা উঠল তখন বাজারদর আগে যদি ১০ টাকা থেকে থাকে, তখন হয়তো পাঁচ টাকা। আমি যখন উশুল করে নিলাম, তখন দেখা গেল দুই টাকা যদি মণ হয়, তাহলে ওকে ২৫ মণ ধান দিতে হবে। অথচ সে নিয়েছিল পাঁচ মণ ধান। আমার জীবনেই এ রকম ঘটনা হয়েছে এবং সে জন্য আমি আমার মাকে বলে এই প্রথা বন্ধ করে দিয়েছিলাম। এই ব্যাপারটা আমাকে রীতিমতো ভাবিয়ে তুলেছিল।

আমার সামনেই এ রকমের একটা ঘটনা ঘটেছিল। আমাদেরই এক প্রজা, তার নাম ছিল নেবড়ু, সে মুসলমান। যখন তার ধানের গাদা (যাকে আমরা বলি পুঞ্জ) ভাঙানো হলো, মানে মাড়াই করা হলো, তখন তার বউ, তার ছেলেমেয়ে—সবাই বস্তা নিয়ে এসেছে ধান নিয়ে যাবে বলে। আমি ওখানে বসে আছি। ধান মাপা হলে আমি সরকারকে বললাম যে দেনা-পাওনা কী?

সরকার বলল, ওরা কিছু পায় না। আমি বললাম, ২৫ মণ ধান তো ও পায়।

সে বলে, পায় না।

আমি বলি, কী করে পায় না? অর্ধেক হিসাবে তো ২৫ মণ ধান পাচ্ছে।

বলে, না, ওর আগের পাওনা আছে। সেই পাওনা কী, সেটা আমি জানতে গিয়ে ওই সিস্টেমটা সম্পর্কে জানলাম। এবং সেদিনই আমি বললাম যে ওকে তো

আমি খালি হাতে ফেরত দিতে পারব না। ওর ছেলেমেয়ে সব কান্নাকাটি আরম্ভ করে দিয়েছে।

আমার তখন বয়স ১০-১১ বছর হবে।

আমি বাড়ির বড় ছেলে। ইতিমধ্যে আমাদের ষোলো আনা অংশ ভাগ হয়ে গেছে। এবং তাতে আমার ছিল নয় আনা ভাগ। ফলে আমার একটা ক্ষমতা বা মতামতের জোর ছিল।

আমার অংশের জন্য আমি বড়। যখন নেবড়ুর ছেলেমেয়ে কান্নাকাটি শুরু করল, কেননা, সরকার বলে দিয়েছে যে সে ধান পায় না। সবটা গোলায় তোল। আমি ওদের কান্নাকাটি করতে দেখে হস্তক্ষেপ করতে বাধ্য হলাম।

আমি বললাম যে এ জিনিসটা আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। এটা এখন তুমি বন্ধ রাখো। ওকে পাঁচ মণ ধান দিয়ে দাও। পরে এটার হিসাব হবে। পরে রাতের বেলা যখন আমার মায়ের সঙ্গে বসলাম, তখন আমি তাঁকে বললাম, 'মা, এটা তো হতে পারে না। তুমি ধানের পরিবর্তে ধান নিতে পারো। তুমি তখন ১০ টাকা মণ দরে ধান দিয়েছ আর এখন নেবে দুই টাকা দরে—এ হতে পারে না।' সরকার আপত্তি তুলল এই বলে যে আমরা যদি তখন ওকে না দিয়ে ধানটা বিক্রি করতাম, তাহলে তো আমরা ১০ টাকাই পেতাম। আমরা বিক্রি না করে তো ওকেই দিয়েছি। সুতরাং ও সে টাকাটাই আমাদের দেবে। এখন তো ধানের মণ (দর) কম। কাজেই এখন টাকা দিতে গেলে তো এত মণ ধানই তাকে দিতে হয়। যেহেতু আমরা এই নিয়মেই পাওনা উশুল করে থাকি, কাজেই এই হিসাবে সে আর ধান পায় না।

এ কথা আমি বলার পর আমার মা বললেন, 'হ্যাঁ, তা-ই তো।' আমরা তখন দুটো কাজ করলাম। একটা হচ্ছে, আমরা সুদটা নিতাম না। ওই টাকার ওপর যে একটা সুদ ধরা হতো, সেটা নিতাম না। এটা ছিল সবচেয়ে বড় একটা এক্সপ্লয়টেশন এবং এ কারণেই আমি ব্যক্তিগতভাবে বলতে পারি, তেভাগা আন্দোলন[১] যখন হয়, তখন আমরা তেমন হুমকি-টুমকির সম্মুখীন হইনি। উপরন্তু তেভাগা আন্দোলনের অনেক নেতা আমাদের বাড়িতে ছিলেন। যাদু মিয়াও তখন বাড়িতে এবং তাঁরা তখন আমাদের বাড়িতেই ঘাঁটি গেড়ে বসেছিলেন। কিন্তু গোলমালটা হয়েছে আমাদের আশপাশে, আমাদের আত্মীয়স্বজনের বাড়িতে, তাদের জমির ওপর। তবে তেভাগা আন্দোলনের সময় যাদু বাড়িতে ছিল। আমি তখন কলকাতায়। সেখানে তখন আমি চাকরি করি। ঢাকা ইউনিভার্সিটি এমপ্লয়মেন্ট অ্যাডভাইজরি ব্যুরো বলে একটা প্রতিষ্ঠান ছিল, আমাকে তার পার্টটাইম সেক্রেটারি করা হয়েছিল। সেখানে কাজ করলেও আমি আসলে মুসলিম লীগের কাজ করতাম।

৬. তেভাগা আন্দোলনের তাপ

তেভাগা আন্দোলনের সময় আমি ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলাম না। তবে যাদু মিয়াকে আসামি করে একটা মামলা দায়ের করা হলে আমি ঘটনাস্থলে যাই। যাদু মিয়া তখন বাড়িতেই ছিল। ওই সময় আমাদের জমি নিয়ে কোনো ধরনের গোলমাল হয়নি। কারণ, যাদু মিয়া দশ আনা-ছয় আনার একটা ভায়া মিডিয়া বের করেছিল। আমাদের জমির ওপর দশ আনা হিসাবে সবাই রাজি হয়। আর নেতারাও সবাই আমাদের বাড়িতেই ছিলেন। কাজেই আমাদের জমি নিয়ে কোনো ধরনের গোলমাল হয়নি। তেভাগা আন্দোলনের যাঁরা নেতা, তাঁদের মধ্যে আমার শুধু গোপাল হালদারের কথা মনে আছে। আমি শুনেছি যে গোপাল হালদার ঘটনাস্থলে গিয়েছিলেন। তেভাগা আন্দোলনের বেশির ভাগ নেতাই ছিলেন বাইরের। আর বাইরের ছাড়া যে দু-একজন নেতা ছিলেন, তাঁরা ছিলেন মুসলমান এবং তাঁরা এসেছিলেন কৃষক শ্রেণি থেকে। একজন মুসলমান কৃষক নেতা ছিলেন, তাঁর নামটা ঠিক মনে নেই। ডিমলার লোক। তিনি অনেক দিন জেল খেটেছেন এবং কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে জড়িত ছিলেন বহুদিন। আমার ধারণা, আন্দোলনটা হয়েছিল সংগত কারণেই। কিন্তু আন্দোলন করার সময়টা বোধ হয় ঠিক ছিল না। কারণ, এই সময়টায় হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে একটা অভাবিত রক্তাক্ত দ্বন্দ্ব-সংঘাতের ঘটনা ঘটছিল। এই সময়টার শুরু ওই ১৯৪৩ থেকে ১৯৪৬ সালের মধ্যে। চূড়ান্ত আন্দোলনে রূপ নেয় ১৯৪৫ সালে। ব্যাপারটা ক্লাইমেক্সে উঠল ফরটি ফাইভে। এই সময়টা আবার মুসলিম লীগের চূড়ান্ত উত্থানের সময়। তেভাগা আন্দোলনের নেতারা ছিলেন বাইরের। এটা হলো এক নম্বর। আবার দেশের ভেতরেও এই আন্দোলনের যাঁরা নেতা ছিলেন, তাঁদেরও বেশির ভাগ ছিলেন হিন্দু সম্প্রদায়ের। প্রজারা ছিলেন মুসলমান। মানে যাঁরা আধিয়ার, তাঁদের অধিকাংশই ছিলেন মুসলমান। সুতরাং তাঁদের কমিউনাল লাইনে ডিভাইড করা কোনো অসুবিধাজনক কিছু ছিল না। আমাদের ব্যক্তিগত ব্যাপারে যাদু মিয়াকে যে কেসে অভিযুক্ত করা হয়েছিল, সেটা ছিল মিথ্যা এবং কেসটা দায়ের করা হয়েছিল হত্যা মামলার।

তদনারায়ণ বর্মণ নামের একজনকে হত্যা করা হয়েছিল। *স্বাধীনতা* কাগজে এ রকমেরই হেডলাইন ছিল। তদনারায়ণ বর্মণ ছিলেন আমাদের প্রতিবেশী। আমার মামাদের প্রজা। আর তাঁর ভাগনেরা ছিলেন আবার আমাদের প্রজা। কেতাই বর্মণ ছিলেন আমাদের প্রজা। তাঁরাই এফআইআর করেন এবং তার সাক্ষী করা হয় হরিকান্ত পণ্ডিতকে। সেই পণ্ডিত আবার আমাদের প্রথম অক্ষরজ্ঞান দিয়েছিলেন। আমি যখন সংবাদ শুনি যে যাদু মিয়াকে প্রায় পাঁচ হাজার লোক আমাদের বাড়িতে ঘিরে রেখেছে এবং 'যাদু মিয়ার রক্ত চাই'

স্লোগান চলছে, সঙ্গে সঙ্গে এই খবর পেয়ে আমি বাড়ি চলে যাই। বাড়ি গিয়ে আমি প্রথম ওই পণ্ডিতের সঙ্গে যোগাযোগ করি। তাঁকে বলি যে আপনি আমাকে বলেন যে যাদু মিয়া কি গুলি করেছে? আমাকে তিনি বললেন যে আমি দেখি নাই। আমি বললাম, কথাটা আপনি নিশ্চিত করে বলেন। কারণ, আপনি তো এফআইআরের সাক্ষী।

তখন তিনি বললেন যে না, তিনি গুলি করেননি।

আমি বললাম, তাহলে কে করেছে?

তখন পণ্ডিতজি আমার এক মামাতো ভাইয়ের নাম বললেন। বললেন, আনসার এই কাজ করেছে।

আমি বলি, তাহলে আপনারা কেন মিথ্যা কেস করলেন?

বললেন, আমাদের বাবুরা বলেছে যে যাদু মিয়া হচ্ছেন এখানকার সবচেয়ে প্রভাবশালী লোক এবং তাঁকে যদি এক নম্বর আসামি না করা যায়, তাহলে এই মামলা টিকবে না। কাজেই আমরা তাঁকে ৩০২ ধারায় এক নম্বর আসামি করেছি।

তখন আমি পণ্ডিত মশায়কে বললাম, এটা তো আপনাকে সংশোধন করতে হবে। আর ততক্ষণে তাঁরা বুঝতে পেরেছে যে এভাবে এর সমাধান হবে না, আন্দোলনটা টিকবে না। ইতিমধ্যে অন্যান্য এলাকা থেকে খবর এসেছে আর্মড পুলিশ গিয়ে অত্যাচার করছে, ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দিচ্ছে, দেখে-শুনে তাঁদের মনে একটা ভীষণ ভয় জেগেছে। মানে সাধারণ লোকের মনে সাংঘাতিকভাবে ভয় জেগেছে। তারা এখন বলতে চাইছে যে আমরা শান্তি চাই। পুলিশের নিপীড়ন-নির্যাতনের মুখে তারা ভীতিবিহ্বল হয়ে পড়েছে। তখন আমাকে বললেন যে 'আমরা আপনার সঙ্গে সব রকম সহযোগিতা করতে পারি, আপনি যদি এটুকু ব্যবস্থা করতে পারেন যে আমাদের ওপর আর কোনো অত্যাচার হবে না।' আমি কলকাতা থেকে আসার আগে ফজলুর রহমান[২] সাহেবের মারফত নাজিমুদ্দিন সাহেবের কাছে গিয়ে বললাম যে আমার ভাইকে অন্যায়ভাবে ৩০২ ধারায় আসামি করা হয়েছে। আমি যেতে চাই। আমাকে সাহায্য করুন। উনি স্বরাষ্ট্রসচিবকে দিয়ে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে একটা চিঠি দিলেন। তাতে তিনি বললেন, আমাকে যেন সহযোগিতা করা হয়।

আমি ওই হরিকান্ত পণ্ডিতকে বললাম যে আমি যখন ডিমলা হয়ে আসি, তখন ওই চিঠিটা আমি ডেলিভারি করেছি। এবং ওকে আরও বলেছি যে এখানে যে গোলমালটা হচ্ছে, এটা বোধ হয় মিটে যাবে। আপনি খামোখা পুলিশ পাঠাবেন না। আমি ওই হরিকান্ত পণ্ডিতকে বললাম যে আপনারা যদি এই কথাটা বলতে রাজি হন যে আপনারা মিথ্যা মামলা করেছেন, তাহলে যাতে পুলিশি অত্যাচার আর না হয়, তার ব্যবস্থা আমি করতে পারব বলে আশা করি। পরের দিন

সকালবেলা যখন থানায় গেলাম, তখন ওরা সব ওখানে ছিল। থানায় আমি বললাম যে এরা যে এফআইআর করেছে, এখন বলছে যে এফআইআর রিপিউডিএইট করবে। আর শর্ত হলো যে এখানে সব ঠিকঠাক হয়ে গেছে, তোমরা খামোখা পুলিশ পাঠিয়ে অত্যাচার কোরো না।

তখন তারা বলল যে না, আমরা তো এটার কিছু করতে পারব না। আমাদের ওপর নির্দেশনা আছে।

আমি বললাম যে আমাকে ২৪ ঘণ্টা সময় দেন, তাহলে আমি এখনই নর্থ বেঙ্গল প্রেসে ফিরে যাচ্ছি। ওখানে গেলে নাজিমুদ্দিন সাহেব খুব ইমপ্রেসড হয়ে গেলেন। স্বরাষ্ট্রসচিব বললেন, বলো কী, তুমি একেবারে সেই এফআইআর যারা করেছে, তার সাক্ষী এবং তার লিডারকে সঙ্গে নিয়ে এসেছ? আমি বললাম, হ্যাঁ, তা-ই করেছি।

আমি কেতাই বর্মণ আর হরিকান্ত পণ্ডিতকে সঙ্গে নিয়ে কলকাতা চলে গিয়েছিলাম এবং পরের দিন রাইটার্স বিল্ডিংয়ে তাঁদের হাজির করি। হাজির করলে সবাই খুব ইমপ্রেসড হয়ে গিয়ে বলল যে ঠিক আছে। তবে যারা লিডার ছিল, তাদের আমরা সিলেকটিভ ওয়েতে অ্যারেস্ট করব। সমগ্র এলাকার ওপর কোনো নিপীড়ন-নির্যাতন চালানো হবে না। পরে আলীপুরে ফার্স্ট ক্লাস ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে গিয়ে তারা এফিডেভিট করল 'কে গুলি করেছে আমরা তা জানি না' বলে। তবে আমরা যে কেস দিয়েছি, সেটা ঠিক নয়, মিথ্যে।

এবার আন্দোলনটা কীভাবে দানা বাঁধল এবং বিস্তার লাভ করল, তার প্রকাশটা কী রকম ছিল, সে ব্যাপারে একটু বলি।

যারা জমি চাষ করত, তারা হো-হো-হো-হো করে এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত একটা আওয়াজ তুলত। সবাইকে জমায়েত করার জন্যই এমনটা করা হতো। মানে সবাই তখন এর সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিল।

এই আওয়াজটা আমি এখনো যে দু-এক সময় হঠাৎ হঠাৎ করেই শুনতে পাই। কিন্তু এমন কোনো একজন কৃষক আমি দেখিনি যে এই আওয়াজটার সঙ্গে সে সময় সুর মেলায়নি। মানে সে এক সাংঘাতিক ব্যাপার ছিল।

এই আন্দোলনে রাজনৈতিকভাবে প্রধানত নেতৃত্ব দিয়েছিল কমিউনিস্ট পার্টি। বলা হয়ে থাকে যে কৃষকদের মূল দাবি ছিল যে তাদের তিন ভাগ ফসল দিতে হবে। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার সেটা না। তাদের দাবি ছিল যে তিন ভাগের দুই ভাগ ফসল দিতে হবে। কিন্তু আধিয়ার বলে যে জিনিসটা চালু ছিল, সেটা প্রকৃতপক্ষে একটা চূড়ান্তভাবে অমানবিক শোষণগত প্রক্রিয়া ছিল। এই প্রথার মাধ্যমে কোনোমতে তাদের বাঁচিয়ে রাখা হতো। কারণ, তাদের বাঁচিয়ে রাখা দরকার ছিল।

তার মানে তারা তাদের চাষাবাদ করা ফসলের অর্ধেকও পেত না। বিশ্বাস করতে পারছেন না, আমি নিজে জোতদার হয়েও বলছি যে এই ব্যাপারটা একটা অমানবিক ব্যাপার ছিল এবং এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। এবং তারা যে তিন ভাগ ফসলের দুই ভাগ দাবি করেছিল, সেটা শুধু পুরোপুরি ন্যায়সংগত ছিল, তা-ই নয়, ওটার আরও কতকগুলো সামাজিক দিক ছিল। যেমন ধরুন, এটা করার পর আমরা যখন এই নিয়ম বা প্রথাটা তুলে দিলাম এবং ঘোষণা দিলাম যে আমরা ধানের পরিবর্তে সমপরিমাণ ধান নেব, তখন অন্য জোতদারেরা আমার কাছে রাতের বেলা এসে আমাকে এই বলে সাংঘাতিকভাবে ধমকালেন যে 'তোমরা তো এটার ওপর নির্ভর করে বাঁচবে না। তোমাদের তো বড় সম্পত্তি আছে, বাইরে আত্মীয়স্বজন আছে, ফলে তোমাদের চলে যায়, কিন্তু আমাদের তো এই আয়ের ওপরই নির্ভর করতে হয়। আমরা এখন তোমাদের এটা সমর্থন করি না। আমাদের আগের নিয়মই চলবে। আমাদের জিজ্ঞেস না করে এটা করলে কেন—তোমাকে জবাবদিহি করতে হবে।'

তখন আমি বললাম যে ওই লোকটার দ্বারাই তো তোমাদের কৃষিকাজটা চলে, তুমি নিজে তো আর জমি আবাদ করছ না। ওই লোকটাকে বাঁচিয়ে না রাখলে তুমি জমি আবাদ করবে কেমন করে? যেভাবে সে বাঁচছে, তাতে করে তো তার কোনো ক্ষমতাই নেই। এবং পরে দেখা গেল যে যারা আধিয়ার, তারা আর জমি চাষ করতে আগ্রহী নয় এবং ব্যাপারটা এখনো চলছে। এখন আমি যেটা দেখছি, তা হলো যে এখন প্রত্যেকেরই একটা করে গরুর গাড়ি আছে, কিংবা মহিষের গাড়ি আছে অথবা হাটে গিয়ে দোকান দিয়েছে। তারা জমিজমার চাষাবাদে আর মোটেও আগ্রহী নয়। কেননা, ওখান থেকে আয়ের পরিমাণ খুবই অল্প। কাজেই এটা যে শুধু মানবিক দিক ছিল, তা-ই না। কথা হলো, আমার যদি উৎপাদন বাড়াতেও হয়, তাহলে আমাকে কিছু না কিছু করতেই হবে।

ওই ব্যবস্থার কথা না হয় বাদই দেন। যে মানুষগুলো চাষাবাদ করে তাকে প্রণোদনা দেওয়া ছাড়া ওখানে তাকে আর ধরে রাখা যাবে না। কারণ, ওই আয়ের ওপর তার সংসার চলে না। তার সংসার এক জায়গায় ঠেকে নেই। বেশ বড় হয়েছে। ফলে সে আর মনোযোগ দিয়ে চাষাবাদ করে না। আর যদিও করে সেটুকু দিয়ে তার পেটের ভাত কোনোমতে হয়ে যায়। তবে চিন্তা থাকে কীভাবে তার রোজগার বাড়বে।

প্রসঙ্গের একটু বাইরে গিয়ে বলি, মুসলিম লীগ এই আন্দোলনের বিরোধিতা করেছে। কেননা, মুসলিম লীগের মধ্যে কারা ছিল? যারা জোতদার ছিল, তারাই মুসলিম লীগে ছিল। সুতরাং আমার স্বার্থের বিরুদ্ধে ব্যাপারটা চলে যায়। কাজেই মুসলিম লীগ তো এই আন্দোলনের বিরোধিতা করবেই। তবে কংগ্রেস করেছে কি না, আমি জানি না।

৭. মওলানা ভাসানী প্রসঙ্গ

মওলানা সাহেবের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় করাচিতে অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগের অধিবেশনে। ১৯৪৩-৪৪ সালের কথা সেটা। আমার ঠিক মনে নেই। সেই সময় আমরা বাংলার প্রতিনিধিরা আমাদের তাঁবু কনফারেন্স হলে যাচ্ছি। দেখি, একজন লোক মাথায় বেতের টুপি, গায়ে একটা খদ্দরের পাঞ্জাবি আর একটা চারকোনা লুঙ্গি পরা, পায়ে টায়ারের স্যান্ডেল। তিনি কতকগুলো 'ইশতেহার' বিলি করছেন। তিনি ছুটে ছুটেই সেগুলো বিলি করছিলেন। ব্যাপারটা দেখে আমার পাশে যে লোক ছিলেন আমি জিজ্ঞেস করলাম, ওই ভদ্রলোক কে?

তিনি বললেন, উনি ভাসানীর চরের মওলানা, আবদুল হামিদ তাঁর নাম। সেটা (ইশতেহার) ছিল আসামের লাইন প্রথার বিরুদ্ধে এবং ওটার বিষয়বস্তু হচ্ছে যে এখন মুসলিম লীগেরই গভর্নমেন্ট, স্যার মোহাম্মদ সাদউল্লা তখন আসামের চিফ মিনিস্টার, লাইন প্রথা এখন উঠবে না কেন? যেতে যেতে ওই ইশতেহারটা পড়লাম। ইংরেজিতে লেখা ছিল সেটা। কেননা, সবাই যাতে পড়তে পারেন, সে কারণে ওটা ইংরেজিতেই লেখা ছিল। তারপর ভেতরে যখন গেলাম, তখন দেখি মওলানা সাহেব বারবার উঠছেন আর জিন্নাহ সাহেব তাঁকে 'সিট ডাউন মওলানা সাহেব' বলে বসিয়ে দিচ্ছেন। তখন মওলানা একবার প্রায় দৌড়ে গিয়ে ডায়াসে উঠে গেলেন। উঠে গিয়ে বললেন যে আমার একটা রেজল্যুশন আছে। কথাটা তিনি উর্দুতে বললেন। বললেন যে রেজল্যুশনটা সাজেস্ট কমিটি বাছাইয়ের পর বাদ দিয়ে দিয়েছে। ওটা আমি উত্থাপন করতে চাই।

সাধারণ অধিবেশনেই ঘটনাটা ঘটে। সাজেস্ট কমিটিতে বাদ দেওয়ার ফলে ওটাকে আর উত্থাপন করা যায় না বলেই মওলানা সাহেব ব্যাপারটা নিয়ে লাফাচ্ছিলেন। শেষ পর্যন্ত জিন্নাহ সাহেব ন্যাশনাল গার্ড ডেকে ডায়াস থেকে মওলানা সাহেবকে নামিয়ে দিলেন।

সেশন ভাঙার পর মওলানা সাহেব কেবল ওটাই বোঝানোর চেষ্টা করতে থাকেন সবাইকে গ্রুপে গ্রুপে ভাগ করে। আমি সে সময় এই লাইন ব্যবস্থা সম্পর্কে মওলানাকে জিজ্ঞেস করলাম। এ ব্যাপারে আগে আমার কোনো ধারণাই ছিল না। পরে শুনলাম যে মওলানা সাহেব এই চর অঞ্চল থেকে লোক নিয়ে গিয়ে আসামে জঙ্গল কেটে সেখানে তাদের বসতি স্থাপনে সাহায্য করেছেন। তখন আসামের চিফ মিনিস্টার গোপীনাথ বড়দৌলী। উনি এই লাইন ব্যবস্থাটা চালু করেছিলেন। ফলে বাঙালিরা এই লাইনের উত্তরে আর যেতে পারবে না। এবং যারা গিয়েছিল, হাতিটাতি দিয়ে বাড়িঘর ভেঙে ফেলে তাদের সেখান থেকে উচ্ছেদ করা হয়েছে। মওলানা সাহেবের কথা হচ্ছে, গোপীনাথ বড়দৌলী আপনারা তো জানেন যে কংগ্রেস বলেছিল যে গভর্নমেন্ট থেকে পদত্যাগ করো। এটা বোধ হয় ১৯৩৯

সালের কথা। তখন গোপীনাথ মেম্বার কিন্তু মন্ত্রিত্ব ছেড়ে দিলেন।

তখন কংগ্রেস সাপোর্ট করে সাদউল্লাকে আনা হলো চিফ মিনিস্টার করে। সাদউল্লার গভর্নমেন্ট কিন্তু কংগ্রেসের ওপর নির্ভরশীল ছিল। কংগ্রেস তাঁকে বলেছে, তুমি যদি লাইন প্রথা তুলে দাও, তাহলে তোমার ওপর থেকে আমরা সাপোর্ট তুলে নেব। কাজেই সাদউল্লা কিছু করতে পারেন না। এটা হলো মওলানার দাবি, মুসলিম লীগের গভর্নমেন্ট কেন এই প্রথা তুলবে না? অর্থাৎ মুসলিম লীগের গভর্নমেন্ট তখন নির্ভরশীল হচ্ছিল কংগ্রেসের ওপর।

ওই প্রথম মওলানা সাহেবকে দেখে এবং তাঁর এসব কথা শুনে খুব মুগ্ধ হলাম। পরে যখন সিলেটে গণভোট বা রেফারেন্ডাম হলো, তখন তিনি পাকিস্তানের পক্ষে কাজ করলেন এবং আওয়ামী লীগ গঠন করলেন এবং তখন যদিও আমি মুসলিম লীগে, আমার ভাইও মুসলিম লীগে এবং আমি যাদের সঙ্গে কাজ করছিলাম, তারাও মুসলিম লীগ করত। আমি মুসলিম লীগ থেকে সরে এসেছিলাম অনেক আগেই। দেশ ভাগ হওয়ার আগেই আমি সরে আসি। কিন্তু সরে এলেও বরাবর ফজলুর রহমানের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা ছিল। শুধু ফজলুর রহমান সাহেবই নন, আরও অনেকেই মুসলিম লীগে ছিলেন। কিন্তু ফজলুর রহমান সাহেবের সঙ্গে বিশেষভাবে আমার একটা সম্পর্ক ছিল।

৮. মুসলিম লীগ ও আমি

আমি নীলফামারী মুসলিম লীগের সদস্য ছিলাম। রংপুর মুসলিম লীগে ছিলাম। তারপর আমি অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগ কাউন্সিলের মেম্বার হই। মুসলিম লীগ করার সময়কার একটা ঘটনা, যেটা আমি মনে করি ইতিহাসের স্বার্থেই জানানো দরকার, সেটা ক্যাবিনেট মিশন[৩] প্রস্তাবসংক্রান্ত। এটা ১৯৪৬ সালের মে মাসের কথা। ১৪তম প্ল্যান যেটা, সেটা করা হয় ইম্পোরিয়াল হোটেলে বসে এবং আমি অন্তত যেটুকু জানি, তার থেকে মনে করি, খুবই গুরুত্বপূর্ণ পরিকল্পনা ছিল সেটা। তিন দিন ধরে এ নিয়ে অধিবেশন চললেও জিন্নাহ সাহেব গ্রুপিং পাস করাতে পারছিলেন না।

হোটেল ছিল দিল্লিতে। অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগ কাউন্সিলের মিটিংয়ে জিন্নাহ সাহেব প্লিড করছিলেন গ্রুপিং গ্রহণ করার জন্য। তিন দিন ধরে ডিবেট চলেছে। এটার বিরুদ্ধে একটা বিরাট প্রতিবাদ—যে তুমি এত দিন বলছ পাকিস্তান, গ্রুপিং ফল শর্ট অব পাকিস্তান, এটা তুমি অ্যাকসেপ্ট করার জন্য কেন বলছ? জিন্নাহর জন্য সময়টা বেশ কঠিন ছিল। জিন্নাহ সাহেব হ্যাড এ ভেরি টাফ টাইম। আমার মনে আছে, মওলানা হজরত মোহানি ফ্রম ইউপি, আর জেড এ জিলানী তারপর আমাদের আবুল হাশিম[৪] সাহেব, আমরা যদিও এদের সঙ্গেই ছিলাম। কারণ, আমি

তো তখন ঘোর পাকিস্তানি। আমার মত হলো, আমরা এটা গ্রহণ করব না।

তখন বলছেন যে 'উই ক্যানট ফাইট বোথ হিন্দুজ অ্যান্ড দ্য ব্রিটিশ অ্যাট আ টাইম।' পাকিস্তান আমরা এক দিনে হাসিল করতে পারব না। হেয়ার ইজ সামথিং দ্যাট উই শুড অ্যাকসেপ্ট। যা-ই হোক, তিন দিন ধরে চেষ্টা চালিয়েও উনি গ্রুপিং পাস করাতে পারছিলেন না। মানে সাধারণ পরিস্থিতিটা ছিল তার বিরুদ্ধে। গ্রুপিং গ্রহণ করার বিরুদ্ধে তারপর রাতে ওয়ার্কিং কমিটির মেম্বার সোহরাওয়ার্দী সাহেব, নাজিমুদ্দিন এই দুজন ছিলেন বাংলার এবং অন্যদের ডেকে বললেন যে কালকে ১০টার মধ্যে এটাকে পাস করিয়ে দিতে হবে। যত রকমের বিরুদ্ধতাই থাকুক না কেন, এটা কায়েদে আযমের অর্ডার। আমরা তো নাছোড়বান্দা। আমরা কেন এটা গ্রহণ করব? নাজিমুদ্দিন সাহেব তো সোজাসরল মানুষ, উনি বললেন যে 'ভাইসব জিন্নাহ সাহেব বলেছেন, তোমরা যদি গ্রহণ করো এবং কংগ্রেস যদি গ্রহণ না-ও করে, তাহলে যারা যারা এটা গ্রহণ করবে, তাদের দিয়ে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন করা হবে।'

আবুল হাশিম সাহেবকে আমরা গিয়ে বললাম, মুসলিম লীগ গ্রহণ করল কি করল না, কংগ্রেস গ্রহণ করল কি করল না, কংগ্রেসকে বাদ দিয়ে যা অন্তর্বর্তীকালীন সরকার হবে, আমরা সেটা বিশ্বাস করি না।

ওরা বলল যে—'না, ওয়াভেল হ্যাজ প্রমিজড। জিন্নাহ সাহেব মাস্ট গো টু ওয়াভেল অ্যান্ড হ্যাভ আ লাঞ্চ উইথ হিম অ্যান্ড হি মাস্ট কনভে দ্যাট।' আমরা ওয়ার্কিং কমিটি এবং কাউন্সিল ব্যাপারটা গ্রহণ করেছি। হেয়ার ইজ আ চান্স ফর আস টু গো ইনটু দ্য গভর্নমেন্ট। সুতরাং আমাদের এটা গ্রহণ করতেই হবে।

শেষ পর্যন্ত হলো এই যে ওয়াভেলকে সরিয়ে দেওয়া হলো। ওয়াভেল তাঁর কথা রাখতে পারলেন না। কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে আমার এই ধারণা ছিল যে কংগ্রেসকে বাদ দিয়ে ব্রিটিশরা কিছু করবে না এবং এটাই প্রমাণিত হলো এবং আমার খুব জানার ইচ্ছা ছিল যে কংগ্রেস কী গ্রাউন্ডে এটাকে গ্রহণ করছিল না। দ্যাট ওয়াজ দি ওনলি ওকেশন যে মুসলিম লীগ যেকোনো প্রস্তাবের ব্যাপারে কংগ্রেসের আগে ওপিনিয়ন দিয়েছে। এর আগে কংগ্রেস সব ব্যাপারে আগে আগে কথা বলত, মুসলিম লীগ তার পরে বলত। এবারই প্রথম মুসলিম লীগ এ ব্যাপারে আগে কথা বলল। কংগ্রেস তারপর মিট করেছে। আমি দিল্লিতে কয়েক দিন বেশি থাকলাম। আমার এক আত্মীয়া ছিলেন তখন সচিবালয়ে। তাঁর বাড়িতে থেকেই আমি কংগ্রেসের মিটিংয়ে অগ্রগতি ইত্যাদি সম্পর্কে জানার চেষ্টা করলাম। মিটিং হচ্ছিল বিরলা ভবনে। তার সামনে দিয়ে আমি ঘোরাঘুরি করছি। হঠাৎ *স্টেটসম্যান*-এর একজন সংবাদদাতার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। তাঁকে দেখে আমি বললাম, 'ভাই, আপনি বলেন তো ভেতরে কী হচ্ছে?'

তিনি জবাবে বললেন, 'এখন তো বলতে পারব না, বিকেলে এলে বলতে পারব।'

আমি বিকেলে সেখানে গেলাম। আমাকে বলা হলো, প্রস্তাব গ্রহণ করার পক্ষেই পাল্লাটা ভারী। তিনি আরও জানালেন যে আজকের রাতটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

আমি বললাম, কিসের জন্য?

বলা হলো, তা তো জানি না, কিন্তু আজকের রাতটায় যদি এই মতামতটা থাকে, তাহলে কালকে তা গৃহীত হয়ে যাবে। পরদিন সকালে গেলে বলা হলো, রাতে গোলমাল হয়ে গেছে।

জিজ্ঞেস করি, কী হয়েছে?

বলা হলো যে সরদার প্যাটেল বলেছেন, মুসলিম লীগের সঙ্গে কোনো ধরনের গভর্নমেন্ট ফর্ম করা সম্ভব নয়।

আর গোপীনাথ বড়দৌলী গান্ধীজির পায়ে গিয়ে পড়ে বলতে লাগলেন, বাপুজি আপনি (বাংলা আর আসাম মিলে একটা গ্রুপ) ঠেকান। এই তো বাঙালিরা আমার আসাম দখল করে ফেলবে, তুমি ছাড়া আমাকে আর বাঁচানোর কেউ নেই। গোপীনাথ বড়দৌলী গান্ধীজির কাছ থেকে যতক্ষণ কথা পাননি, ততক্ষণ তিনি গান্ধীজির পায়ের ওপর মাথা দিয়ে বসে ছিলেন আর কেবলি বলছিলেন যে তুমি আমাকে বাঁচাও। আমার আসামকে বাঁচাও। গোপীনাথ বড়দৌলী এবং সরদার প্যাটেল গ্রুপিংটা অপোজ করেছিল এবং এ কারণেই আমাদের এই উপমহাদেশের চেহারা হয়তো পুরোপুরি ভিন্ন হয়ে যেতে পারত। ওই গ্রুপিং যদি মেনে নেওয়া হতো, তাহলে পুরো জিনিসটা অন্য রকম হয়ে যেত। কিন্তু ওই দুজনের জন্যই হয়নি।

এসব কথা আমার প্রত্যক্ষ নলেজ থেকেই আমি বলছি। কেননা, আমি এটুকু জানার জন্যই সেখানে গিয়েছিলাম। আমার সন্দেহ ছিল যে কংগ্রেসকে বাদ দিয়ে ওয়াভেল এটা করতে পারেন না এবং শেষ পর্যন্ত ওয়াভেলকে সরানো হয়। তাঁর জায়গায় মাউন্ট ব্যাটেন সাহেব আসেন।

৯. যুক্তফ্রন্ট গঠন ও যাদু মিয়া প্রসঙ্গ

এবার মওলানা ভাসানী সম্পর্কে কিছু কথা বলি। যুক্তফ্রন্টের[৫] প্রতি আমার সহানুভূতি ছিল। যদিও আমার আত্মীয়স্বজন কিংবা বন্ধু-বান্ধবদের সবাই মুসলিম লীগে ছিল এবং যুক্তফ্রন্টের বিজয়ে আমি আন্তরিকভাবে খুশি হয়েছিলাম।

চুয়ান্ন সালে যুক্তফ্রন্টের বিজয়ে আমি খুশি হলেও তারপর ফ্রন্টের তিন প্রধান নেতা মিলে যেসব ঘটনা ঘটিয়ে চলেন, তাতে আমি রাজনীতিতে যতখানি এঁদের সঙ্গে অ্যাসোসিয়েটেড হব বলে ভেবেছিলাম, সবকিছু দেখে আমি আবার পিছিয়ে

গেলাম। ভেবেছিলাম মওলানা সাহেব যদি নিজে কোনো দিন দল করেন, আর সেটা যদি কোনো আদর্শভিত্তিক দল হয়, তাহলে তাঁর সঙ্গে আমি যুক্ত হব। আওয়ামী লীগের কাউন্সিলে সংশোধনী করার পরপরই উনি বেরিয়ে এলেন দল থেকে। সংশোধনী দুটো হলো যে স্বাধীন নিরপেক্ষ বৈদেশিক নীতির ভিত্তিতে যে সংশোধনীটা হলো, সেই থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করে যখন তিনি ন্যাপ সংগঠিত করবেন বলে ঠিক করলেন, তখন আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করি এবং মওলানাকে বলি যে আপনি যদি কোনো পার্টি করেন, তাহলে আমি তার সঙ্গে যুক্ত থাকতে চাই। যাই হোক, উনি বললেন, ঠিক আছে। যখনই ন্যাপের মিটিং হয় তখনই আমি যাদু মিয়াকে[৬] রংপুর থেকে নিয়ে আসি এবং যাদু মিয়ার সঙ্গে রংপুরের অনেক মুসলিম লীগের লোক এসে ন্যাপে যোগ দেন।

তাঁর সঙ্গে যোগ দেওয়ার পর আমাকে ন্যাপের কেন্দ্রীয় কমিটির যে সিটটা উনি অফার করেছিলেন, আমি বললাম যে এটা আমার চেয়ে বরং যাদু মিয়াকে দেওয়া উচিত। কারণ, তিনি মুসলিম লীগের ওয়ার্কিং কমিটির মেম্বার এবং ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের চেয়ারম্যান। তিনি যখন এত কিছু ছেড়েছুড়ে দিয়ে আপনার কাছে এলেন, তখন তাঁকেই এটা দেওয়া উচিত। যাদু মিয়ার সঙ্গে মওলানার আগে কোনো ধরনের যোগাযোগ ছিল না। আমি তাকে তাঁর কাছে নিয়ে আসি। বলতে গেলে আমিই তাকে রাজনৈতিকভাবে প্রভাবিত করে নিয়ে আসি এবং সেই সময় রংপুরে যাঁরা মুসলিম লীগের রাজনীতি করতেন, তাঁদের মধ্যে অসাম্প্রদায়িক বলে আমাদের একটা পরিচিতি ছিল। সে জন্যই রংপুরের যাঁরা অন্যান্য হিন্দু লিডার ছিলেন, তাঁরাও যাদু মিয়াকে পছন্দ করতেন। ন্যাপ যে একটা অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক দল হিসেবে গড়ে উঠবে, সে সম্পর্কে সবাই ধারণা করেছিলেন।

রংপুরেও দলটির সমর্থন কম ছিল না। তাঁরাও তাঁকে বললেন ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টিতে যেতে এবং তারপর আমি তাঁকে নিয়ে এলাম। যাদু মিয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁরাও এলেন এবং তাঁদের সঙ্গে অনেক দিন রাজনীতি করেছেন যাদু মিয়া।

ভাসানী সাহেব আমাকে যখন ওয়ার্কিং কমিটির মেম্বার করতে চাইলেন, আমি তখন বললাম যে যাদু মিয়াকে করুন। আমাকে মেম্বার করেন আর না-ই করেন, আমি তো থাকবই; কিন্তু যদি অফিশিয়ালি আপনি কাউকে করতে চান, তাহলে আমাকে না করে তাকে করেন। কারণ, সে এত ত্যাগ স্বীকার করে এসেছে। ফলে যাদু মিয়াকে সেন্ট্রাল ওয়ার্কিং কমিটির মেম্বার করা হলো।

১০. ন্যাপের জনপ্রিয়তা

ন্যাপের সংগঠনের মধ্যে কমিউনিস্ট পার্টির খুব সাংঘাতিক একটা উন্নয়নের সুযোগ ছিল। তখন যাঁরা বামপন্থী ছিলেন, তাঁদের মধ্যে একটা দ্বিধা ছিল। ন্যাপের সদস্য

কর্মকর্তাদের অধিকাংশই বামপন্থী ছিলেন। মওলানা সাহেব যে সমর্থন তুলে নিলেন আতাউর রহমানের সরকারের ওপর থেকে, এ নিয়ে একটা দ্বিধা ছিল। আমার নিজেরও দ্বিধা ছিল। ব্যাপারটা নিয়ে মিটিংয়ে অনেক দিন আলাপ-আলোচনা করা হয়েছে এবং শেষ পর্যন্ত মওলানা সাহেব এবং তাঁর সঙ্গে পশ্চিম পাকিস্তানি যেসব লিডার ছিলেন, তাঁরা এটা চাপিয়ে দিয়েছিলেন এবং আমরাও তখন একটা নতুন ধরনের রাজনীতি করতে যাচ্ছি বলে ভেবেছি। ভেবেছি ইস্ট অ্যান্ড ওয়েস্ট পাকিস্তান মিলে রাজনীতি করলে মন্দ কি! কিন্তু একটা প্রাদেশিক সরকারের কেন পতন ঘটানো হবে, তার পক্ষে কোনো যুক্তি খুঁজে পেতাম না। কেন তাকে স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বৈদেশিক নীতি (ইনডিপেনডেন্ট অ্যান্ড নিউট্রাল ফরেন পলিসি) মানতে হবে। এ জন্য প্রাদেশিক সরকারকে (প্রভিন্সিয়াল গভর্নমেন্টকে) কেন ফেল করানো হবে? সেদিন আমরা অনেক রাত পর্যন্ত ছিলাম মওলানা সাহেবের সঙ্গে। এর আগে চার-পাঁচ দিন ধরে নানা ধরনের আলাপ-আলোচনা চলছিল।

এ রকমের একটা প্রশ্ন উঠতে পারে যে আওয়ামী লীগ থেকে বেরিয়ে আসাটা ঠিক হয়েছিল কি না? আমি মনে করি যে ঠিক হয়েছিল। কারণ, আওয়ামী লীগ তখন লেজুড়বৃত্তির রাজনীতি শুরু করে দিয়েছিল। সোহরাওয়ার্দী সাহেবের সেই মন্তব্য 'জিরো প্লাস জিরো' তারপর তখনকার পূর্ব পাকিস্তান (আজকের বাংলাদেশ) প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন শতকরা ৯৮ ভাগ পেয়ে গেছে। আমি চিফ মিনিস্টার—এসব বুলির কারণে আওয়ামী লীগের সেই যে একটা ভাবমূর্তি ছিল, যে জন্য আওয়ামী লীগের প্রতি মানুষ আকৃষ্ট হচ্ছিল, সেই জিনিসটা চলে গিয়েছিল এবং সেই জিনিসটাই ন্যাপ তুলে ধরল। সেটা তুলে ধরাতেই ন্যাপের জনপ্রিয়তাও খুব বাড়ছিল।

১১. ভাসানী ও যুক্তফ্রন্ট প্রসঙ্গ

শেখ মুজিবের সঙ্গে আমার পার্সোনাল কোনো যোগাযোগ ছিল কি না, এ রকমের প্রশ্নের জবাবে বলতে হয়— আইয়ুববিরোধী যে ছাত্র আন্দোলনটা শুরু করা হয়, ব্যক্তিগতভাবে বলতে গেলে বলতে হয় আমি সেই ছাত্র আন্দোলনের সঙ্গে খুব নিবিড়ভাবে জড়িত ছিলাম। ছাত্র না হলেও।

আমার ছাত্রত্ব শেষ হয়ে গিয়েছিল ১৯৪২ সালে। আমি তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের ছাত্র।

ফজলুল হক সাহেবের নেতৃত্বাধীন শ্যামা-হক মন্ত্রিসভার[৭] বিরুদ্ধে নানা রকম প্রতিবাদ করেছিলাম বলে আমাকে রাসটিকেট করা হয়েছিল। যা-ই হোক মওলানা সাহেব সমর্থন তুলে নেওয়ার পর আমরা কিন্তু মওলানা সাহেবকে

একটাই কন্ডিশন দিয়েছিলাম এই বলে যে 'দেখেন, আপনি যখন একটা সরকারের পতন ঘটাচ্ছেন, তখন এটা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব যে আরেকটা সরকার আমরা আনব। বিকল্প সরকার আমরা জনগণকে দেব। আমরা সেই সরকারে অংশগ্রহণ করি কি না করি, সেটা হলো অন্য কথা। কিন্তু একটা সরকার আমাদের আনতেই হবে। সংসদীয় ব্যবস্থাটা আমরা বজায় রাখব।' মওলানা সাহেবের একটা চরিত্র ছিল, এটা কেন উনি করতেন আমি জানি না, সংকটের সময় তিনি নিখোঁজ হয়ে যেতেন। আমরা তাঁকে বারবার এ কথাটাই বললাম যে আপনি কিন্তু থাকবেন। আপনি ঢাকা থেকে যাবেন না। তখন উনি রয়েল স্টেশনারির ব্যারিস্টার শওকত আলীর ওখানে থাকতেন। আমরা বাসায় এসেছি। আমার বাসায়ও তিন-চারজন মেম্বার ছিলেন। আমরা ঘুমিয়ে গেছি। ভোর ছয়টার দিকে আমার দরজায় ধাক্কাধাক্কির শব্দ পেলাম। বাইরে থেকে কে যেন দরজা ধাক্কাচ্ছিলেন আর বলছিলেন, 'উঠেন, উঠেন'।

আমি বলি, কী ব্যাপার?

জানানো হলো যে মওলানা সাহেব তো চলে গেছেন।

আমি তো বিশ্বাসই করতে পারলাম না। কী করে মওলানা সাহেব গেলেন। আমরা তো এগারোটার সময় এলাম।

আগত ব্যক্তি জানালেন, না, এগারোটা চল্লিশে যে বাহাদুরাবাদ ট্রেন আছে, সেই ট্রেনে চেপে উনি চলে গেছেন।

বলি, কোথায় গেছেন?

বলেন, পাঁচবিবিতে।

তখন আমি বললাম, আমি কী করতে পারি?

বললেন, আপনাকে এখন যেতে হবে মওলানা সাহেবকে আনার জন্য।

আমি বললাম যে এটা অসম্ভব। আমি যেতে পারব না। শওকতকে পাঠাও।

বললেন, না, শওকত বলছে, সে যেতে পারবে না।

তারা এত জেদ ধরে বসল যে শেষে আমি বলতে বাধ্য হলাম যে আমি কিন্তু আপনাদের কাছ থেকে একটা অনুমতি চাই। মওলানা সাহেবকে তো আমি জোর করে আনতে পারব না। উনি যদি না আসতে চান, তাহলে হয় আমি মওলানা সাহেবকে নিয়ে আসব অথবা তাঁর পদত্যাগপত্র নিয়ে আসব। দুটোর একটা করব। যা-ই হোক সে অনেক ঘটনা। আমি যখন সকালবেলা পাঁচবিবিতে মওলানা সাহেবের কাছে গেলাম, গিয়ে আমগাছের নিচে মাচায় বসে খবর পাঠালাম। কিছুক্ষণ পর মওলানা সাহেব এলেন।

এসে বললেন, 'সিধু, তুমি?'

আমি বললাম, আপনি তো কাউকে না বলেই চলে এলেন। ব্যাপারটা কী বলেন

তো? আপনি একটা পার্টির প্রেসিডেন্ট, আপনার কথামতো সমর্থন তুলে নিয়ে একটা সরকারের আমরা পতন ঘটালাম। বিকল্প একটা সরকার গঠন না করেই আপনি চলে এলেন?

তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, আমাকে এসে হামিদুল হক চৌধুরী[৮] আর ফরিদ আহমেদ[৯], তারা খবর দিল যে তারা জয়েন্ট ইলেকটরেটে রাজি না। মানে আগে চুক্তি ছিল যে তারা জয়েন্ট ইলেকটরেট করবে কিন্তু এখন তারা জয়েন্ট ইলেকটরেটে রাজি না। নেজামে ইসলাম পার্টি না। তারা আপত্তি করেছে। কাজেই কোনো সরকার হয় না। সুতরাং সে প্রস্তাব এখন বাদ দিতে হবে। আমি তাই বিরক্ত হয়ে চলে এসেছি।'

আমি বললাম, আপনি একটা পার্টির প্রেসিডেন্ট। এ রকম একটা সংকটের মুহূর্তে আপনি চলে এলেন, এটা তো হতে পারে না। আপনাকে যেতে হবে। বললেন, 'না, আমি আর গিয়ে কী করব?' তখন আমি সত্যি সত্যি খুবই মর্মাহত হলাম। একটা দলের প্রেসিডেন্টের কাছ থেকে এ রকম একটা জিনিস আমি আশাই করতে পারিনি। পার্টিকে এ রকম একটা অনিশ্চয়তার মধ্যে রেখে দলের প্রধান নিজে সরে আসেন। ব্যাপারটা আমি কোনোভাবেই মেনে নিতে পারছিলাম না। আমি যাওয়ার সময়ই ওদের যেমন বলেছিলাম যে আমি উনার পদত্যাগপত্র নিয়ে আসব। সেই মর্মে আমি একটা পদত্যাগপত্র তৈরি করে নিয়ে গিয়েছিলাম। আমি যখন কয়েকবার বলার পরও উনাকে রাজি করাতে পারলাম না, আমি তখন তাঁকে বললাম, ঠিক আছে যাবেন না যখন, তখন এইটা একটু সই করে দিন।

উনি কাগজটা পড়ে আমাকে বললেন, 'এটা কী?'

আমি বললাম, এটা তো আপনার পদত্যাগপত্র। হয় আপনি যাবেন, না হয় আপনার পদত্যাগপত্র নিয়ে যাব।

তখন তিনি বললেন, 'আচ্ছা বসো।' ১০-১৫ মিনিট পর তাঁর টিনের সুটকেস নিয়ে বের হয়ে বললেন, 'চলো যাই।'

১২. ভাসানী সম্পর্কে একটি মূল্যায়ন

আমরা ঢাকায় এলাম। মধ্যখানে রেডিওতে শুনলাম যে এখানে একটা সরকার গঠিত হয়েছে ন্যাপকে বাদ দিয়েই। ন্যাপের একটা বিরাট সম্ভাবনা ছিল এবং মওলানা সাহেবই এই সম্ভাবনার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ালেন। বাধাটা এই অর্থে যে মওলানা সাহেব ১৯৫৪ সালে সংসদীয় ব্যবস্থার রাজনীতিতে যে ধোঁকাটা খেয়েছিলেন, নিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতির ব্যাপারে আওয়ামী লীগ তাঁকে যে ধোঁকাটা দিয়েছিল, তাতে তিনি ভীষণভাবে অসন্তুষ্ট ছিলেন। আর দ্বিতীয়ত, তাঁর মনে এ রকমের একটা ধারণা ছিল এবং সে ব্যাপারে তাঁকে অনেকেই এই বলে উসকানি

দিচ্ছিলেন যে 'মওলানা সাহেব, আপনি তো পার্টির প্রেসিডেন্ট হতে পারবেন, কিন্তু সরকারপ্রধান তো কোনো দিনই হতে পারবেন না। আপনাকে মই হিসেবে ব্যবহার করে মানুষ ওপরে উঠে যাবে, তারপর আপনাকে লাথি মেরে ফেলে দেবে'—এ রকমের ধারণা তাঁর মাথার মধ্যে সাংঘাতিকভাবে গেঁথে গিয়েছিল। সে সময় ন্যাপের এতটাই জনপ্রিয়তা ছিল যে বাইরে থেকে যাঁরা ব্যারিস্টার হয়ে আসতেন, এখানে এসেই তাঁরা সোজা ন্যাপে জয়েন করতেন। মানে বেশ কিছু ভালো ব্যারিস্টার ও আইনজীবী ন্যাপের প্রতি এই ভেবে আকৃষ্ট হয়েছিলেন যে এই দলটি ভবিষ্যতের দল। এর ভবিষ্যৎ আছে। কিন্তু দলটির এত যে সম্ভাবনা ছিল, মওলানা সাহেব তাঁর নিজের কারণে এই সম্ভাবনাকে নষ্ট করে দিলেন। এবং পরবর্তীকালে এ জন্য আমাদের ওপরই সব দোষ চাপানো হয়। বিশেষ করে, কমিউনিস্টদের ওপর। কিন্তু আমার সঙ্গে কমিউনিস্টদের যে কথাবার্তা হয়েছিল, তার পরিপ্রেক্ষিতে বলতে গেলে বলতে হয়, তারা একটা ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক রেভল্যুশন চাচ্ছিলেন। আমি যখন কৃষক সমিতির কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলাম, তখন আমি নিজে কৃষক সমিতির কনফারেন্সে তেভাগার অনুকূলে প্রস্তাব পর্যন্ত আনতে বলেছিলাম।

কৃষক সমিতির নেতারা তখন বলেছেন যে না, আমাদের জেনারেল পলিটিক্সটার ভেতর আমরা এখন সেকশনাল পলিটিক্সকে আনতে দেব না। আমরা এখন সত্যিকারভাবেই একটা ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক রেভল্যুশন চাই। কাজেই কমিউনিস্টরা ন্যাপের অগ্রগতির জন্য কোনো ধরনের বাধা ছিল না। বাধা ছিলেন মওলানা ভাসানী। তিনি তাঁর নিজের সীমাবদ্ধতা বা ভুলের জন্য এটাকে বাড়তে দেননি এবং বারবার ন্যাপকে নির্বাচনে যেতে দিচ্ছিলেন না। নির্বাচন এলেই বয়কট করার ডাক দিয়ে যাচ্ছিলেন।

আসলে মওলানা ভাসানী ছিলেন একজন পীর মানুষ। আবার এদিক দিয়ে তাঁর সব রকমের চিন্তার খোরাক জুগিয়ে চলেছিলেন কমিউনিস্টরা। কারণ, কমিউনিস্ট পার্টির যাঁরা কৃষক ফ্রন্টে ছিলেন, তাঁরা তো মওলানা সাহেবের খুব প্রিয় ছিলেন। যেমন: জিতেন ঘোষ[১০], জ্ঞান চক্রবর্তী[১১]—এঁরা সব সময়ই মওলানা সাহেবের সঙ্গে ছিলেন এবং তিনি তাঁদের খুবই মানতেন। তাঁদের কথা শুনতেন। পরের দিকে এসে যেটা হলো, তিনি সরে গেলেন। তাঁর এই বামপন্থী বন্ধুদের কাছ থেকে সরে গিয়ে একেবারেই আবার ইসলামের দিকে চলে গেলেন। তাঁর সত্যিকার দ্বন্দ্বটা এখানেই। তিনি হয়তো চেয়েছিলেন যে ইসলাম এবং সমাজতন্ত্র—এই দুটোকে সমন্বয় করার জন্য। কিন্তু আমার মনে হয় না তাঁর সেই ক্ষমতা ছিল। কারণ, ইসলামের একজন পণ্ডিত হিসেবে তাঁকে কোনো দিন কেউ স্বীকৃতি দেননি। কেবল একজন কৃষকনেতা হিসেবে তাঁর স্বীকৃতি বা পরিচিতি ছিল। কিন্তু মওলানা হিসেবে তাঁর কোনো স্বীকৃতি ছিল না, পীর হিসেবে ছিল।

কিন্তু একজন আলেম হিসেবে তাঁর কোনো ধরনের স্বীকৃতি ছিল না। কিন্তু শেষের দিকে তিনি ওই সব দিকেই ঝুঁকেছিলেন।

আমি তাঁর পড়াশোনা সম্পর্কেও কিছু জানি না। বলতেও পারব না। কারণ, আমার সঙ্গে যে সময় তাঁর পরিচয়, আমি কেবল তাঁর সেই সময়ের কথা বলতে পারব। মওলানা সাহেব সম্পর্কে আরও কতগুলো ঘটনা বলছি।

ধানমন্ডির বাড়ি থেকে তাঁকে রিলিজ করার পর উনি আমাকে তাঁর সঙ্গে দেখা করার জন্য সন্তোষে যাওয়ার জন্য খবর পাঠালেন। আমি গেলাম। যাওয়ার পর উনি আমাকে একটা চিঠি দিয়ে বললেন, 'পড়ো। চিঠিটা আইয়ুব খানের লেখা।' তাতে তিনি মওলানাকে লক্ষ্য করে বলেছেন যে 'মওলানা, আমি তোমার কো-অপারেশন চাই। তোমাকে জেলেটেলে রাখতে হয়েছিল, তোমার কমফোর্টের জন্য। সে কারণে তোমাকে আমি ধানমন্ডির বাড়িতে রেখেছিলাম। তখন আমি তোমার বিবিকে অ্যালাও করেছি। সেই গোনার জন্য আমাকে মাফ-টাফ করে দাও। ওটা আমাকে বাধ্য হয়েই করতে হয়েছে। এবং আমি তোমার কো-অপারেশন চাই।'

চিঠিটা আমার কাছে দিয়ে একটা প্যাডের নিচে সই করে দিয়ে বললেন, 'এর উত্তর তুমি দিয়ে দাও।'

আমি বললাম, আমি কী করে উত্তর দেব? চিঠিটা তো আপনার? আমি কী করে উত্তর দিই?

বললেন, 'না, তুমি একটা উত্তর লিখে দাও।' বললাম, মওলানা সাহেব, আমি শুনেছি আপনি অতীতে এ রকম করেছেন কিন্তু আমি তো এটা করতে পারব না। আমি এ রকম কিছুতেই বিশ্বাস করি না। আপনার চিঠি আপনাকেই লিখতে হবে। তবে হ্যাঁ, আপনি বাংলায় আপনার বক্তব্য বলেন, আমি এটাকে ইংরেজিতে অনুবাদ করে আপনাকে এনে দেব। তারপর আপনি শুনে সই করবেন। তাঁর সঙ্গে আলোচনা করলাম।

আলোচনা করলে তিনি বললেন, 'লিখে দাও যে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন ছাড়া আপনার সঙ্গে কোনো সহযোগিতা আমি করতে পারি না।'

আমি বললাম, ঠিক আছে।

তারপর তিনি আরও লোকাল কিছু পয়েন্টস বললেন। আমি পরের দিন তাঁর বলা পয়েন্টগুলো লিখে তাঁর কাছে নিয়ে যাই। তখন তিনি তাতে সই করে দেন। জবাবি চিঠিতে লেখা ছিল যে 'প্রভিন্সিয়াল অটোনমি যতক্ষণ তুমি না দিচ্ছো, ততক্ষণ পর্যন্ত আমি তোমাকে কোনো ধরনের সহযোগিতা করতে পারি না।'

মওলানা সাহেবের একটা বড় সংসার ছিল। স্ত্রী-পুত্র নিয়ে তাঁর যে সংসার, তার ব্যয় নির্বাহ করা হতো কীভাবে, সেটা আমি জানতাম না। বলতেও পারব না।

তবে এটুকু আমি দেখেছি যে পাঁচবিবিতে মাঠের মধ্যে তাঁর যে একটা বাড়ি ছিল, তার সামনেই তাঁর স্ত্রী, পাঁচবিবিতেই যিনি থাকতেন, তাঁর বাবার একটা বেশ দালানকোঠাওয়ালা বাড়ি ছিল। তাঁরা নাকি তাঁর ওই বউয়ের জিম্মাদারিতে ওই জমিজিরাতগুলো তুলে দিয়েছিলেন। এগুলো থেকেই তাঁর সংসারের ব্যয় নির্বাহ করা হতো। আর তিনি সন্তোষে যে বাড়ি করেছিলেন, সেটা নয়, আরেকটা বাড়ি ছিল টাঙ্গাইলের বিন্যাবাড়িতে, সেখানে একটা জায়গা ছিল। পোড়াবাড়ী থেকে মাইল দুয়েক ভেতরের দিকে যেতে হতো। পোড়াবাড়ীতে গাড়ি রেখে আমি একবার গিয়েছিলাম। সেখানেও তাঁর স্ত্রীর কিছু জায়গাজমি ছিল।

তবে বড় ধরনের কোনো আর্থিক সহায়তা তিনি আমার কাছ থেকে নেননি। চানওনি কখনো। একজন রাজনৈতিক নেতা হিসেবে আমাকে যদি তিনি বলতেন, 'সিধু, আমাকে একটা করাচির টিকিট কিনে দাও', আমি কিনে দিতাম। কখনো ঈদের সময় বললেন, 'আমি তো এখন বাড়ি যাব, কী করে খালি হাতে যাই বলো তো?'

আমি বলতাম, ঠিক আছে। হয়তো তাঁর পরিবারের জন্য কিছু জামাকাপড় কিনে দিলাম। এই রকম অনেকেই করত।

তাঁর অনেক মুরিদ ছিলেন। তাঁরাও আসতেন নানা ধরনের নজরানা নিয়ে। তবে আমি নিজের চোখে তাঁকে নজরানা নিতে দেখিনি। তবে যখনই যেখানে মজলিশ হতো, সেখানে মুরিদরা আসতেন। চাল, ডাল ইত্যাদি সব নিয়ে তাঁরা আসতেন। কেউ টাকাকড়িও নিয়ে আসতেন। মজলিশে আসা মুরিদরা তাঁকে দুই-এক টাকা করে নজরানাও দিতেন। কেউ বা তাঁর কাছ থেকে পানি পড়া নিতেন, কেউ বা নিতেন তাবিজ।

আমি এসব কিছু নিয়ে একবার তাঁর সঙ্গে কথা বলেছিলাম। জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'আপনি এসব করেন কেন? তাবিজ, পানি পড়া দেন কেন?'

জবাবে মওলানা ভাসানী বলেছিলেন, 'তারা তো আমার কাছে একটা বিশ্বাস নিয়ে আসে। আমি যখন পানিটায় ফুঁ দিই, আল্লাহর কালাম পড়েই ফুঁ দিই। এই বিশ্বাসে হয়তো ওর কাজ হবে। কিন্তু আমি যদি পয়সাটা না নিই, তাহলে সে ভাববে যে হুজুর পয়সা নেন নাই, তাহলে এটা দিয়ে কোনো কাজ হবে না। মনে মনে সে বিশেষভাবে আঘাত পাবে। কাজেই আমি পয়সা নিই আর মুরিদদের কাছ থেকে নেওয়া এসব পয়সা তো বাবা আমি আমার নিজের জন্য ব্যবহার করি না। অন্য কারও কাজে আমি টাকাটা দিয়ে দিই।'

পীরগিরিতে তাঁর কোনো বিশ্বাস ছিল কি না, জানি না। তবে আমরা জিজ্ঞেস করলে এই কথাটাই বলতেন যে 'আমি তো আল্লাহ পাকের কালাম পড়ে ফুঁ দিলাম, ওর এখন যদি তাতে কাজ হয়, তাহলে হবে।' আমরা যাঁরা মওলানার পেছনে

সমবেত হয়েছিলাম, আমাদের মনেও এ রকমের একটা প্রশ্ন জাগত—আমরা যে রাজনৈতিক নেতার পেছনে সমবেত হয়ে কাজ করছি, যিনি কুসংস্কার বিশ্বাস করেন। সত্যি বলতে কি, বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টিতে আমরা মওলানার এ-জাতীয় কাজকর্মকে বিচার-বিশ্লেষণ করতে পারতাম না।

১৩. প্রসঙ্গ শেখ মুজিব

রাজনৈতিক সময়টা তখন—১৯৫৫-১৯৫৬ সাল, তার পরবর্তীকালে আওয়ামী লীগ থেকে বেরিয়ে এসে ন্যাপ তৈরি হলো, এ সময় পরিসরে শেখ মুজিবের সঙ্গে আমার কখনো কোনো ধরনের যোগাযোগ হয়েছে কি না, এ রকম প্রশ্নের জবাবে বলতে হবে, না, সে রকমভাবে কিছু হয়নি। আমি শুধু একটা কথা বলতে পারি, একদিন আমি নিজে উপযাজক হয়ে তাঁর কাছে গিয়েছিলাম। তখন তিনি শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী। তাঁর সম্পর্কে অনেক রকমের কথাবার্তা হচ্ছিল তখন। ফলে আমার নিজের কাছেই খুব খারাপ লেগেছিল। আমি একদিন তাঁর কাছে গিয়ে বলেছিলাম যে 'দেখো, তোমার সম্পর্কে তো নানা রকমের কথাবার্তা হচ্ছে।'

কথাটা শুনে আমাকে বললেন, 'মোখলেস ভাই, আমি কী করব?'

আমি বললাম, 'যদি তুমি আমার কথা শোনো তাহলে তুমি মন্ত্রিত্ব ছেড়ে দাও। পার্টির সচিব থাকো। মন্ত্রীর পদটা ছেড়ে দাও। দুটো পদ ধরে রাখায় তোমার সম্পর্কে অনেক রকমের কথা হচ্ছে।' কথাটা বলেছিলাম হাসতে হাসতেই। কিন্তু শেখ মুজিব সাত দিনের মধ্যেই মন্ত্রিত্ব ছেড়ে দিয়ে বেছে নিয়েছিলেন দলের অর্থাৎ আওয়ামী লীগের সচিবের পদ। ওই একটা দিনই আমি তাঁর কাছে গিয়েছিলাম। অবশ্য গিয়েছিলাম অন্যের একটা কাজে এবং তখন এই কথাটা তাঁকে বলেছিলাম। কথাটা তিনি রেখেছিলেন।

শেখ মুজিবের সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাৎ হয় গোপালগঞ্জে। আমি তখন দশম শ্রেণিতে পড়ি। আমার বেরিবেরি অসুখ হলে সেই অসুখে আমার অবস্থা খুব খারাপ হয়ে পড়েছিল। একটা নার্সিং টিম হয়েছিল। সেই নার্সিং টিমে শেখ মুজিব ছিলেন। আমি যখন মিশন স্কুলে, তিনি তখন টাউন স্কুলে সপ্তম শ্রেণিতে পড়তেন। আমি ওখানে পড়তে গিয়েছিলাম, আমার দুলাভাই আলী আহম্মদ সাহেব তখন ওখানে বদলি হয়েছিলেন বলে। তাঁর সঙ্গেই আমি গোপালগঞ্জে যাই। আমার দুলাভাই তখন সেকেন্ড অফিসার ছিলেন, মানে এসডিওর পরেই তাঁর স্থান ছিল। গোপালগঞ্জের যেসব ঘটনা আমার মনে পড়ে, সেগুলো বেশ ইন্টারেস্টিং। কারণ, মেদিনীপুর পর্যন্ত আমি হাফপ্যান্ট পরতাম। গোপালগঞ্জে এসে পারিবারিক ইনফ্লুয়েন্সে পড়ে আমাকে ধুতি পরতে হয়। হাফপ্যান্ট আমি পরতে পারি না দশম শ্রেণির ছাত্র বলে। ব্যাপারটা দৃষ্টিকটুও লাগে। সিনিয়র

মোস্ট স্টুডেন্ট হওয়ায় আমি এ সময় খুবই মানসিক সংশয়ের মধ্যে পড়ে গিয়েছিলাম। কারণ, গোপালগঞ্জে একটা জায়গা ছিল, যেখানে নমশূদ্র আর মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে সাংঘাতিকভাবে একটা উত্তেজনাকর অবস্থা বিরাজ করছিল। এই প্রথম এখানে আসার পর হিন্দু-মুসলমানের মধ্যকার এই উত্তেজনার ব্যাপারটা আমি দেখেছিলাম। এমন কিছু কিন্তু আমি মেদিনীপুরেও দেখিনি। এসব ঘটনা যখন ঘটছে, তখন আমি দশম শ্রেণিতে পড়ি। সালটা '৩৪-'৩৫ হবে। এখানে এসে তখন আমি পায়জামা পরা ধরলাম। অথচ আমার পরার কথা ছিল ধুতি। কিন্তু ধুতি পরার সাহসই আমি পেলাম না। আমাকে পায়জামা ধরতে হলো। আর এমনটা আমাকে করতে হলো ওই হিন্দু-মুসলমান টেনশনের জন্য। ওখানে ওয়াহিদুজ্জামান[১২] পায়জামা পরতেন কিন্তু শেখ মুজিব পরতেন লুঙ্গি। গোপালগঞ্জ শহরে কোনো ধরনের সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা না হলেও কোটালীপাড়া আর যেখানে যেখানে নমশূদ্র আর মুসলমানদের বসবাস ছিল, সেসব জায়গায় প্রায় প্রায়ই একটা দাঙ্গা লেগেই থাকত। এবং সেখানে বিভেদ ও বিভক্তি দিন দিনই বেড়ে যেতে থাকে।

অবশ্য দাঙ্গার কারণ সম্পর্কে আমি অতটা জানতাম না, বুঝতেও পারিনি। কিন্তু দাঙ্গা হচ্ছিল এবং সাংঘাতিকভাবে। মুসলমানেরা আমার দুলাভাইয়ের কাছে আসত। হিন্দুরা চলে যেত কে এল ব্যানার্জি বলে এফএসডিওর কাছে। সম্পূর্ণ সমাজটাই তখন স্পষ্ট দুভাগে বিভক্ত। আমাদের ওঠাবসা ইত্যাদি সবকিছুই ছিল ওই হিন্দু-মুসলমান অফিসার যারা ছিল, তাদের সঙ্গে। তাদের মধ্যে একটা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিদ্যমান ছিল। কিন্তু তার বাইরে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সদ্ভাব বলতে ছিলই না। মেদিনীপুরেও আমি এমন কিছু দেখিনি।

যা বলছিলাম, আমাদের সেবা-শুশ্রূষা করার জন্য যে টিম গঠন করা হয়েছিল, শেখ মুজিব সেই টিমের সঙ্গে ছিলেন। ফলে ওই বয়সে খুব কাছাকাছি থেকে আমি তাঁকে দেখার সুযোগ পেয়েছিলাম। সপ্তম শ্রেণির সেই ছাত্রের মধ্যে নেতৃত্বের কিছু লক্ষণ দেখতে পেয়েছিলাম। তিনি বেশ বলিষ্ঠভাবে কথাবার্তা বলতেন। আমাকেও তিনি একটু মান্য করতেন। কারণ, তখনকার দিনের সপ্তম শ্রেণির ছেলেরা দশম শ্রেণির ছেলেদের যেভাবে সম্মান করতেন, আমার ব্যাপারেও সেটা তিনি বরাবরই মেনে চলেছেন। এই সময় মুসলমান ছাত্রদের মধ্যে রাজনৈতিক কোনো ব্যাপারস্যাপার তেমন লক্ষ করা যায়নি। তবে ওই যে সাম্প্রদায়িক ব্যাপার, তার ঘূর্ণিপাকে পড়ে আমরাও প্রভাবিত হয়ে গিয়েছিলাম। মুজিব একটু বেশিই প্রভাবিত হয়েছিলেন। কারণ, ওর বাড়ি তো গোপালগঞ্জেই। তাঁর মধ্যে নেতৃত্বের গুণ ওই সময়ই দেখা গিয়েছিল। কেবল অসুস্থ আমাকে সেবা করাই না, আমার মতো হয়তো আরও দু-চারজনকে নিশ্চয়ই সেবা করতেন। তা না হলে আরও ছাত্র

থাকতে শেখ মুজিব আসবেন কেন আমাকে নার্সিং করতে! নিশ্চয়ই তাঁর এদিকে একটা প্রবল প্রবণতা ছিল।

ওই সব বয়সের ছেলেপেলেদের মধ্যেও নেতৃত্বের, সাংগঠনিক দক্ষতার যে একটা ব্যাপার আছে, সেটা লক্ষ করা যায়। অনেককে জড়ো করার মতো প্রবণতাও লক্ষ করা যায়! ফুটবল খেলা নিয়েই হোক বা একটা সেবামূলক কাজ নিয়েই হোক, শেখ মুজিবের মধ্যে এ রকম কিছু দেখা গিয়েছিল কি না, আমি বলতে পারব না। কেননা, আমরা দুজন দুই স্কুলে পড়তাম। আমি পড়তাম মিশন স্কুলে, মুজিব পড়তেন টাউন স্কুলে। কাজেই সেভাবে আমি তাঁর গুণাবলি সম্পর্কে জানি না কিন্তু আমার অসুস্থতার সময় তাঁর ওই সেবাকর্মের ব্যাপারে উদ্যোগ নিয়েছিলেন ওহিদুজ্জামান (ঠান্ডা মিয়া) এবং তিনিই শেখ মুজিব ও তাঁর সহযোগীদের জোগাড় করে এনেছিলেন।

চল্লিশের দশকে আমি কলকাতায়। শেখ মুজিবও তখন সেখানে। ইসলামিয়া কলেজে পড়তেন। তখনো তাঁকে আমি খুব ঘনিষ্ঠভাবে দেখার সুযোগ পাইনি। কারণ, তাঁরা ছিলেন সোহরাওয়ার্দী গ্রুপের সঙ্গে। আমরা ছিলাম ঢাকা গ্রুপের সঙ্গে। ঢাকা গ্রুপের নেতৃত্বে ছিলেন নাজিমুদ্দিন, শাহাবুদ্দিন, ফজলুর রহমান প্রমুখ। আর ওটা, শেখ মুজিবের গ্রুপটা হলো সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে। অল বেঙ্গল মুসলিম স্টুডেন্ট লীগ সোহরাওয়ার্দী গ্রুপের সঙ্গে বেশি সংযুক্ত ছিল। আমরা ঢাকাকেন্দ্রিক যাঁরা ছিলাম, তাঁরা অল বেঙ্গল মুসলিম স্টুডেন্টস লীগের মধ্যে ছিলাম না। ১৯৪২ পর্যন্ত আমি ছিলাম ঢাকায়। অল বেঙ্গল মুসলিম স্টুডেন্টস লীগ শেষ পর্যন্ত যাদের হাতে গিয়ে পড়ে, সেটা তো প্রো-মওলানা আকরম খাঁ অথবা প্রো-নাজিমুদ্দিনের লোকজনের হাতে, যেমন: আনোয়ার সাহেব, শাহ আজিজুর রহমানের[১৩] মতো লোকজনের নেতৃত্বে।

আনোয়ার অবশ্য শহীদ সাহেবের লোক ছিলেন আগাগোড়া। আর শাহ আজিজুর রহমান ওয়াজ নট এ ফ্যাক্টর ইন দ্য মুসলিম স্টুডেন্টস লীগ।

চল্লিশের দশকে শেখ মুজিবের ভূমিকা সম্পর্কে বলতে গেলে বলতে হয়, তাঁরা মুসলিম স্টুডেন্টস লীগ করতেন। কিন্তু ঢাকা থেকে যে ছাত্র আন্দোলন হতো সেটা ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। সম্পূর্ণ স্বাধীন। ঢাকাতেও স্টুডেন্টস মুসলিম লীগ ছিল বলে যে কথা বলা হয়, এখানে তার কোনো অস্তিত্ব ছিল না।

একটা ঢিলেঢালা প্রতিষ্ঠান ছিল। ছিল ঢাকা ইউনিভার্সিটি-কেন্দ্রিক একটা প্রতিষ্ঠান। এখানকার ছাত্র কারা কারা আমার সঙ্গে ছিলেন, সে কথা এখন আর মনে পড়ে না।

তবে আমাকে যে রাসটিকেট করা হয়েছিল কেন, সে সম্পর্কে একটু না বললেই নয়।

১৪. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাসটিকেট

১৯৪২ সালে আমাকে রাসটিকেট করা হয়েছিল। কেননা, আমি ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে ৩০-৪০ জন ছাত্র নিয়ে ফজলুল হক সাহেব যে শ্যামা-হক মন্ত্রিসভা গঠন করেছিলেন, তার বিরুদ্ধে আমরা একটা আন্দোলন গড়ে তুলেছিলাম। সেই আন্দোলনটা আমরা করি তখনকার ইস্টবেঙ্গল অর্থাৎ আজকের বাংলাদেশে। আমাকে শহীদ সাহেব তখন নর্থবেঙ্গলের দায়িত্ব দিয়েছিলেন সেখানে সবকিছু সংগঠিত করার জন্য। তারপর দু-দুটো উপনির্বাচন হলো। সেটাতে ফজলুল হক সাহেবের প্রার্থীর জামানত বাজেয়াপ্ত হয়ে গেল।

এসব কিছু হওয়ার পর ফজলুল হক সাহেব এখানে এলেন। ঢাকার নবাব তখন তাঁর সঙ্গে ছিলেন। তিনিই তাঁকে এখানে নিয়ে আসেন। আমরা ফুলবাড়িয়া রেলস্টেশনে তাঁকে কালো পতাকা দেখাই এবং মার খাই। শহীদুল্লাহ সাহেব তখন ফজলুল হক হলের প্রভোস্ট। তিনি সাতজন ছাত্র নিয়ে স্টেশনে তাঁকে অভ্যর্থনা জানাতে গিয়েছিলেন। আমি তখন ফজলুল হক হলে থাকি। ওইখানে সংসদীয় ব্যবস্থা ছিল। আমি তখন প্রিমিয়ার। আমাদের সমর্থকেরা মিলে ঠিক করল, যে সাতজন ফজলুল হক সাহেবকে অভ্যর্থনা জানাতে গেছে, তাদের মার দিতে হবে।

আমি বললাম, 'ভাই, আমি কী করে এর মধ্যে সক্রিয়ভাবে থাকি!' আরও বলি, 'আমরা মার খেলাম, যারা আমাদের মার দিল, তাদের আমরা এই বলে বোঝাব, শহরের মধ্যে চলো, মাথায় পট্টিটট্টি বাঁধা আছে, চলো চাখানায় গিয়ে বসি।' তাদের এভাবে প্রভাবিত করি। কিন্তু তাদের বিরুদ্ধে কোনো কিছু করার ব্যাপারে অর্থাৎ মারপিট-টারপিট করার ব্যাপারে আমি রাজি ছিলাম না। কিন্তু আমার দলের স্বার্থে আমি বললাম, 'আমি ডাইনিং হলে বসে বাতি বন্ধ করার সঙ্গে সঙ্গে যা করার তোমরা কোরো।'

ফজলুল হক হল তখন ছিল মেডিকেল বিল্ডিংয়ের নিচে। ওখানে বেশ ভালোমতোই হামলা চালানো হয়েছিল। তার মধ্যে এ কে নাজমুল করিমের বিছানাপত্র ফেলে দেওয়া হয়েছিল। মানে সাতজন যারা ছিল, তাদের বিছানাপত্র ইত্যাদি পুড়িয়ে ফেলা হয়েছিল।

এসব কিছুর জন্য আমাকেই দায়ী করা হলো। আমি এমএ সেকেন্ড পার্ট দিচ্ছিলাম, তার কয়েক দিন আগে আমাকে রাসটিকেট করা হলো। শেষ পর্যন্ত অবশ্য ওটা তুলে নেওয়া হয়েছিল। রাসটিকেট তুলে নেওয়ার পর ঢাকা ইউনিভার্সিটি আমাকে নিয়োগ দেয়। অ্যাডভাইজরি ব্যুরোর একটা খণ্ডকালীন চাকরি দেয়। তাতে করে আমার একটা সুবিধা হলো যে আমি ওটাও করতাম, পাশাপাশি মুসলিম লীগও করতাম। তবে ঢাকায় নয়, কলকাতায় বসে। ১২ নম্বর ডালহৌসি স্কয়ারে আমার এক কামরার একটা অফিস ছিল, সেখানে একজন ক্লার্ক, একজন টাইপিস্ট এবং একজন পিয়ন ছিল।

১৯৪২ সালের যে ঘটনা ইউনিভার্সিটির ফজলুল হক হলে ঘটছে, শ্যামা-হক মন্ত্রণালয়ের বিরুদ্ধে, সেই সময় শহীদুল্লাহ সাহেব ছিলেন প্রভোস্ট। শহীদুল্লাহ সাহেবের বিরুদ্ধে তখন মামলা হয়েছিল। আমরা তো মেইন সুইচটা অফ করে দিয়েছিলাম। সুতরাং শহীদুল্লাহ সাহেব ওই কোনার বাড়িতে থাকতেন, যেটাকে তখনকার দিনে চামেলী হাউস বলা হতো। ঘটনা সামাল দিতে উনি আর কাজী মোতাহার হোসেন[১৪] সাহেব দুজনেই ছুটে আসেন। শহীদুল্লাহ সাহেব সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠতে থাকেন। তার হাতে একটা টর্চ ছিল। তিনি সেটা জ্বেলে সবার মুখে মারতে শুরু করেন। ছেলেদের শনাক্ত করার জন্য। এই অবস্থায় একটি ছেলে করল কি, তাঁর হাতে আঘাত করে টর্চটা ফেলে দিল। তারপর শহীদুল্লাহ সাহেবকে নিয়ে একটা ঠেলাঠেলির মতো ঘটনা ঘটে। ফলে সিঁড়ি দিয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে তিনি নিচের দিকে পড়ে যান। আমি তাঁকে টেনে ধরে তুলি। যদিও আমি ওই ঠেলাঠেলির মধ্যে ছিলাম না। আমি বলতে পারব না তিনি কিসের জন্য হক সাহেবের পক্ষ নিয়েছিলেন।

১৫. চট্টগ্রামে ব্যবসা জীবন

১৯৪৮ সালে আমি চট্টগ্রামে গিয়ে আমার ব্যবসায়িক জীবন শুরু করি। কীভাবে আমি দেশের রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হলাম, কীভাবে তখনকার রাজনীতিকে প্রভাবিত করলাম, সে কথা বলতে গেলে আমাকে চট্টগ্রামের সেই সময়কার ব্যবসার পরিবেশ সম্পর্কে বলতে হবে। আমি নিজে ব্যবসায়ী হয়ে গেছি হঠাৎ করে। ব্যবসায়ী হওয়ার আমার কোনো দিন কোনো পরিকল্পনা ছিল না। আমার পরিকল্পনা ছিল আমি রাজনীতি করব। কিন্তু সেখানটায় একরকম গোলমাল হয়ে যাওয়ার পর আমি একটা সরকারি চাকরি নিতে বাধ্য হই। আর সেই চাকরিই আমাকে চট্টগ্রামে নিয়ে যেতে বাধ্য করেছিল। তবে সেখানে চাকরিবাকরি করার যে পরিবেশ ছিল, তার সঙ্গে আমি খাপ খাইয়ে নিতে পারছিলাম না। ফলে ১৯৪৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে চাকরি ছেড়ে দিই। চাকরি ছেড়ে দেওয়ার সময় আমার হাত একেবারেই শূন্য ছিল। কোনো ধরনের টাকাপয়সা ছিল না। চাকরি করা অবস্থায় কিছু লোককে আমি কিছু সাহায্য করেছিলাম। আমি পদত্যাগ করতে গেলে আমার সহকর্মীরা এসে আমাকে পদত্যাগপত্র তুলে নেওয়ার জন্য চাপ দিতে লাগল।

আমি বললাম, 'আমি তো চাকরি করতে পারব না। কারণ, আপনাদের সঙ্গে আমার বনিবনাই হচ্ছে না। ফলে আমার মনে হয়, আপনাদের সঙ্গে আমার একটা গোলমাল সব সময় লেগেই থাকবে, তাই আমি স্বাধীনভাবে কিছু করতে চাই।' এই খবর শুনে আমার যাঁরা সাহচর্যে ছিলেন, বন্ধুবান্ধব যাঁরা ছিলেন, তাঁদের সবাই

ছুটে এলেন। তার মধ্যে একজন লোক, যাঁকে আমি শাহাবুদ্দিন সাহেবকে বলে পেপার কন্ট্রোলের ইন্সপেক্টর করেছিলাম, সেই তিনি পেপার কন্ট্রোলের অফিস চট্টগ্রামে এসে হয়ে গেলেন সিনিয়র মোস্টম্যান। তাঁর নাম ছিল শামসুদ্দিন। ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে তিনি আমার জুনিয়র ছিলেন। শামসুদ্দিন এসে বললেন, 'ভাই, আপনি কী করবেন?'

আমি বললাম, 'আমি তো জানি না।'

বললেন, 'আপনি যদি কাগজ আমদানি করেন, তাহলে আমি আপনাকে সাহায্য করতে পারি।'

আমি বললাম, 'আমি তো আমদানি-টামদানির কিছুই জানি না, বুঝি না।'

এ কথা শোনার পর তিনি বললেন, 'আপনাকে কিছুই করতে হবে না। আপনি কেবল একটা ফার্মের নাম বলেন।'

আমি বললাম, 'তাহলে তো একটু চিন্তা করতে হবে।' তাঁরাই কয়েকজন মিলে আমার ফার্মের নাম ঠিক করেছিলেন 'ওভারসিজ ট্রেডার্স'। বললেন, এই প্রতিষ্ঠানের নামে কিছু কাগজপত্র, প্যাড ইত্যাদি ছাপতে হবে। সেগুলো জমাটমা দিয়ে এলসি খুলতে হবে।

আমি বললাম, 'এসব আনুষ্ঠানিকতারও আমি কিছুই জানি না।'

তখন তিনি বললেন, 'কোনো ব্যাংকের কারও সঙ্গে কি আপনার জানাশোনা আছে?'

সেন্ট্রাল ব্যাংক অব ইন্ডিয়ার এক পার্মি ভদ্রলোক ছিলেন। তাঁর নাম ভ্যাসানিয়া। তিনি আমাদের সঙ্গে ব্রিজ খেলতেন। সব শুনে ভ্যাসানিয়া বললেন, 'তোমার টাকাপয়সা কত আছে?' আমি বললাম, 'তোমার ওখানেই তো অ্যাকাউন্ট। দেখে নিয়ো।' মাত্র ৬০০ টাকার মতো ছিল আমার ওই ব্যাংক অ্যাকাউন্টে।

তিনি বললেন, 'এই টাকার বিপরীতে তো আর এলসি খোলা যাবে না। তবে এক কাজ করি, তোমাকে আমি নিল মার্জিনে এলসি খুলে দিচ্ছি।' তারপর তিনি নিল মার্জিনে এলসি খুলে দিলেন এবং বললেন, 'দলিল-পত্র সব আমার কাছে আসবে। তুমি আমাকে না জানিয়ে কিছু করতে পারবে না।' আমি সবকিছুতেই রাজি হলাম। মাস খানেকের মধ্যেই অর্থাৎ কনসাইনমেন্টশিপ করার এক মাসের মধ্যেই এই ১০ হাজার টাকার কনসাইনমেন্টে আসা কাগজই বিক্রি হলো সাড়ে সাত হাজার টাকা লাভে। আমি ব্যবসায়ী হয়ে গেলাম। এবং এটা শুধু আমার বেলাতেই নয়, যাঁরা তখন ব্যবসা করতেন, এই কাগজই তিন থেকে চার হাত ঘুরত। আর আমার কিছুই ব্যাকগ্রাউন্ড ছিল না। আমার চেয়েও যাঁদের একটু বেটার সংযোগ ছিল, তাঁরা আমার চেয়েও বড় ব্যবসায়ী হয়ে গেলেন। এবং

ইন্ডিয়াতে যাঁরা ব্যবসায়ী ছিলেন এবং যাঁরা সেখান থেকে এখানে এসেছেন কিংবা ওয়েস্ট পাকিস্তানে চলে গিয়েছিলেন, তাঁরা আমাদের চেয়ে আরও অনেক বড় ব্যবসায়ী হয়ে গেলেন এবং সেই পিরিয়ডটা এমনই ছিল যে তখন লাইসেন্স-পারমিটের কোনো প্রয়োজন ছিল না। কেবল জানতে হতো যে কী জিনিস আমদানি করবেন, কী জিনিস বাজারে চলবে, কোথা থেকে তা পাবেন এবং ব্যাংকের সঙ্গে আপনার কতটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং থাকা দরকার ইত্যাদি। সুযোগ-সুবিধার দরজা ছিল অবারিত। বিশেষ করে, কতগুলো আইটেমের ব্যাপারে। যেমন: কাপড়, সুতা এসব কিছু ছিল জেনারেল আইটেম। এগুলো আমদানি করে মানুষ অজস্র পয়সা করে এবং এই যে ট্রেন্ডটা বন্ধ হয়ে গেল। কাজেই যেসব বাঙালি অপরিণামদর্শী আমদানিকারক ছিলেন, মানে যাঁরা এখান থেকে কিছুই সঞ্চয় করেননি, ভেবেছিলেন, এ রকমই চলবে, তাঁরা ভয়ানকভাবে ধাক্কা খেলেন।

চট্টগ্রামে একটা ঘটনা ঘটেছিল এ রকমেরই। সদরঘাট রোডে। একটা হেয়ার কাটিং সেলুনকে পাঁচ হাজার টাকা সেলামি দিয়ে তাকে পরিণত করা হয়েছিল একটা ইমপোর্ট-এক্সপোর্টের ফার্মে। ভাবুন, ইভেন এ হেয়ার কাটিং সেলুন ওয়াজ কনভার্টেড ইনটু এ ফার্ম। এভাবে চলছিল। আর ঠিক যখন স্লাপটা এল, তখন ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে ওঠা বেশির ভাগ ইমপোর্টের ব্যবসা থেকে পাততাড়ি গুটিয়ে চলে গেল। শুধু যে ইমপোর্টার হিসেবে সুবিধা ছিল, তা-ই নয়, এই যে বড় বড় অবাঙালি ইমপোর্টার, তাঁদের কাছ থেকেও মাল কিনে দুই হাত তিন হাত করে বিক্রি করে অনেকে বিস্তর টাকাকড়ি করেছিলেন। কিন্তু যখন এই স্লাপটা এল, তখন এসব বাঙালি ব্যবসায়ীর শতকরা ৫০ ভাগ ব্যবসা ছেড়ে চলে গেলেন। এবং এই যে উদ্বৃত্ত পুঁজিটা, এই যে কাপড় আর সুতার ব্যবসা করে জমে ওঠা উদ্বৃত্ত পুঁজিটা ১৯৪৭ সালের দেশভাগের পর তাঁরা নিয়ে গেলেন তখনকার পশ্চিম পাকিস্তানে। যখনই এই ওজিএলটা বন্ধ হয়ে গেল, তখন দুটো ব্যাপার ঘটল। ওজিএলের পারফরম্যান্সের ওপর একটা হাফ ইয়ার্লি কোটা দেওয়া হতো। যেখানে আমি কাগজ আমদানি করতাম এক বছরে পাঁচ লাখ টাকার কাগজ, আমার অর্ধবছরের কোটা হলো আড়াই লাখ টাকা। আড়াই লাখ টাকার কাগজ আমি আমদানি করতে পারতাম। তেমনি কাপড় আর সুতার বেলায়ও ওই রকম ব্যাপার ঘটল। তাঁদের কাছে যে উদ্বৃত্ত পুঁজিটা ছিল, সেটা তাঁরা বিনিয়োগ করলেন গিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানের কাপড়ের মিলে। এভাবে সেখানে ১০টা কাপড়ের মিল একই সঙ্গে দাঁড়িয়ে গেল। আমাদের এখানে আমরা অত বড় স্কেলে ব্যবসা করতে পারিনি। ব্যবসা করলেও আমরা পেছনের দিকটা ভাবিনি। ভাবলাম এ রকমই চলবে। যা-ই ব্যবসা হয়েছে, গাড়ি-বাড়ি করে সব শেষ করে দিয়েছেন এবং এর ফায়দা নিতে পারেননি। এই গেল একটা দিক এবং দ্বিতীয় দিক যেটা সেটা হলো

যে পাকিস্তানের অর্থ মন্ত্রণালয় হঠাৎ করেই একটা অদ্ভুত রকমের আদেশ জারি করে দিল। ফলে আমাদের স্থানীয় পুঁজি যেটা ছিল, আমি জানি চাটগাঁয়ে বহু লোকের হাতে অনেক পয়সা ছিল, কিন্তু তাঁরা লগ্নি করতে পারতেন না এবং এটা নিয়ে আমরা অনেক দেনদরবারও করেছি। কেন লগ্নি করতে পারলেন না? কারণ, অর্থ মন্ত্রণালয় এই বলে একটা আদেশ জারি করল যে যদি কোনো পুঁজিকে প্রমাণ করা যায় যে এটা উদ্বাস্তু পুঁজি, তাহলে তার জন্য কোনো ধরনের জবাবদিহি করতে হবে না। এই আদেশের অর্থ হলো এই পুঁজিটা তুমি কোথা থেকে পেলে? আর যদি এটা উদ্বাস্তু পুঁজি হিসেবে প্রমাণিত না হয়, তাহলে বুঝতে হব যে সে অতীতে কর ফাঁকি দিয়ে এই পুঁজি গড়ে তুলেছে এবং এ জন্য অ্যাট সোর্স ফরটি পারসেন্ট কেটে নেওয়া হবে। যে ক্যাপিটালটা সে প্রদর্শন করবে তার শতকরা ৪০ ভাগ অ্যাট সোর্স কেটে নিয়ে তার ওপর যে আয়, সেটার ওপর কর বসানো হবে। এটা একটা সাংঘাতিক ধরনের বাধা ছিল। কারণ, চাটগাঁয়ের বহু লোকের হাতে বহু পয়সা ছিল, কিন্তু কেউ সে টাকা বের করতে পারেনি। এই একই লোক চাটগাঁয়ের হাতি কোম্পানি আর কলকাতার আমীন এজেন্সির মালপত্রের ব্ল্যাক করেছে। কিন্তু হাজি কোম্পানি যেহেতু ইস্ট পাকিস্তানের এবং হাতি কোম্পানি চিটাগাংয়ের, তাই তারা কলকাতার ব্ল্যাকের টাকাকে হোয়াইট করতে পারছে না, কিন্তু আমীন এজেন্সি পারছে। কারণ, সে বলছে তারটা রিফিউজি ক্যাপিটাল। এই যে একটা বৈষম্য, এটাই একটা সাংঘাতিক প্রতিবন্ধকতা হিসেবে দাঁড়িয়ে গেল। এ জন্যই চট্টগ্রামের বহু লোকের হাতে বহু টাকাপয়সা থাকলেও সেটা তাঁরা ব্যবসায় খাটানোর সুযোগ না পেয়ে আজেবাজে পথে খরচ করে উড়িয়ে দিলেন এবং এটা নিয়ে বহু রকমের দেনদরবারও করা হয়েছে। এমনকি ফজলুর রহমান সাহেবসহ অন্যান্য মন্ত্রীকেও এ ব্যাপারে বলা হলেও কেউ কিছু করতে পারেননি। বস্তুত বড় ব্যবসায়ে যাঁরা এলেন, পাট বা কাপড়ের ব্যবসায়, তাঁরা রাজনীতির সঙ্গে কীভাবে যুক্ত হয়ে গেলেন, সে ব্যাপারে কথা বলতে গেলে, একটু ব্যাখ্যা না দিলেই নয়।

১৬. স্থানীয় ব্যবসায়ীদের রাজনীতির সঙ্গে যোগাযোগ

পাকিস্তানের যে রাজনীতিটা, আমার মতে সেটা ডিফেন্স কন্ট্রাক্ট গ্রুপ কন্ট্রোল করত। মানে মিলিটারি কন্ট্রাক্টে যারা ছিল, তাদের দিয়ে, বিশেষ করে আমেরিকা এসে পাকিস্তানের কাঁধে ভর করার পর থেকে ওখানে, মানে তখনকার পশ্চিম পাকিস্তানে, একটা সাংঘাতিক গ্রুপ দাঁড়িয়ে গেল, যারা ডিফেন্স কন্ট্রাক্টের সঙ্গে জড়িত ছিল এবং যখনই আমেরিকা একটা মিলিটারি এইড দেয়, সঙ্গে সঙ্গে সে ইকোনমিক এইডও দিতে শুরু করে অর্থাৎ একটা তাঁবেদার শ্রেণি ব্যবসায়ীদের মধ্যে সৃষ্টি করে। এটা পশ্চিম পাকিস্তান তথা পাকিস্তানভিত্তিক ছিল। তাদের সঙ্গে

যুক্ত ছিল এখনকার গ্রুপ দ্য জুট গ্রুপ ইন ইস্ট পাকিস্তান। এরা ডিসাইড করত এখানকার পলিসি। আমার নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে এ কথা আমি বলতে পারি। কারণ, তখনকার দিনের আমীন এজেন্সির আবদুল জলিল নামের যে কর্মকর্তা ছিল, সে ছিল আমার খুব বিশিষ্ট বন্ধু। খুব অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিল। তাকে আমি দেখেছি কীভাবে সে সবকিছু ম্যানিপুলেট করত। তার কাছ থেকে অনেক কিছু শুনেছি। তারা এখানে গভর্নর চেঞ্জ করত, তারা শেখ মুজিবকে রিলিজ দেওয়া হবে কি না, এমন ব্যাপারেও সিদ্ধান্ত নিত এবং শেষ পর্যন্ত এটুকু বলতে চাই যে মওলানা ভাসানীর একটা জিনিসের জন্যই তারা খুব হতাশা বোধ করেছে। বিশেষ করে, মওলানা ভাসানী যখন জ্বালাও-পোড়াও এসব আরম্ভ করলেন, তখন। এই গোষ্ঠীটা তখন খুবই হতাশ হয়ে গেল। আসলে তারা আওয়ামী লীগকে পছন্দ করত না কিন্তু যেহেতু মুসলিম লীগের কোনো অলটারনেটিভ তারা খুঁজে পাচ্ছিল না, সেই জায়গায় তারা মওলানা ভাসানীকে দাঁড় করিয়ে তাঁকে সাপোর্ট করতে চাচ্ছিল। আর সেটা তারা করছিল মওলানার জনসমর্থনের জন্য। কিন্তু তারা মওলানাকে বাগে আনতে পারছিল না। মওলানার 'জ্বালাও-পোড়াও' আন্দোলনে তারা ভীত-শঙ্কিত হয়ে পড়ে। এসবই আটষট্টি-উনসত্তর সালের দিকের ঘটনা।

কাজেই তারা অনিচ্ছুকভাবে শেখ মুজিবুরের সঙ্গে বোঝাপড়া করল এবং একটা ঘটনা এখানে বলছি যে মসিউর রহমান (যাদু মিয়া) এবার রাওয়ালপিন্ডি থেকে ফ্লাই করে এল। আমার বাসায় এসে আমাকে বলল, 'আমি খুব একটা জরুরি কাজে এসেছি। আমাকে একটা নাম বলেন, যিনি পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর হতে পারবেন।'

আমি বলি, 'এটা কী রকমের কথা। তুমি চায়ের টেবিলে বসে আমাকে ইস্ট পাকিস্তানের গভর্নর নমিনেট করতে বলছ!'

বলল, 'না, ব্যাপারটা ভীষণ জরুরি। আজকে রাতেই আমাকে ফিরে যেতে হবে।'

আমি বললাম, 'ব্যাপারটা কী বলো তো?'

তখন ইতিমধ্যেই আইয়ুবকে সরিয়ে ইয়াহিয়া খান ক্ষমতায় এসে গেছেন এবং ইয়াহিয়ার জন্য ওই একই জিনিস অর্থাৎ তাঁর সমর্থন দরকার। মওলানা ভাসানীকে এ ব্যাপারে অ্যাপ্রোচও করা হয়েছে। মওলানা ভাসানী বলেছেন, যাদু মিয়ার সঙ্গে কথা বলো। যাদু মিয়া এই বলে শর্ত দিয়েছেন যে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর যদি আমাদের কথামতো নমিনি করো, তাহলে তোমাকে সমর্থন দেব। অর্থাৎ পরবর্তী নির্বাচনের পর তাহলে তাদের সুবিধা হবে।

আমি যাদু মিয়াকে বললাম যে, 'আমি তো এত তাড়াতাড়ি কিছু বলতে পারব না। তুমি এক দিন পেছাও। আমি একটু চিন্তাভাবনা করি।' অনেক চিন্তাভাবনা

করে আমার একজন পুরোনো বন্ধুর কথা মনে হলো। যাদু মিয়া বলল যে 'এমন লোক দেবেন, যার ওপর আপনার কর্তৃত্ব থাকবে। আপনার কথা শুনবে।' আমি অনেক ভাবনাচিন্তা ও তত্ত্বতালাশ করার পর দেখলাম খাজা মোহাম্মদ কায়সারকে মনোনয়ন দেওয়া যায়। সে তখন চীনে অ্যাম্বাসেডর।

নামটা বলার পর যাদু মিয়া খুব খুশি হলো। খাজা কায়সার[১৫] হলে তো আমাদের রাজনৈতিক লাইনও ঠিক থাকছে। খাজা কায়সারের তখন অ্যাপয়েন্টমেন্ট হওয়ার কথা ছিল ডিফেন্স সেক্রেটারি হিসেবে। সুতরাং তিনি গ্রহণযোগ্য ছিলেন এবং তিনি কথিত জুট গ্রুপের কাছে বেশ পরিচিত ছিলেন।

আবদুল জলিলের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব ছিল। এসব কিছু আমি জানতাম। সুতরাং খাজা কায়সার ওয়াজ ইমিডিয়েটলি অ্যাকসেপ্টেড। যাদু মিয়া এখান থেকে টেলিফোন করে তাঁর নাম পেশ করল এবং তাঁরা জানালেন যে হি ইজ অ্যাকসেপ্টেবল টু আস।

তবু আমি যাদু মিয়াকে বললাম, 'তুমি ওখান থেকে কনফার্ম করার পর আমি পিকিং যাব।'

এই জুট গ্রুপের প্রভাবে ইয়াহিয়া তাঁর মাইন্ড চেঞ্জ করে ফেললেন এবং খাজা কায়সারকে না নিয়ে তাঁরা নিলেন অ্যাডমিরাল আহসানকে। অ্যাডমিরাল আহসানের ছিল আদমজীদের সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠতা। আদমজীরাই তখন তো জুট গ্রুপটাকে লিড করত। তাই শেষ পর্যন্ত খাজা কায়সার না হয়ে অ্যাডমিরাল আহসান তখনকার পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর হলেন।

মওলানা ভাসানী এবং ন্যাপকে তারা শেষ পর্যন্ত পছন্দ করল না। বরং মওলানা ভাসানীর 'জ্বালাও-পোড়াও' নীতির জন্য তারা তাঁকে রীতিমতো ভয় করতে শুরু করল।

যাদু মিয়া ফিরে যাওয়ার আগেই শুনল যে অ্যাডমিরাল আহসানকে অ্যাপয়েন্ট করা হয়েছে। তখন সে তো খুব রেগেমেগে অস্থির। পাঞ্জাবের তোবাটেকসিংয়ে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় সে ইয়াহিয়ার চৌদ্দপুরুষ উদ্ধার করে ছাড়ল। যাচ্ছেতাই বলে তাঁকে গালাগাল করল। তাঁকে অভিহিত করল বিশ্বাসঘাতক বলে। কথা দিয়ে কথা রাখেননি—এ রকমের কথাবার্তা বলল প্রকাশ্য জনসভায়। এ জন্য যাদু মিয়াকে অনেক দিন গ্রেপ্তার করে রাখা হয়েছিল।

এই যে জুট গ্রুপের কথা বললাম, এই গ্রুপটাই প্রধানত আমাদের পূর্ব পাকিস্তানের নীতি ইত্যাদি নির্ধারণ করত। শুধু তা-ই নয়, তারা সরকারের কাছ থেকে সব রকমের সুযোগ-সুবিধা ইত্যাদি আদায় করে নিত এবং তাদের ওখানে মিল-ফ্যাক্টরিতে যখন স্ট্রাইক-ফাইক হতো, তখন মিলিটারি এবং পুলিশ বাহিনী সব রকমভাবে ব্যবহার করে তারা এগুলোকে দমন করত। অ্যান্ড দ্যাট ওয়াজ দ্য

রিজন যে এরা খুব একটা ডিটারমাইন্ড গ্রুপ হিসেবে এখানে এসেছিল, তারা সরকারের স্বার্থই রক্ষা করত। এ ধরনের দু-একটা উদাহরণ তুলে ধরা যায়। যেমন এই জুট গ্রুপই জাকির হোসেনকে সরায়। এই জুট গ্রুপই শেখ মুজিবকে রিলিজ করায়, বিশেষ করে, ষাটের দশকের শুরুর দিকে।

আবদুল জলিলের সঙ্গে যে আমার খুব ঘনিষ্ঠতা ছিল সে কথা আগেই বলেছি। একদিন হঠাৎ করে দেখি যে সে আর আমি দুজনেই ট্রেনে যাচ্ছি এবং একই কম্পার্টমেন্টের যাত্রী। আমীন জুট মিলের আবদুল জলিল। তারা এতটাই প্রভাবশালী ছিল যে প্রথম দিকে তারা ইস্টবেঙ্গল রেলওয়েকে ফাইন্যান্স করত। রেলের পরিচালনা সম্পৃক্ত যাবতীয় খরচাপাতির পুরো টাকাটাই তারা দিত। যে টিকিট বিক্রি হতো সেই টিকিটের টাকা থেকে তারা তাদের বিনিয়োগ করা টাকাটা কালেক্ট করত। ফলে তাদের সাংঘাতিক প্রভাব ছিল। তাদের ক্ষমতার প্রধান খুঁটি ছিল অর্থ মন্ত্রণালয়। এই গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে গভীর সম্পর্ক থাকায় তারা সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করত। একমাত্র পাঞ্জাবিরা ছাড়া এই অর্থ মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের সুযোগ বাঙালিরা কোনো দিনও পায়নি। এই শক্তির বলে তারা সামগ্রিক রাজনীতিটা নিয়ন্ত্রণ করত। জলিল অ্যান্ড দি আমীন গ্রুপ দে হ্যাভ দ্যাট ইন্টিমেসি উইথ দ্য ফাইন্যান্স মিনিস্ট্রি। তো যা বলছিলাম, দুজনে মিলে তো আমরা আসছি অর্থাৎ আমি আর আমীন জুট মিলের আবদুল জলিল। আমি জানতাম যে জাকির হোসেন তার বন্ধু। জাকির হোসেনের সঙ্গে আমাদেরও একটু আত্মীয়তা হয়েছিল। আলী আহম্মদ সাহেবের এক মেয়ের সঙ্গে জাকির হোসেনের ভাগনের বিয়ে হয়। সেই সূত্রে তার সঙ্গে আমাদেরও খুব অন্তরঙ্গতা ছিল। সেদিন ট্রেনে দেখা হতেই আবদুল জলিল জাকির হোসেনের বিরুদ্ধে কথা বলতে আরম্ভ করল।

আমি বললাম, 'কী ব্যাপার, হঠাৎ তোমার বন্ধুর বিরুদ্ধে কথা বলতে শুরু করলে!'

জলিল বলতে লাগল, 'নো, হি ক্যানট ডেলিভার দ্য গুডস।'

আমি বললাম, 'অসুবিধাটা কোথায়?'

বলল, 'না, শেখ মুজিবকে সে ম্যানেজ করতে পারছে না।'

আমি প্রশ্ন করলাম, 'হঠাৎ তোমাদের শেখ মুজিবের প্রতি নজর পড়ল কেন? আমরা তো দেখছি না পূর্ব পাকিস্তানকে নিয়ন্ত্রণ করার মতো আর কেউ আছে?'

'আর কে আছে ইস্ট পাকিস্তানকে নিয়ন্ত্রণ করবে! আমরা কোনো বিকল্প খুঁজে পাচ্ছি না।'

আমি ওকে আর কিছু বলিনি। আমার দুই-একজন যাঁরা বন্ধুবান্ধব ছিলেন, তাঁদের বললাম যে আপনারা কয়েক দিনের মধ্যেই দেখবেন যে জাকির হোসেনকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং শেখ মুজিব মুক্তি পাচ্ছেন এবং কয়েক দিন পর সত্যি সত্যিই জাকির হোসেনকে সরিয়ে দেওয়া হয় এবং শেখ মুজিবকে জেল থেকে

মুক্তি দেওয়া হয়। জাকির হোসেনের পরে গভর্নর হন মোনেম খান।

১৭. বায়ান্নর একুশে ফেব্রুয়ারির ঘটনা

১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি যা কিছু ঘটেছিল, আমি নিজের চোখে যেটুকু দেখেছিলাম, এখানে তার বিবরণ :

সেদিন আমি সকালবেলা আমার নবাবপুরের অফিসে গিয়েছিলাম। সেখানে যাওয়ার পর শুনলাম ইউনিভার্সিটিতে গোলমাল হচ্ছে। ইউনিভার্সিটিতে ছাত্রাবস্থায় ছাত্ররাজনীতির সঙ্গে যেহেতু খুবই জড়িত ছিলাম, গোলমাল হচ্ছে শুনে আমি সেখানে চলে যাই। মেডিকেল কলেজের সেকেন্ড গেটটা যেখানে, সেখানে গিয়ে দেখলাম ছেলেপেলেরা সব শুয়ে পড়ে পিকেটিং করছে। আর এসপি ইদ্রিস সাহেবকে দেখলাম।

সকাল সাড়ে নয়টা কি দশটা এই রকম সময় হবে। এসবই গুলি হওয়ার আগেকার ঘটনা। গোলমাল হচ্ছে শুনে আমি ওখান থেকে চলে এলাম। এসে দেখলাম ওই গাছগুলোর নিচে জাতীয় অধ্যাপক আব্দুর রাজ্জাক সাহেব এবং আরও কয়েকজন দাঁড়িয়ে আছেন। রাজ্জাক সাহেবের সঙ্গে যেহেতু আমার অনেক দিনের পরিচয়, আমি ঠিক তাঁর পাশেই গিয়ে দাঁড়ালাম। এই সময় ইদ্রিস ছিল এখানকার এসপি। ছাত্রাবস্থায় ইদ্রিস যে আইপিএস পরীক্ষা দেয়, আমার জানামতে সে ব্যাপারে রাজ্জাক সাহেবের কাছে অত্যন্ত ঋণী। কারণ, রাজ্জাক সাহেবই তাকে পড়িয়েছিলেন। তিনি ওখানে দাঁড়িয়ে আছেন, আর চোখের সামনে ইদ্রিস পিকেটিংরত ছাত্রদের ছত্রভঙ্গ করার চেষ্টা করে যাচ্ছে। এ রকম ঘটনার মুখে একটা ছেলে ইদ্রিসের মুখে থুতু ছিটিয়ে দিল। আর তার মুখের ওপরই বলল, 'তুমি না বাঙালি, তুমি এসব কী করছ?' থুতু দেওয়ায় ইদ্রিসের ফরসা চেহারা মুহূর্তে লাল হয়ে গেল। রুমাল দিয়ে দ্রুত মুছে নিয়ে একটু এগিয়ে এসে বলল, 'স্যার, আমি কিন্তু আর পারছি না। এখন গুলি করা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই।' তখন রাজ্জাক সাহেব বললেন, 'আরে, এরা তোমার ভাইয়ের মতো। তুমি এদের ওপর রাগ করছ কেন?' এ কথা বলে একজনকে বললেন, 'যাও, ওয়াহিদ আলীর রেস্টুরেন্ট থেকে এক গ্লাস পানি নিয়ে এসো।' পানি নিয়ে আসার পর ইদ্রিসকে তিনি বললেন, 'তোমার মুখটা ধোও। উত্তেজিত হয়ো না।'

অল্পক্ষণের মধ্যে পরিস্থিতি একটু শান্ত হয়ে গেল। এর কিছুক্ষণ পর সম্ভবত ঘণ্টা দুয়েক পর আমরা ভাবলাম যে কোনো ঘটনা যেহেতু আর ঘটছে না, সবকিছু বোধ হয় এভাবেই আস্তে আস্তে শান্ত হয়ে যাবে।

আমি থাকতাম ১৪ নম্বর বকশীবাজারে। রাজ্জাক সাহেব থাকতেন হোসেনি দালানে। আমরা রেললাইন ধরে এসে যার যার বাসায় চলে গেলাম। বাসায় গিয়ে

হাত-মুখ ধুয়ে সবে খেতে বসেছি। অমনি কানের পর্দায় আছড়ে পড়ে গুলির আওয়াজ। আমি যতটুকু জানি যে ইদ্রিস এই গুলির মধ্যে ছিল না। এই গোলাগুলির নেপথ্যে ছিল তখনকার সিটি এসপি পাঞ্জাবি মাসুদ মাহমুদ। তাকে সরাসরি গুলি করার আদেশ দিয়েছিল প্রধান সচিব আজিজ আহম্মদ। তারই সরাসরি আদেশে সে এই গুলিটা চালায়। এই মাসুদ মাহমুদ পরে ভুট্টোর মামলার সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিল এবং সে ওই মামলার রাজসাক্ষী হয়েছিল। তার সাক্ষ্যের ওপরই ভুট্টোর ফাঁসি হয়ে যায়। এই হলো সেই মাসুদ মাহমুদ।

আরেকটা কথা, তখন আমাদের মধ্যে কেউ কেউ ছাত্র ছিলেন, কারোর বা ছাত্রজীবন সবে শেষ হয়েছে। আমাদের কারও কারও মধ্যে আগাগোড়া ধারণা ছিল যে নুরুল আমিন সাহেবের প্রত্যক্ষ নির্দেশেই গোলাগুলি হয়েছে এবং এ জন্য নুরুল আমিন সাহেব নিন্দিত হয়েছেন, হয়েছেন ঘৃণার পাত্রও। কিন্তু এ ব্যাপারে আমার কোনো ব্যক্তিগত ধারণা নেই। আমি গোলাগুলির ঘটনার আগে এবং পরেও যতটুকু ভেবেছি এবং জেনেছি সেটা হলো এই যে আজিজ আহম্মদ এবং মাসুদ মাহমুদের উদ্যোগেই ঘটেছে গোলাগুলির ঘটনা। নুরুল আমিন সাহেব গুলির কোনো নির্দেশ দিয়েছেন কিংবা দেওয়ার মতো লোক ছিলেন বলে আমার মনে হয়নি। প্রশ্ন উঠতে পারে অ্যাসেমব্লিতে আবদুর রশিদ তর্কবাগীশ[১৬] প্রমুখ যখন নানা ধরনের প্রতিবাদ করতে শুরু করলেন, নুরুল আমিন সাহেব তখন তাঁদের পক্ষ সমর্থন করলেন না কেন? নিজেও হতাহত ব্যক্তিদের দেখতে এলেন না কেন? তাঁকে তো বারবার বলা হয়েছিল যে একবার সরেজমিনে দেখে আসুন। এ ধরনের অনুরোধ বা আহ্বানে কান না দেওয়ায় এ ধরনের ধারণা হওয়াটা খুবই স্বাভাবিক ছিল যে নুরুল আমিন সাহেব এই গোলাগুলির ঘটনাকে সমর্থন করেছিলেন। কিন্তু আমার সে রকমের ধারণা হয়নি। কেননা, নুরুল আমিন সাহেব ব্যক্তিগতভাবে খুব নরমপন্থী লোক ছিলেন। এবং আমি যতটুকু জানি তাঁর কাছে কোনো ধরনের কমপ্লিকেটেড বা জটিল বিষয়ের ওপর কোনো ফাইল গেলেই তিনি কোনো সিদ্ধান্ত নিতেন না। তাঁর ধারণা ছিল, এ রকম কিছুর সমাধান আপনাআপনিই হয়ে যাবে।

একুশের রক্তাক্ত ঘটনার পরও যে নুরুল আমিন সাহেব ঘটনাস্থলে যাননি, আমার মনে হয়, সেটা চাকরি রক্ষা করার জন্যই করেছিলেন। এর পেছনে তাঁর অন্য আর কোনো ধরনের উদ্দেশ্য ছিল বলে আমার মনে হয় না। বস্তুত, তখন নুরুল আমিন সাহেব ছিলেন একটা জেলা শহরের একজন সাধারণ আইনজীবী মাত্র। তাঁর পক্ষে ইস্ট পাকিস্তানের চিফ মিনিস্টার হওয়া একটা বিরাট ব্যাপার ছিল। যাঁরা তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন, তাঁদের কাছ থেকে শুনেছি তিনি উকিল হিসেবে কোনো দিন দুই তরফা কেস করেননি। অর্থাৎ কম্পিটিশন করে যে কেস, আরগুমেন্ট করার মতো কোনো কেস তিনি নিতেন না। অর্থাৎ তিনি একতরফা

কেস করতেন। যেখানে বিরোধী পক্ষ নেই, কনটেস্ট হবে না যে কেসে, সে ধরনের কেসের উকিল ছিলেন তিনি। কাজেই সে রকম একটা আইনজীবীর পক্ষে অথবা সে রকম পর্যায়ের একজন লোকের পক্ষে পূর্ব পাকিস্তানের চিফ মিনিস্টারশিপ একটা মস্ত বড় ব্যাপার ছিল। মামলায় উনি কোনো পক্ষ নিলে বরং তাঁর সুবিধা হবে এবং কনটিনিউ করতে পারবেন—এ রকম কোনো কিছু সম্পর্কে বোধ হয় তিনি খেয়ালই করেননি। তবে একটা কথা বলব যে আমি মওলানা ভাসানীর বক্তব্য শুনেছি। এই পল্টনের মার্চের বক্তৃতা মঞ্চে দাঁড়িয়ে তিনি নুরুল আমিনের দুর্নীতির ফিরিস্তি প্রকাশ করতে গিয়ে বলেছিলেন, ময়মনসিংহে তাঁর (নুরুল আমিনের) মর্মর পাথরের একটা বাড়ি আছে। সত্যি বলতে কি, একবার আমার ময়মনসিংহে যাওয়ার সুযোগ হয়েছিল এবং তখন সেখানকার যিনি ডিসি ছিলেন, তিনি আমার পরিচিত এবং আত্মীয়ও ছিলেন।

আমাকে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি ময়মনসিংহের কোথায় যাবেন?'

আমি বললাম, 'একটা জায়গা আমার দেখার ইচ্ছা আছে। নুরুল আমিন সাহেবের মর্মর পাথরের বাড়ি।' যা-ই হোক, সে বাড়ি দেখতে গেলাম। তবে মর্মর পাথর তো আর দেখলাম না, দেখলাম অর্ডিনারি টাইলসের একটা বাড়ি।

মওলানা সাহেব যে শান্তি সম্মেলনে ইউরোপে গিয়েছিলেন, আমি তাঁর সঙ্গে সেই সম্মেলনে যাইনি। ফিরোজ খান নূন ছিলেন তখন প্রধানমন্ত্রী। শান্তি সম্মেলনে যাওয়ার জন্য এখান থেকে সাতজনের নাম ঠিক করা হয়। প্রথম দিকে সরকারি মহল থেকে জানানো হলো যে সাতজনকেই অনুমতি দেওয়া হবে। পরে সেই অনুমতিটা এল মাত্র তিনজনের জন্য। মওলানা সাহেব চাচ্ছিলেন, আমি তাঁর সঙ্গে যাই। কিন্তু অত লোককে ডিঙিয়ে নিজে যাব—এ ব্যাপারে আমি ইতস্তত করছিলাম। পরে একটা খবর পেয়েছিলাম, তবে কোন সূত্র থেকে পেয়েছিলাম, আমি জানি না। শুনেছিলাম, ইউরোপের শান্তি সম্মেলন থেকে ফেরার পথে মওলানা সাহেবকে কায়রোয় নামতে হবে। খবরটা শুনে মনে প্রশ্ন জাগল, তাঁকে কায়রো নামতে হবে কেন? অনেক ভেবেচিন্তেও ব্যাপারটার কূলকিনারা পেলাম না। পরে আমি শুনেছি যে কায়রোতে তাঁর নামার মূলে ছিলেন ইস্কান্দার মির্জা। কেউ কেউ মওলানা সাহেবকে এই বলে বুঝিয়েছিলেন যে এসব এনএপি বা ন্যাপট্যাপ দিয়ে আপনার সোশ্যালিজম হবে না। আমরা আর্মির লোক, আমরা ক্ষমতা দখল করলে সোশ্যালিজম কায়েম করব এবং আপনি কায়রোতে যান, গিয়ে দেখেন কর্নেল নাসের সেখানে কী করছেন! মওলানা সাহেব তাই কায়রোতে জার্নি ব্রেক করেন এবং সেখানে কয়েক দিন থাকেন। এভাবে সামরিক বাহিনী সমাজতন্ত্র সূচনা করবে—এ রকম একটা ধারণায় তিনি বিশ্বাসী হয়ে আসেন। পরে এ জন্যই বোধ হয় ইস্কান্দার মির্জাদের সঙ্গে তাঁর একটা সমঝোতা হয়ে

যায়। তখন আমি তো এনএপির (ন্যাপ) রাজনীতির সঙ্গে খুব জড়িত ছিলাম এবং মওলানা সাহেব কোথাও যাতায়াত করতে গেলে টিকিট ইত্যাদির জন্য আমাকেই ডাকতেন। ডেকে বললেন যে 'আমি করাচি যাব, আমাকে একটা টিকিট কিনে দাও।' এর আগে মওলানা সাহেব আমাকে ডেকে বলেছিলেন যে 'আমি ইস্ট পাকিস্তান ট্যুর করব। সব জেলার প্রতিটি মহকুমায় আমি যাব। একটা ট্যুর প্রোগ্রাম তৈরি করো।' আমার বাসায় বসেই সেই ট্যুর প্রোগ্রাম তৈরি করে সবাইকে জানিয়ে দেওয়া হলো। হঠাৎ করে কয়েক দিন পর উনি বললেন যে 'টিকিট কিনে দাও, করাচি যাব।'

দুপুরবেলা খাওয়ার সময় আমি দলের অন্যদের বললাম যে 'তোমরা ট্যুর প্রোগ্রাম করছ, আর মওলানা সাহেব তো করাচি যাচ্ছেন।' তাঁরা বললেন, 'আমরা তো এসবের কিছু জানি না।'

আমি বললাম, 'আমি জানি। আমার কাছে তিনি করাচি যাওয়ার টিকিট চেয়েছেন।'

দলের অন্য সবাই যখন আমাকে বললেন যে 'সিধু ভাই, আমাদের কাছে ব্যাপারটা কেমন যেন বেশ জটিল মনে হচ্ছে। আপনিও মওলানা সাহেবের সঙ্গে যান। ব্যাপারটার তাহলে একটা হিল্লে করা যাবে।'

আমি বললাম, 'আমি কী করে যাব? মওলানা সাহেব তো আমাকে যেতে বলেননি।'

তাঁরা বললেন, 'না, কোনো একটা ওজর-আপত্তি বের করে আপনাকে যেতেই হবে।'

আমি পরের দিন টিকিটটা মওলানা সাহেবের হাতে তুলে দিয়ে তাঁকে বললাম যে 'আমিও করাচি যাচ্ছি। হঠাৎ করেই আমার একটা কাজ পড়ে গেছে।' মওলানা সাহেব তেমন একটা খুশি হলেন না। বললেন, 'ঠিক আছে, তুমি যাও।' দুজন একসঙ্গেই এয়ারপোর্টে গেলাম। পথে কিংবা প্লেনে খুব কথাবার্তা তিনি আমার সঙ্গে বললেন না। কেন জানি গম্ভীর হয়ে থাকলেন। তারপর করাচিতে গিয়ে যখন নামলাম, তখন রাত ১১টা সাড়ে ১১টার মতো। দেখলাম মাহমুদুল হক ওসমানী তাঁকে নিতে এসেছেন। মওলানা সাহেব নিজের থেকে আমাকে তাঁর সঙ্গে যেতেটেতে বললেন না। তখন ওসমানী সাহেব আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'রহমান সাব, আপকো ক্যায়া অ্যারেঞ্জমেন্ট?'

আমি বললাম, 'আমি তো খবর দিতে পারিনি।'

বললেন, 'ঠিক আছে, আজ রাতটার জন্য আমার এখানেই আপনি থাকুন।'

মওলানা সাহেবের সঙ্গে একই ঘরে আমার থাকার ব্যবস্থা করা হলো। আহারপর্বের পর একই ঘরে পৃথক বিছানায় শুয়ে পড়লাম। দুজনার মধ্যে তখনো তেমন কথাবার্তা নেই।

তিনি ঠাউরেছিলেন আমি ঘুমিয়ে গেছি। ভোরের দিকে দরজার আওয়াজ, পায়ের আওয়াজে ঘুম ভেঙে গেল। মওলানা সাহেবকে পাঁচটার দিকে আবার তাঁর বিছানায় শুয়ে পড়তে দেখলাম। আমি জেগে চুপ করে থাকলাম।

তারপর সকাল হতেই আমি বেরিয়ে গিয়ে আমার এক সাংবাদিক বন্ধু ছিলেন, নাম আসরার আহম্মেদ, *পাকিস্তান টাইমস*-এর সংবাদদাতা, কফি হাউসে গিয়ে তাঁকে ধরলাম। তাঁকে সবকিছুই খুলে বললাম।

বললাম মওলানা সাহেবের ব্যাপারস্যাপারগুলো। যে জন্য আমার আসা, সে ব্যাপারে তো আমার প্রায় হেরে যাওয়ার দশা!

আমার কথা শুনে আসরার আমাকে বললেন, 'ঠিক আছে, আপনি সন্ধ্যার দিকে আসেন। আমি যতটুকু জানি বলব।'

সন্ধ্যাবেলা যখন আমি গেলাম, তখন আসরার আমাকে বললেন, 'মওলানা সাহেব হকম্‌বেতে ইস্কান্দার মির্জার সঙ্গে দেখা করেছেন।' তিনি যে এ কাণ্ড করেছেন, এ ব্যাপারে আমি মওলানা সাহেবকে আর কিছু বলিনি।

যা-ই হোক, আমি মওলানা সাহেবের সঙ্গেই ঢাকায় ফিরে এলাম। ফিরে আসার পর তিনি যথারীতি ব্যারিস্টার শওকতের রয়েল স্টেশনারির ওপরের তলার ঘরে গিয়ে উঠলেন। আমি আমার বাসায় চলে এলাম। আমার অন্য সহকর্মীদের সঙ্গে আমার বাসাতেই দেখা হলো। আমার জন্য তাঁরা অপেক্ষায় ছিলেন। সবাই ন্যাপের।

তাঁদের মধ্যে ছিল মতিন, আবদুল হক। সম্ভবত তোয়াহাও ছিলেন। এখন সবার কথা মনে পড়ছে না। দেখা হওয়ামাত্র আমি তাঁদের বললাম, 'ভাই, এই এই ব্যাপার ঘটেছে। আমি সরাসরি কিছু ধরতে পারিনি। তবে আসরারের কাছে যাওয়ার পর তিনি আমাকে এই এই বলেছেন।' এ কথা তাঁদের বলার পর আমি এই বলে অনুরোধ করলাম যে 'তোমরা অন্তত এসব ব্যাপারে মওলানা সাহেবকে আমার সামনে কিছু বলবে না। ঝগড়া-বিবাদ করবে না। আমি তাহলে খুবই অ্যামবারাস ফিল করব। মওলানা সাহেব আমার সম্পর্কে খারাপ ধারণা নেবেন। বাট দিস ইজ দ্য স্টোরি।'

সব শুনে তাঁরা গিয়ে মওলানা সাহেবকে ধরে বসলেন, 'হুজুর, আপনি তো ট্যুর করতে চাইছিলেন। এখন ট্যুরের কী হবে?'

মওলানা সাহেব উত্তরে হঠাৎ করেই বলে বসলেন, 'না, ওটা বাদ দিয়ে দাও।'

তাঁরা বললেন, 'কেন? বাদ করে দেব কেন?'

মওলানা সাহেব এবার ধরা পড়ে গেলেন। এঁরা অনেক চাপাচাপি করতে লাগলেন, 'না, বাদ করা যাবে না।' মতিন তো একপর্যায়ে আস্তিন-টাস্তিনও গোটালেন। এ অবস্থায় মওলানা সাহেব একটু ঘাবড়ে গিয়ে বললেন, 'কোনো রাজনৈতিক কার্যক্রম থাকবে না।'

'কেন থাকবে না?'

সবাই একযোগে তাঁকে ধরে বসল, 'কী হয়েছে, আপনি সবটা আমাদের খুলে বলেন?'

মওলানা বললেন, 'বাবা রাজনীতি আর করা যাবে না। "কৃষক সমিতি" তোমরা করতে পারবে। তোমরা এর বেশি আমার কাছে জানতে চেয়ো না।'

মতিন ও আবদুল হক তখন বললেন, 'রাজনীতিই যদি করতে না পারব, তাহলে "কৃষক সমিতি" কেমন করে করতে পারব?'

মওলানা জবাবে বললেন, 'ওটা একটা শ্রেণিগত প্রতিষ্ঠান। ওটা বোধ হয় করা যাবে।'

কিন্তু মতিনরা যখন রাজনীতি করার পক্ষে জোরাজুরি করতে লাগলেন, মওলানা সাহেব তখন আর নিজেকে ধরে রাখতে পারলেন না। তাঁকে বলতেই হলো যে আর্মি শাসন আসছে। রাজনীতি আর থাকবে না।

১৮. জিয়ার রাজনৈতিক নকশা

এখন ভিন্ন একটা প্রসঙ্গে কথা বলা যাক। যাদু মিয়ার সঙ্গে জিয়াউর রহমান সাহেবের যোগাযোগের ব্যাপারটি নিয়ে বেশ কথা আছে। বাজারে কথা আছে যাদু মিয়ার মৃত্যু সম্পর্কেও। এ সম্পর্কে নানা ধরনের গুজবও ছিল সেই সময়ে। এই দুটি বিষয়ে কিছুটা আলোকপাত করা যেতে পারে।

যখন শেখ মুজিবের মৃত্যু হয়, আমি তখন লন্ডনে। তাঁর মৃত্যুর পরই যাদু মিয়া জেল থেকে ছাড়া পায়। ছাড়া পেয়েই সে লন্ডনে চলে যায়। আমার সঙ্গে সেখানে দেখা হওয়ার পর থেকেই সে আমাকে কেবলি বলছিল যে একজন আমার সঙ্গে একটা রাজনৈতিক সংলাপ করতে চাইছে।

যাদু মিয়া ছাড়া পেয়েছিল মোশতাকের টাইমে। অবশ্য কে তার সঙ্গে রাজনৈতিক সংলাপ করতে চাইছে, সে কথা আমাকে বলেনি। আমি বললাম যে 'তুমি তো এসেছ তোমার শারীরিক সমস্যা নিয়ে। তুমি আগে এ কাজটাই সারো।' চেকআপ সেরে এক মাসের মধ্যে মেডিকেলে আসার সময় আমাকে বলল, 'যদি আমার সঙ্গে এরা কোনো আলোচনা করতে চায়, তাহলে আপনার সাহায্য আমার দরকার হবে। আপনি আসবেন।'

আমি বললাম, 'আমি সেটা বলতে পারছি না। কী রকমের ডায়ালগ হবে, সে ব্যাপারে তুমি আগে আমাকে জানাবে।'

খোন্দকার মোশতাক তখন ক্ষমতা থেকে চলে গেছেন। জিয়াউর রহমান সাহেব ক্ষমতায় এসেছেন। জিয়াউর রহমান সাহেব এসে যাদু মিয়ার সঙ্গে ডায়ালগ ওপেন করেন। জিয়াউর রহমান যখন তাঁর সঙ্গে ডায়ালগ ওপেন করেন, তখন

তিনি একদিন আমাকে একজনের হাত দিয়ে খুব একটা জরুরি চিঠি পাঠালেন। তাতে বলা হয়েছিল, 'সংবিধান ও অন্যান্য ব্যাপার নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। আমি তো পারছি না। আপনি তাড়াতাড়ি আসেন।' আমি তাড়াতাড়ি গেলাম। আমি যাওয়ার আগেই জিয়াউর রহমান সাহেবের সঙ্গে তাঁর নানা রকমের আলোচনা ইতিমধ্যে হয়ে গেছে। প্রথমেই, জিয়াউর রহমান চাচ্ছিলেন যে তাঁকে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত করা হোক এবং যাদু মিয়া সেটা নিয়ে কোনো ব্যক্তিগত দর-কষাকষিতে যাতে না যায়। সংবিধানের ওপরই কথা চলছিল। কথা চলছিল সংবিধানের রূপরেখা কী হবে, তা নিয়ে। প্রেসিডেন্ট এবং পার্লামেন্টের ক্ষমতা কী হবে, সে নিয়েও কথা হচ্ছিল। ফরাসি সংবিধান, জার্মান সংবিধান, পাকিস্তানের সংবিধান ইত্যাদি নিয়েও আলাপ হয়। জিয়াউর রহমান সাহেবের কাছে ১৯৭২ সালের সংবিধান গ্রহণযোগ্য নয়, তিনি এক ব্যক্তির হাতে আরও বেশি ক্ষমতা চাইছেন। সেই ক্ষমতার বণ্টন হবে কি না, হলে কীভাবে হবে, সে নিয়েও কথা হলো। এ জন্য বিভিন্ন দেশের সংবিধান আনা হলো। সেগুলোকে বিবেচনায় নেওয়া হলো। কিন্তু আলোচনা যখন চলছে, তখন জিয়াউর রহমান সাহেব হঠাৎ করেই যাদু মিয়ার সঙ্গে আলোচনা বন্ধ করে দিলেন। এবং গণভোটের সিদ্ধান্ত নিলেন। আর সেটা কার বুদ্ধিতে নিলেন, সে কথা আমি জানি না। যখনই গণভোট দিলেন, যাদু মিয়া তো একেবারে খেপে লাল। সে আমার বাসায় ছুটে এল। বলল, 'জিয়া আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। আমি একটা প্রেস কনফারেন্স করব।'

আমি বললাম, 'কী প্রেস কনফারেন্স করবে। এখন তো মার্শাল ল চলছে।'

যাদু বলল, 'না, প্রেস কনফারেন্স করবই।' আমি বললাম, 'যদি নেহাতই করো, তাহলে তোমার বক্তব্য যেন রাজনৈতিক বক্তব্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। ব্যক্তিগত আক্রমণ কোরো না কিংবা গালাগাল দিয়ো না।' যাদু মিয়ার সেই প্রেস কনফারেন্সের বিবরণ কোনো দিন ছাপানো হয়নি। কারণ, সেটা নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। প্রেস কনফারেন্স ওর বাড়িতেই হয়েছিল এবং তার একটা কপি সে আমাকে দিয়েছিল। আমি বোধ হয় হারিয়ে ফেলেছি। সেখানে জিয়াউর রহমান সাহেব যে গণভোট করলেন, তার আগে সংবিধানে কতকগুলো সংশোধনী এনেছিলেন। উনি যে কৃতিত্বের দাবি করেন, সেটা হলো তিনি শাসনতন্ত্রে 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম' যোগ করেছেন। যাদু মিয়া তার প্রেস কনফারেন্সে বলল যে উনি তো 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম' যোগ করার কথা বললেন, তার আগে একটা লাইন ছিল 'আউজুবিল্লাহ মিনাস শায়ত্বায়ানির রাজিম'—ওটা দেন নাই কেন? মানে জিয়াকে নানাভাবে আক্রমণ করতে লাগল। তারপর ওই 'সোশ্যালিজম'-এর জায়গায় 'সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার' করা হলো কেন, এ ধরনের প্রতিটি দিকের সমালোচনা করতে লাগল। করার পর আমাকে এই বলে টেলিফোন

করল যে 'আমি তো যা করার করেছি। এখন আমার বাড়ি তো ঘেরাও।'

আমি বললাম, 'কী রকম?'

বলল, 'সাদা পোশাকের পুলিশে আমার বাড়ি ঘেরাও। বাড়ি থেকে কাউকে বেরোতে দিচ্ছে না, কাউকে ভেতরে আসতেও দিচ্ছে না।'

আমি বললাম, 'আমি তো রাতে কোথাও যাব না। আগামীকাল সকালবেলা তোমার ওখানে আসার জন্য চেষ্টা করতে পারি।'

পরের দিন সকালবেলা আমি যখন যাই, তখনো সাদা পোশাকের পুলিশে যাদু মিয়ার বাড়ি ঘেরাও হয়ে রয়েছে।

আমি বললাম যে 'দেখেন, ও খুব উত্তেজিত। ওর ব্লাডপ্রেশার। আমি ওকে একটু দেখতে চাই। বেশিক্ষণ থাকব না।' আমাকে যেতে দিল। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'কোনো ব্যক্তিগত আক্রমণ তো করো নাই?'

বলল, 'না, তাঁকে ব্যক্তিগত আক্রমণ করিনি। তবে আমি তাঁকে কায়দা করে কয়েকটা খোঁচা দিয়েছি।'

যা-ই হোক, যাদু মিয়াকে পাক্কা তিন দিন ওই রকমভাবে রাখা হয়েছিল। ইতিমধ্যে একটা ঘটনা ঘটে গেল। ডিজিএফআইয়ের প্রধান আমিনুল ইসলামের তরফ থেকে একটা ফাইল দেওয়া হলো জিয়াউর রহমানের কাছে। তাতে মশিয়ুর রহমানকে মার্শাল লতে গ্রেপ্তার করার কথা বলা হলো। আমিনুল ইসলামের এই ফাইলটা পেয়ে জিয়াউর রহমান করলেন কি এরশাদ সাহেবকে ডাকলেন। তখন উনি ডেপুটি চিফ ছিলেন। মঞ্জুর ছিলেন সিজিএস। এরশাদ এনএসআই, কমিশনার অব পুলিশ এবং ডিআইজিএসবি—এঁদের সবাইকে ডাকলেন এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য। এরশাদ সাহেব প্রথমেই নাকি বলেছিলেন, (আমার এটা যাদুর কাছ থেকে শোনা) 'যাদু মিয়া আমার আত্মীয়। কাজেই আমি এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে থাকতে চাই না।'

জিয়াউর রহমান সাহেব শুনে বলেছিলেন, 'ইউ আর এক্সকিউজড।'

এরশাদ সাহেব উঠে চলে গিয়েছিলেন। দেন ইট কেম টু মঞ্জুর।

মঞ্জুর বলেছিলেন, 'মশিয়ুর রহমান সাহেব যে মার্শাল ল ভঙ্গ করেছেন, এটা আপনি কী করে জানলেন?'

বললেন, 'আমার কাছে টেপ আছে।'

বললেন, 'টেপটা প্লে করেন।'

টেপ প্লে করা হলো। বাজানো টেপ শুনে দেখা গেল যে মার্শাল লকে উনি আক্রমণ করেননি। জিয়াউর রহমানকেও উনি ব্যক্তিগতভাবে আক্রমণ করেননি। এসব শোনার পরে মঞ্জুর বললেন যে 'আমার ধারণা, উনি মার্শাল লর কোনো শর্ত ভঙ্গ করেননি। সুতরাং তাঁকে গ্রেপ্তার করার আমি কোনো যুক্তি দেখি না।'

এনএসআইয়ের সরদার তাঁকে বললেন, 'আপনার কী মত?'

সরদার নাকি বলেছিলেন, 'আমরা তো আগের খবর সব জানি স্যার। উনি তো আমাদের বন্ধু। হি ইজ অ্যা ফ্রেন্ড অব দ্য অথরিটি এবং আপনার সঙ্গে তো তাঁর অনেক আলাপ-আলোচনা হয়েছে।

তাঁকে গ্রেপ্তার করার পক্ষে আমি উপযুক্ত ক্ষেত্র খুঁজে পাচ্ছি না। তাঁকে গ্রেপ্তার করে শত্রু বানানোর আমি বিপক্ষে। সুতরাং আমরা তাঁর গ্রেপ্তারের পক্ষে নই।' পুলিশ বলল যে তাঁকে এ অবস্থায় গ্রেপ্তার করলে যে অবস্থার সৃষ্টি হবে, সেটা আমরা সামলাতে পারব কি না, জানি না। সুতরাং, আপনারা সিদ্ধান্ত নেন। তারপর আমাদের যদি আদেশ দেন, তাহলে আমরা সেভাবে ব্যবস্থা নেব। এসবির তরফ থেকে বলা হলো, আপনারা যখন কেউই দায়িত্ব নিতে চান না, আমাদের ঘাড়ে সেটা কেন চাপাতে চাইছেন, আপনারা এর দায়দায়িত্ব নেন।

যা-ই হোক, শেষ পর্যন্ত মঞ্জুরের মতামতই বজায় থাকল এবং মশিয়ুর রহমান যাদু মিয়া ওয়াজ নট অ্যারেস্টেড আন্ডার মার্শাল ল ফর হোল্ডিং দ্যাট প্রেস কনফারেন্স। কিন্তু কয়েক দিন তাঁর দুই ছেলেকে গ্রেপ্তার করে রাখা হয়। এই অভিযোগ এনে যে গণভোটের পোস্টার দেয়ালে সাঁটা হয়েছিল, সেটা নাকি তারা ছিঁড়েছিল। যাদু মিয়ার দুই ছেলেকে গ্রেপ্তার করে প্রায় তিন সপ্তাহ, মানে গণভোট শেষ না হওয়া পর্যন্ত থানাহাজতে আটক রাখা হয়। ছেলে দুটো ন্যাপ করত না, কিছুই করত না। তারা মসিউর রহমানের ছেলে, এটাই তাদের আটক রাখার কারণ।

যা-ই হোক, রেফারেন্ডাম তো হয়ে গেল। জিয়াউর রহমান তাতে শতকরা ৯৬ না ৯৯ ভাগ ভোট পেলেন। ব্যাপারটা দেশেও কেউ বিশ্বাস করেনি, বিদেশে তো নয়ই। উনি গেলেন কমনওয়েলথ হেড অব স্টেটসের মিটিংয়ে। সেই সময় *ম্যানচেস্টার গার্ডিয়ান* লিখে দিল যে যে ভোট উনি পেয়েছেন, সেটা ক্যালকুলেট করলে দেখা যাবে যে প্রতি ৪০ সেকেন্ডে একটা করে ভোট পড়েছে। যেটা ব্রিটেন কিংবা অন্য কোনো গণতান্ত্রিক দেশেও আমরা দেখি না। বাংলাদেশ রাজনৈতিকভাবে এমন কী সচেতন দেশ যে সেখানে এ রকম হারে ভোট পড়তে পারে!

এ রকমের তিক্ত সব কথা লেখা হলো তাঁর বিরুদ্ধে। জিয়াউর রহমান কমনওয়েলথ সম্মেলন থেকে ফিরে এসে যাদু মিয়াকে আবার ডাকলেন। ডেকে তার কাছে দুঃখ প্রকাশ করলেন। যা কিছু হয়েছে তার ফিরিস্তি দিয়ে বললেন, 'যাদু ভাই, এবার আপনি ছাড়া কেউ আর আমার মানসম্মান রক্ষা করতে পারবে না। মানসম্মান বলতে আর কিছু নেই।' যাদু মিয়া বলল, 'কেমন করে করব?' জিয়া বললেন, 'আমাকে জনসাধারণের ভোটে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত করে দেন।'

জিয়ার সঙ্গে তার এসব কথা হয়েছে অনেক রাত পর্যন্ত। খানাপিনাও হয়েছে। তারপর ভোর ছয়টার দিকে যাদু মিয়া টেলিফোন করে আমাকে বলল, 'আপনি একটু আসেন। আপনার সঙ্গে কথা আছে।' আমি তার গলার আওয়াজে একটু ভয়ই পেয়ে গিয়েছিলাম। ভেবেছিলাম ভোর ছয়টার সময় হঠাৎ করে তার ফোন কেন? তাই শঙ্কিত গলায় আমি বললাম, 'কী হয়েছে তোমার?'

বলল, 'না, কিছু হয়নি। আপনি একটু আসেন।' আমি তার কাছে যাওয়ার পর সে আমাকে বলল যে 'জিয়া আমাকে এ রকমভাবে দাওয়াত দিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। আমি তো কথা দিয়ে এসেছি যে তাঁকে আমি জনসাধারণের সরাসরি ভোটে পাস করাব।'

আমি বললাম, 'কথা দিয়ে এসেছ অথচ তুমি কি পারবে? তুমি যে একলা কথা দিয়ে এলে, জিয়াউর রহমানকে জনসাধারণের ভোটে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত করার তোমার ক্ষমতা আছে?'

যাদু মিয়া বলল, 'না, আমি পারব না বলেই আপনাকে খবর দিলাম। কথা যখন দিয়ে এসেছি, তখন আমি কী করব বলেন!'

তখন তার সঙ্গে মিলে একটা রাজনৈতিক কৌশল ঠিক করা হলো। কৌশলটা ছিল এ রকমের, আওয়ামী লীগের শেষের দিকে যে কাজ-কারবার, তাতে করে একটা বিপুলসংখ্যক জনগণ রাজনীতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। এই বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়াদের আমি বলেছিলাম 'সাইলেন্ট মেজরিটি'। তারা আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে কিছু বলতেও সাহস পায় না অথবা আওয়ামী লীগকে সমর্থনও করতে পারছে না। ফলে রাজনৈতিকভাবে তারা চুপচাপ হয়ে গেছে। আমি বললাম, 'যদি এই সাইলেন্ট মেজরিটিকে তুমি কনভার্ট করে তোমার পক্ষে আনতে পারো, তাহলে শুরু হতে যাওয়া গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় তাদের অংশ নেওয়ার এই বলে ডাক দেওয়া যেতে পারে যে "আপনারা আসেন, এই গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় অংশ নেন এবং মার্শাল ল থেকে বেরিয়ে আমরা একটা গণতান্ত্রিক পদ্ধতির উত্তরণ ঘটাই। আপনারা এতে অংশ নেন।" এভাবে জনগণকে যদি তুমি বোঝাতে পারো, তাহলে তোমার সাফল্যের সুযোগ আছে। কিন্তু তার আগে তোমাকে একটা রাজনৈতিক প্ল্যাটফর্ম দাঁড় করাতে হবে। একটা রাজনৈতিক জোট গড়ে তুলতে হবে। কার কার সঙ্গে মিলে এই জোট করতে পারো?'

যাদু মিয়া আমাকে বলল, 'আওয়ামী লীগ সামরিক বাহিনীর কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। অর্থাৎ এই জোটে সাংগঠনিকভাবে আওয়ামী লীগকে আনতে পারবে না অথবা আওয়ামী লীগের সে রকমের কোনো প্রতিষ্ঠিত নেতাও এতে আসতে পারবে না।'

আমি বললাম, 'তাহলে ব্যাপারটা হবে কী করে? তাঁদের বাদ দিয়ে কিছু হলে সেটা হবে অত্যন্ত দুর্বল কিছু।'

যাদু মিয়া বলল, 'মুসলিম লীগকে পারব।'

আমি বললাম, 'মুসলিম লীগ মানেই তো সবুর খান। সবুরকে তো বিশ্বাস করবে না বাংলাদেশের লোক।'

তখন ও বলল, 'একটা কাজ করা যায়, সবুর ভাইকে কিছু ভালো ব্র্যান্ডি-ট্র্যান্ডি দিয়ে তাঁর সঙ্গে আজকে রাতেই একটু কথা বললে হয় না! উনাকে যদি কিছুদিনের জন্য সরিয়ে দিই আর শাহ আজিজকে মুসলিম লীগের ভাইস প্রেসিডেন্ট করা হয়, অর্থাৎ চার্জ বুঝিয়ে দিয়ে সবুর খান সরে যান, তাহলে শাহ আজিজ আমাদের সঙ্গে যোগ দিতে পারেন।'

সবুর সাহেবের কাছে খুব ভালো ব্র্যান্ডি নিয়ে গেল যাদু মিয়া এবং রাতের মধ্যেই সবুর সাহেব দুই-এক মাসের জন্য শাহ আজিজকে তাঁর দায়িত্বভার বুঝিয়ে দিয়ে দেশের বাইরে চলে গেল। ইট ওয়াজ অল ফাইন্যান্সড বাই গভর্নমেন্ট অথবা অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান। এ ঘটনার পরপরই শাহ আজিজ যাদু মিয়ার সঙ্গে জয়েন করলেন।

এই ঘটনা ঘটেছিল 'জাগদল' হওয়ার পর। এভাবে একটা প্ল্যাটফর্ম তৈরি হলো। তার মধ্যে কাজী জাফর এল। তারপর যাদু মিয়া ন্যাপকে আনল। কিন্তু ন্যাপকে ফ্রন্টের মধ্যে বিলীন করে দিল না।

সাময়িকভাবে তার কাজকর্মকে স্থগিত করল। ন্যাপের কর্মতৎপরতা স্থগিত করার ব্যাপারটা একটা গোঁজামিল ছাড়া আর কিছু ছিল না। কিন্তু তাতে যাদু মিয়ার যে পারপাস, সেটা হাসিল হয়নি। কারণ, ক্ষমতার লোভে পড়ে ন্যাপের সব লোক যাদু মিয়ার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে জিয়াউর রহমানের সঙ্গে যাওয়ার জন্য তৈরি হয়ে ছিল।

কাজী জাফরের কথাই ধরা যাক। এর আগে আগাগোড়া সে একটা এস্টাবলিশমেন্ট-বিরোধী ভূমিকা পালন করে এসেছে। এখানটায় এসে সে এস্টাবলিশমেন্ট, বিশেষ করে মিলিটারি এস্টাবলিশমেন্টের সঙ্গে হাত মেলায়। আমার মতে, এটা ছিল তার বাইরের দিক। ভেতরে ভেতরে সে সবার সঙ্গেই যোগাযোগ রেখে চলত।

১৯. জিয়াকে রাজনীতিবিদ বানানোর প্রকল্প

তখনো আমি অত কিছু জানি না। জিয়াউর রহমানের উদ্যোগে যে রাজনৈতিক প্রক্রিয়া চলছিল, সেই প্রক্রিয়ার সঙ্গে যাঁরা জড়িত ছিলেন, তাঁদের সঙ্গে তিনি যোগাযোগ রাখতেন। তারপর তো তিনি সরাসরি এগিয়ে এলেন। প্ল্যাটফর্ম তৈরি হলো। এই প্ল্যাটফর্ম থেকেই জিয়াউর রহমানকে প্রেসিডেন্ট করা হলো। কারণ, তাঁরা জানতেন যে জিয়াউর রহমানকে প্রেসিডেন্ট করা ছাড়া অন্য কোনো উপায় নেই। অ্যাপার্ট ফ্রম এনিথিং জিয়াউর রহমানের একটা পপুলারিটি ছিল এবং সত্যি

বলতে কি, তাঁকে রাজনীতিবিদ বানানোর যে প্রসেস, সেটা ছিল একটা খুবই ইন্টারেস্টিং ব্যাপার।

জিয়াউর রহমান কিন্তু বাংলা লিখতে-পড়তে জানতেন না। তিনি শেষের দিকে যা কিছুতে সই করতেন, সেটা করতেন শুধু বাংলায় 'জিয়া' লিখে। আপনারা যদি তাঁর স্বাক্ষর করা ফাইল ইত্যাদি দেখেন, তাহলে এই ব্যাপারটা লক্ষ করবেন। করাচিতে তিনি লেখাপড়া শিখেছেন। যৎসামান্য বাংলা বলতে পারতেন। বাংলা লেখাপড়া কিছু জানতেন না।

প্রথম দিকে তিনি বাংলায় যে বক্তৃতা দিতেন সেগুলো উর্দুতে লিখতেন। লিখে তারপর তা-ই দেখে দেখে ভাষণ দিতেন। যা-ই হোক, আমার নিজের ছেলেও বাংলা বলে কিন্তু পড়তে পারে না। কারণ, সে জন্মের পর থেকেই ইংরেজি স্কুলে লেখাপড়া করেছে। তার পরও বলব, এটা তাঁর চরিত্রের একটা দুর্বল দিক। কিন্তু এ নিয়ে তাঁর বিরুদ্ধে কিছু বলা যাবে না।

যা-ই হোক, যে কথা আমি বলছিলাম—জিয়াউর রহমানের একটা ব্যক্তিগত জনপ্রিয়তা ছিল এবং তাঁর বিরুদ্ধে কোনো বদনাম ছিল না। মানুষ তাঁকে পছন্দই করত। কিন্তু ভালো করে বক্তৃতা দিতে পারতেন না। দিতে গেলে খালি হাত-পা ছুড়তেন। এসব দেখেটেখে যাদু একদিন আমাকে বলল যে 'এ রকম হলে কী করে তাঁকে আমি চালিয়ে নেব?'

আমি বললাম, 'দেখো, জিয়া বক্তব্য দিতে পারেন না ঠিক আছে। তিনি সবচেয়ে ভালোভাবে কী করতে পারেন, সেটা খুঁজে বের করো।'

জবাবে যাদু বললেন, হাঁটতে পারেন একনাগাড়ে ২০ থেকে ৩০ মাইল পর্যন্ত।

আমি বললাম, এই তো পাওয়া গেল সবচেয়ে ভালো একটা উপায়। তুমি তাঁকে সঙ্গে নিয়ে পাড়াগাঁয়ে হাঁটাও। হাঁটাও আর যেটা পারে তাঁকে দিয়ে সেটাই করাও। গাঁও-গ্রামের রাস্তা দিয়ে যাবে আর মানুষজনকে জিজ্ঞেস করবে, 'কেমন আছেন?'

প্রেসিডেন্ট, দেশের মিলিটারি লিডার, তিনি গ্রামের বাড়ি বাড়ি গিয়ে, কানাকানচি দিয়ে ঘোরাঘুরি করছেন আর লোকজনের ভালোমন্দের খোঁজখবর করছেন, তাতেই তিনি জনপ্রিয় হয়ে উঠবেন। এভাবে দেখতে দেখতে তিনি বক্তব্য দেওয়াটাও রপ্ত করে ফেললেন। কিন্তু এ তো ঘটনার এক দিক। অন্য দিকটা হলো, যেখানে কোনো দিন যাননি, ইউনিয়ন বোর্ডের একজন চেয়ারম্যানও, সেখানে খোদ দেশের প্রেসিডেন্ট যাচ্ছেন এবং তাঁর সঙ্গে অন্য আরও অনেকেই যাচ্ছেন। সেটা একটা বিশাল ব্যাপার। এসব দেখেটেখে গ্রামের লোকজন ভাবল, জিয়াউর রহমান এমন লোক, যিনি আমাদের খোঁজখবর রাখেন।

এভাবে তাঁর একটা জনপ্রিয়তা তৈরি হলো। এভাবেই তো তিনি প্রেসিডেন্ট হলেন। হওয়ার পর সংসদীয় নির্বাচনও হলো।

আপনারা বলতে পারেন, আমি নীতিচ্যুত হয়েছি কি না; কিন্তু আমি নিজের স্বার্থে এসব করিনি। এমনকি যাদু মিয়া প্রাইম মিনিস্টার কিংবা এ রকমের কিছু হোক—তেমন উদ্দেশ্য থেকেও কিছু করিনি। আমি দেশে গণতন্ত্র আসুক—সত্যিকারভাবে সেটা চেয়েছিলাম বলেই তাদের এই সমর্থনটুকু দিয়েছিলাম। এবং ক্ষমতাটা যে এক হাতে কুক্ষিগত হয়েছিল, জানতাম সেখান থেকে একেবারে একদিনে আমি বেরিয়ে আসতে পারব না। কাজেই সেটা যদি একটা স্টেজের ভেতর দিয়ে আসে, তা-ও আসুক। কিন্তু আমি চেয়েছিলাম যে জিয়াকে এ রকম সমর্থন দেওয়ার আগে তাঁর সঙ্গে যাদু মিয়ার একটা চুক্তি হতে হবে এবং সেটা হতে হবে সংবিধানের ওপর ভিত্তি করে এবং সত্যি বলতে কি, এ ব্যাপারে চুক্তি হয়েছিলও। হয়েছিল সাংবিধানিক ফরমুলার ওপর ভিত্তি করেই। সেই চুক্তিতে যাদু মিয়া ও জিয়াউর রহমান—দুজনেরই সই ছিল। চুক্তিটার দুটো কপি ছিল। একটা ছিল যাদু মিয়ার কাছে। আর একটা ছিল জিয়াউর রহমানের কাছে। থার্ড একটা কপিও থাকতে পারে। খুব সম্ভবত সেটা ছিল মেজর জেনারেল নুরুল ইসলামের কাছে। তিনি তখন জিয়াউর রহমানের সিভিলিয়ান অ্যাফেয়ার্স বিভাগে কাজ করতেন। আমি দেখেছি সেই কপিটায় ১২-১৩টা প্রস্তাব লেখা ছিল। তার নিচেই সব সইটই করা হয়েছিল। জিয়াউর রহমান ও মসিউর রহমানের সই ছিল। তাতে ছিল সংসদের ক্ষমতা এবং রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা (পাওয়ার্স অব পার্লামেন্ট অ্যান্ড পাওয়ার্স অব প্রেসিডেন্ট) কী হবে, তার বিবরণ। মোটামুটি গণতান্ত্রিক সংবিধানের একটা রূপরেখাও তাতে তুলে ধরা হয়েছিল। তবে ওটার প্রথম খসড়া কার, আমি জানি না। কিন্তু আমার সঙ্গেও চুক্তিটা নিয়ে অনেক কথাবার্তা হয়েছিল। সংশ্লিষ্ট সবার মতামত ও পরামর্শ নিয়েই চুক্তিটা দাঁড় করানো হয়েছিল। তার একটা কপি যাদু মিয়া আমাকে দিয়ে বলেছিল, 'এটা আপনার কাছে রাখেন।' আমি তো আর জানি না যে যাদু মিয়া এ রকমভাবে মারা যাবে! আমি তাঁকে বলেছিলাম, 'দেখো, এটা তো একটা গুরুত্বপূর্ণ দলিল। এটা তোমার কাছেই থাকা উচিত। আমার কাছে থাকা উচিত নয়। আমি হয়তো কোথায় রেখেটেখে দেব। অন্য লোকে দেখেটেখে ফেলতে পারে। এটা একান্তভাবেই তোমাদের জিনিস।' আমি আর ওটা নিইনি।

যাদু মিয়ার মৃত্যুর পর আমি প্রথম যে জিনিসটার খোঁজ করেছি, সেটা হলো চুক্তিটির কপি। যাদু মিয়ার শোয়ার ঘরের আলমারির ওপর রাখা একটা সুটকেসের মধ্যে ওটাকে রাখা হয়েছিল। কিন্তু তন্নতন্ন করে খুঁজেও আমি ওখান থেকে আর ওটাকে পাইনি। ওটা উধাও হয়ে গিয়েছিল। এ কথা হচ্ছে, যাদু মিয়া এবং জিয়ার মধ্যে যে বোঝাপড়াটা হয়েছিল, সেটা যাদু মিয়ার মৃত্যুর পরে কিন্তু আর থাকেনি। লিডার হিসেবে তুলে আনা হলো শাহ আজিজুর রহমানকে।

একদিন যাদু মিয়া আমাকে দুঃখ করে বলেছিল, 'আমি তো শাহ আজিজকে নিয়ে গেলাম সংসদে আর প্রেসিডেন্টের পাওয়ার কী হবে, কতটুকু হবে, সে ব্যাপারে সাহায্য করার জন্য। সেখানে সে এ রকমের একটা শর্ত রেখেছিল যে প্রেসিডেন্টই প্রধানমন্ত্রী নমিনেট করবেন; কিন্তু পার্লামেন্টে গিয়ে তাঁকে ৩০ দিনের মধ্যে আস্থা ভোট নিতে হবে।'

শাহ আজিজ ওখানে বসেছিল। সে জিয়াকে লক্ষ করে বলেছিল, 'স্যার, এর আবার কী দরকার? আপনি নমিনেট করবেন, তার আবার আস্থা ভোটের কী দরকার? দ্যাট ইজ এনাফ। ইয়োর নমিনেশন ইজ এনাফ।'

যাদু বলল, 'তাকে নিয়ে গেলাম, আর সে গিয়ে কিনা আমার বিরুদ্ধে কথা বলতে শুরু করল জিয়ার কাছে।' এসব ব্যাপার নিয়ে যাদু মিয়া শাহ আজিজ সম্পর্কে হতাশা বোধ করছিল। কিন্তু তখন আর উপায় ছিল না। তাঁকে যে সাহায্য করব, আমার সামনে তেমন কোনো রাস্তা আর খোলা ছিল না।

২০. যাদু মিয়ার মৃত্যু প্রসঙ্গ

নির্বাচনের পর অনেক ঘটনা ঘটল এবং জিয়াউর রহমান অন্যদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে যাদু মিয়ার কাছে তিনি তাঁকে প্রধানমন্ত্রী করবেন বলে যে অঙ্গীকার করেছিলেন, সেখান থেকে তিনি সরে যাচ্ছিলেন। তাকে ভাইস প্রেসিডেন্ট করার অফার দেওয়া হচ্ছিল কিন্তু যাদু মিয়া বলছিল যে 'হয় তুমি ওয়াদা রাখবে অথবা রাখবে না—দুটোর একটা করো। আমি অন্য কিছু নেব না।' এসব কিছু নিয়ে খুব গোলমাল হলো এবং যাদু মিয়ার পক্ষের কিছু লোক যাদু মিয়াকে এসব নিয়ে খুবই টেনশনে রেখেছিল। তাকে তারা স্বস্তি দিচ্ছিল না। যাদু মিয়ার মৃত্যুর কিছুদিন আগে টঙ্গীতে একটা মিটিং ছিল। সে তাতে বক্তৃতা করেছিল এবং মিটিং চলার সময়ই সে ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়ে। তার উচ্চ রক্তচাপও ছিল। টেনশনেই তার এমনটা হয়।

আমি অবশ্য নির্বাচনের পরেই যাদু মিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক পুরোপুরি চুকিয়ে দিয়েছিলাম। কারণ, বহু লোক তদবিরের জন্য তার কাছে আসত। আমি যাদু আর জিয়াউর রহমানকে মূলত সমর্থন করেছিলাম গণতন্ত্রের জন্য।

আর একটা কথা যাদু মিয়াকে বলেছিলাম, 'আর যা-ই করো আর না করো, দেয়ার ক্যান নট বি অ্যানি ডেমোক্রেসি উইথআউট অ্যান অপজিশন।' সে ব্যক্তিগতভাবে একদিন আমাকে বলেছিল, 'আপনি কোন সিট থেকে দাঁড়াতে চান বলেন। আমি আপনাকে পাস করিয়ে আনব।'

আমি বলেছিলাম, 'আমি তেমন কিছু চাই না।' অবশ্য আমি তাকে ঠাট্টা করে বলেছিলাম, 'তুমি যেখানে প্রধানমন্ত্রী হবে, সেখানে আমি সদস্য হব!'

বলেছিলাম, 'আমি কিছু চাই না কিন্তু তোমরা আমাকে একটা কথা দাও যে দেশে একটা অপজিশন বা বিরোধী দল থাকবে।'

ও বলেছিল, 'থাকবে মানে, থাকবে।'

আমি বললাম, 'শেখ মুজিবের কাছেও একটা গ্রুপকে আমি পাঠিয়েছিলাম। আমার নিজেরই যাওয়ার কথা ছিল কিন্তু আমি যাইনি। কারণ, আমি নিজেকে আয়ত্তে রাখতে পারব না।'

যা-ই হোক, তাদের দিয়ে একটা কথাই শেখ মুজিবকে বলানো হয়েছিল যে সংসদে যাতে বিরোধী দল থেকে ৩০-৪০ জন সংসদ সদস্য সংসদে এসে কথা বলতে পারেন, আপনি তার সুযোগ রাখবেন।

যাঁরা তাঁর কাছে গিয়েছিলেন, শেখ মুজিব নাকি তাঁদের বলেছিলেন, 'বিরোধী দলের তারা যদি ভোট না পায়, আমি কি বাক্স ভেঙে তাদের পক্ষে ভোট দেব।' যাদু মিয়াও আমাকে একই কথাই বলেছিল, 'অপজিশন আমরা ক্রিয়েট করব মানে?'

আমি বললাম, 'বিরোধী দলকে আসতে দিতে হবে, বলতে দিতে হবে।'

যাদু বলল, 'তারা যদি ভোট না পায়।'

আমি বললাম, 'ভোট তো তাঁরা পাবে যাদু মিয়া, তোমরা যদি ভোটারের ভোট কেড়ে না নাও।' তারা আমার এই কথাটা খুব সিরিয়াসলি নিয়েছিল, অ্যান্ড দে অ্যালাউড দ্য অপজিশন টু কাম।

কিছু কিছু লোক সত্যিকারভাবে নিজেদের জোরে এসেছিলেন আর কিছু কিছু জায়গায় ব্যাপারটা একটু অন্যভাবে ঘটেছিল। যেমন খান সবুর সাহেবের কথাই ধরুন। তিনি মুসলিম লীগার। এই মর্মে চুক্তি হয়েছিল যে তাঁকে তিন জায়গা থেকে পাস করিয়ে আনতে হবে। তাঁকে তিন জায়গা থেকেই পাস করিয়ে আনা হয়েছিল।

আমাদের রংপুরে মুসলিম লীগের কাজী আবদুল কাদেরের কথাই ধরা যাক। সেখানে বিএনপির মনোনয়ন পেয়েছিলেন যিনি, তিনিই আমাকে এসব কথা বলেছিলেন। বলেছিলেন, তাঁকে টাকা দেওয়া হয়নি। শুধু তা-ই নয়, তাঁর বিরুদ্ধে গভর্নমেন্ট অফিসাররা পর্যন্ত কাজ করেছেন। সবাই কাজ করেছেন কাজী কাদেরের পক্ষে।

আওয়ামী লীগের কিছু লোক নিজেদের শক্তির বলেই এসেছেন। কিছু কিছু লোককে পুলিশ রেকর্ড-টেকর্ড দেখে আনা হয়েছে। ফলে একটা উল্লেখযোগ্যসংখ্যক বিরোধীদলীয় সদস্যও সংসদে আসার সুযোগ পেয়েছেন। তাঁদের সংখ্যা ছিল ৮০ জনের মতো।

জিয়াউর রহমানের সময়কার ঘটনা এটা। আমার সঙ্গে তাঁদের কথা হয়েছিল। এটা তারই ফল। আমার সেই পরামর্শকে তাঁরা গুরুত্ব দিয়েছেন। ফলে সংসদে

বিরোধীরা এল। বিরোধীদের তাঁরা কোনোভাবেই আসতে দেওয়ার পথে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করেননি।

শেষের দিকে যেমনটা হয়েছিল, বিরোধীদের একেবারে আসতেই দেব না, কথা বলতেই দেব না। কেবল আমরাই কথা বলব। তেমন কিছু করার সত্যিই একটা সুযোগ ছিল। কিন্তু তেমন কিছু হলো না।

এবার যাদু মিয়ার মৃত্যু প্রসঙ্গে একটু কথা বলি।

আমি তার সঙ্গে অনেক দিন সম্পর্ক রাখিনি। তার মৃত্যুর আগের দিন সেদিন বৃহস্পতিবার ছিল, বাইজু অর্থাৎ ফরিদা হাসান আমাকে টেলিফোন করেছিল। তার পরদিন অর্থাৎ শুক্রবারে সে অসুস্থ হয়। বাইজু আমাকে টেলিফোন করে বলেছিল, 'ভাই, আপনি কি জানেন, যাদু ভাই ভীষণ অসুস্থ?'

আমি বললাম, 'না, আমি তো জানি না।'

বলল, 'খুবই অসুস্থ সে।'

তখন আমি আমার অফিসে ছিলাম। বাইজুকে বললাম, 'এখন তো আমি যেতে পারব না।' আমার সামনে একজন বসে ছিল, সে যাদু মিয়ার ওখানে যাতায়াত করত। তাকে বললাম, 'তুমি যাও তো, যাদু নাকি অসুস্থ। তাকে দেখে আসো।'

সে দেখে এসে বলল, 'কোথায় অসুস্থ! উনি তো খাওয়া-দাওয়া করছেন। তাঁর বাড়িতে গেস্ট আছে। উনি খাওয়া-দাওয়া করছেন বলে আমি আর ভেতরে যাইনি।'

আমার ছেলেকে বললাম, 'তুমি বিকেল চারটার দিকে একবার খোঁজ নিতে যেয়ো তোমার চাচা অসুস্থ কি না।' আমার ছেলে সেখানে গিয়ে দেখে যে সে ঘুমাচ্ছে। অনেকক্ষণ বসে ছিল। কথা হয়নি।

আমি শুক্রবার সকালবেলা অফিসে যাওয়ার সময় একটু তাড়াতাড়ি বেরোলাম এই ভেবে যে একটু যাদুর ওখানে হয়ে যাব। আমি যখন এলাম, তখন অলরেডি হি হ্যাড এ স্ট্রোক। তার মুখের বাঁ দিকটা বাঁকা হয়ে গেছে...। আমি তাঁর ছেলেকে জিজ্ঞেস করলাম, 'এটা কেমন করে হলো?'

সে জানাল, 'এটা হয়েছে সকালবেলায়। উনি খুব উত্তেজিত ছিলেন বলে ভেলিয়াম-টেলিয়াম কিছু খেয়েছিলেন। শুনেছি অনেক রাত পর্যন্ত বাইরে ছিলেন। সেখান থেকে ফিরে এই ভেলিয়াম খাওয়ার পরপরই হি হ্যাড দ্যাট স্ট্রোক।'

তখন আমি বললাম, 'যাদু মিয়াকে তুমি এভাবে রাখতে পারো না। তোমার বাবা হতে পারে সে। কিন্তু আসলে তো সে গভর্নমেন্টের লোক। সে তো সিনিয়র মিনিস্টার। হ্যাভ ইউ আসকড জিয়া, সে কী করতে চায়?' জিয়াউর রহমানকে টেলিফোন করা হলো।

জিয়াউর রহমান বললেন, 'আপনারা কিছু করবেন না। আমি পিজির ডাক্তার নুরুল ইসলাম সাহেবকে পাঠাচ্ছি।'

তার পরিবারের দিক থেকে আপত্তি ছিল ডা. নুরুল ইসলাম এবং পিজিতে পাঠানোর ব্যাপার নিয়ে।

আমি তখন বললাম, হলে পিজিতেই থরো ট্রিটমেন্ট হতে পারে।

ডা. নুরুল ইসলাম সাহেব এসে বললেন, এখনই নিয়ে যেতে হবে।

আমি বললাম, 'নিয়ে যাওয়ার আগে আপনি ওর ব্লাড ইত্যাদির পরীক্ষা করিয়ে নিন। আপনি প্যাথলজিস্ট পাঠান।'

তবে যাদুর পরিবারের দিক থেকে একটু আপত্তি আছে। আমি তাদের সঙ্গে কথা বলে ব্যাপারটা মীমাংসা করে দিই। আমরা শেষ পর্যন্ত ঠিক করলাম যে তাঁকে পিজিতেই পাঠানো হবে এবং পিজিতে যখন সে গেল, তখন বিকেল চারটার মতো। আমি যখন তাঁকে দেখি, তখন তাঁর অবস্থা খুব একটা ভালো দেখিনি। অর্থাৎ এখান থেকে সে ফিরে আসবে বলে আমার মনে হয়নি।

আই ফাউন্ড হিম ইন রিয়্যালি ব্যাড কন্ডিশন। আমি বাইরের রুমে বসা এবং আমার পাশে ছিল ফরিদা হাসান। ভেতরে আরও দু-একজন ছিল। আমি যাদুর দিকে তাকাতে পারছিলাম না। তাই বাইরে এসে বসে ছিলাম।

তারা বলল যে কোনো ওষুধই দেয়নি। শুধু স্যালাইন দিয়ে চলে গেছে। অ্যাকচুয়ালি পরে দুবার ডা. নুরুল ইসলাম সাহেবকে ডাকা হয়। একবার জবরদস্তি করে আনা হলো আর একবার উনি আসতে অস্বীকারই করে বসলেন, 'আমি যাব না, গিয়ে কোনো লাভ হবে না।' এ নিয়ে অনেকের একটু সন্দেহ ছিল। কিন্তু যে জিনিসটা আমি পরে জানতে পেরেছি, তা হলো এই যে যখন যাদু মিয়ার শেষ দশা, ঠিক তখনি গভর্নমেন্টের দিক থেকে খুব উৎসাহ দেখানো হতে লাগল—বাইরে থেকে চিকিৎসক আনা হোক।

আমাকে বলা হলো, পৃথিবীর যেখান থেকে বলেন, সেখান থেকে ডাক্তার আনা হবে। আমি এত কিংকর্তব্যবিমূঢ় (পাজলড) ছিলাম, কেবল বললাম, 'ডাক্তার এনে এখন আর কী হবে। এখন তো শেষ অবস্থা।'

যা-ই হোক, পাকিস্তান থেকে আমরা ডক্টর জুম্মাকে, দিল্লি থেকে একজন ব্রেন স্পেশালিস্ট আর কলকাতা থেকে একজন ব্রেন সার্জন—এই তিনজনকে আনালাম।

প্রথমে এলেন ডা. জুম্মা। তিনি এসেই একটা ইনজেকশনের কথা বললেন। ডা. নুরুল ইসলামকে লক্ষ করে তিনি বললেন, 'হ্যাভ ইউ পুশ দ্যাট ইনজেকশন?'

ডা. নুরুল ইসলাম আমতা আমতা করতে লাগলেন। তারপর জুম্মা তাঁকে বললেন, 'ইউ মিন টু সে দ্যাট ইউ হ্যাভ নট পুশড ইট। ডন'ট হ্যাভ ইউ হেয়ার?' ডা. নুরুল ইসলাম চুপ করে ছিলেন।

এসব কিছু যখন হচ্ছে, তখন আমি সেখানে ছিলাম না। যারা শুনেছে, তারা পরে আমাকে বলেছে। আমি নিজের কানে শুনিনি। ইন্ডিয়ান ডাক্তার এসেও

বলেছেন, যাদুর চিকিৎসা ঠিকঠাকমতোই হয়েছে।

এখন কথা হলো যে ওষুধটা কী? আমার মেয়ে ডাক্তার। দিন কয়েক আগে বাচ্চার মা হয়েছে। আমার স্ত্রীও ওখানে ছিল। এই খবর শুনে তারা ফিরে আসে। যাদু মিয়ার মৃতদেহ প্রথমে আমাদের গ্রামের বাড়ি নিয়ে যাওয়া হয়। চারটার সময় জানাজা পড়িয়ে সেদিনই আবার ঢাকায় নিয়ে আসা হয়। ওই দিনই তারা বিমান থেকে নামে। এয়ারপোর্টেই ছিল তারা। আমি যাদু মিয়ার লাশটাকে অ্যাসেমব্লি হাউসে নামিয়ে দিয়ে তাদের আনতে গিয়েছিলাম।

বাসায় গিয়ে আমি আমার মেয়েকে বললাম, 'তোমার চাচার মতো কোনো রোগী যদি তোমার কাছে যায়, তার একটা স্ট্রোক হয়েছে, তখন তোমরা সাধারণত কী করো? ধরো, তখন তুমি ইমারজেন্সিতে আছো। এ রকম একটা রোগী গেল, তখন তুমি কী করবে?'

আমাকে অবাক করে দিয়ে আমার মেয়ে বলেছিল, 'আমরা ওই ইনজেকশনটা দেব।'

আমি বললাম, 'কেন?'

মেয়ে বলল, 'ওই ইনজেকশনটা পুশ করা হবে এ জন্য যে স্ট্রোকটা হয়েছে ব্রেনে। অনেকগুলো সেল আছে তাতে। সেসবের একটাতে স্ট্রোক করেছে এবং রক্তক্ষরণ হচ্ছে। ইনজেকশনটা যদি স্ট্রোক করার সঙ্গে সঙ্গে পুশ করা হয়, তাহলে তা ছড়াতে পারে না। মস্তিষ্কের আর কোনো ধরনের ক্ষতি করতে পারে না। সবকিছু সীমিত করে ফেলে। তারপর অস্ত্রোপচার করে তাকে আবারও সচল করা যেতে পারে। আমি যতটুকু জেনেছি, তা হলো এই।'

ওই ইনজেকশনটা যাদুকে দেওয়া হয়নি। ডা. নুরুল ইসলামের মতো একজন বিজ্ঞ ডাক্তারের এটা ছিল একটা বিচ্যুতি। এ কথা আমি সত্যিই বিশ্বাস করতে পারি না। এই হলো সত্য। সার্বিক সত্য।

২১. সোহরাওয়ার্দী প্রসঙ্গ

এবার একটু প্রসঙ্গান্তরে যাই। তবে এটা আমার জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন কিছু নয়। চল্লিশের দশক থেকেই আমার সোহরাওয়ার্দী সাহেবের কাছাকাছি আসার সুযোগ হয়েছিল। তাঁর সঙ্গে পরিচিত হওয়ার আমি আগে দুই-একটা মিটিংয়ে তাঁর কথা শুনেছি বা গিয়েছি কিন্তু তাঁর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয় যখন ফজলুল হক সাহেবের শ্যামা-হক মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে অবিভক্ত বঙ্গব্যাপী যে আন্দোলন হয়, তাতে সোহরাওয়ার্দী সাহেবেরই সবচেয়ে বড় ভূমিকা ছিল। এবং তারই নেতৃত্বে আমরা দুটো উপনির্বাচনে অংশ নিয়েছিলাম এবং ওই দুটো নির্বাচনেই ফজলুল হক সাহেবের যে প্রার্থী ছিল, তাদের জামানত বাজেয়াপ্ত হয়েছিল।

একটা নির্বাচনী কেন্দ্র ছিল বালুরঘাটে, আর একটা নাটোর। ওই দুই নির্বাচনী এলাকায় আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ৩০ থেকে ৪০ জনের একটা দল নিয়ে কাজ করতে গিয়েছিলাম। ঠিক সে সময়ই তাঁর কাজ করার যে সাংঘাতিক ক্ষমতা, সেটা আমাকে রীতিমতো তাক লাগিয়ে দিয়েছিল। আমার বয়স তখন তাঁর অর্ধেকেরও কম। আমরা ১৬ ঘণ্টা, কখনো বা ১৮ ঘণ্টা তাঁর সঙ্গে ঘোড়ার গাড়িতে চেপে নির্বাচনী সফর করতাম। যেতে যেতে আমরা বলতাম, 'চলুন, আমরা এখানে নেমে যাই। সামনের ডাকবাংলোয় নেমে যাই।' কিন্তু উনি তাঁর ওই চাদরের খুঁটে রাখা ঝালমুড়ি খাচ্ছেন আর একইভাবে এগিয়ে যাচ্ছেন। করে চলেছেন নির্বাচনী সফরের কাজ। থামাথামি নেই। একনাগাড়ে ১৬ ঘণ্টা, ১৮ ঘণ্টা এই যে তাঁর অদ্ভুত কাজ করার ক্ষমতা, এটা আমাকে ভীষণভাবে আকৃষ্ট করেছিল এবং আমি মনে করি যে ১৯৪৬ সালে মুসলিম লীগের যে বিজয়, শুধু বিজয় না, এটাকেই পাকিস্তান কায়েমের মূল শক্তি জুগিয়েছিল, সেই বিজয়ের নেপথ্যে সবচেয়ে বেশি যদি কারও অবদান থেকে থাকে, তাহলে সেটা শহীদ সোহরাওয়ার্দীর। কিন্তু ইতিহাসের এটাই পরিহাস যে সেই শহীদ সোহরাওয়ার্দীকেই 'রানিং ডগস অব দ্য হিন্দুজ' বলে তখনকার পূর্ব পাকিস্তানে ঢুকতে দেওয়া হয়নি। বলতে গেলে এই সময়ই আমি আরও বেশি করে শহীদ সোহরাওয়ার্দীর প্রতি আকৃষ্ট হই। এবং তিনি ওই যে তাঁর বাড়িতে পেছনের দিকে খাটিয়ায় শুয়ে থাকতেন, ওখানে গিয়ে তাঁকে জাগিয়ে কথা বলার অধিকার আমার ছিল।

মাঝেমাঝেই আমি একটা ব্যাপারে ভাবতাম যে উনি আমার একটা ক্ষতি করেছেন। এখন অবশ্য আমি তেমন কিছু ভাবি না। ১৯৪৫ সালে আমাদের নীলফামারী নির্বাচনী এলাকায় একটা বাই ইলেকশন হয়। তাতে আমি প্রার্থী হই। কিন্তু শহীদ সোহরাওয়ার্দী সাহেব আমার প্রার্থিতার বিরোধিতা করেন এবং আমাকে নমিনেশন না দিয়ে স্যার এম রহমানকে নমিনেশন দেন। স্যার এম রহমান ছয় মাস পরে মারা যান এবং আমি ওই সময় খুব মনঃক্ষুণ্ন হয়ে, হতাশ হয়ে কলকাতায় চলে যাই। এক মাসের বেশি আমার এলাকার বাইরে থাকি। ইতিমধ্যে নির্বাচনে দাঁড়ানোর প্রয়োজনীয় কাগজপত্র জমা দিতে পারিনি বলে নির্বাচনী কর্তৃপক্ষ আমাকে আগামী পাঁচ বছর নির্বাচনে অযোগ্য ঘোষণা করে দেয়। তখন মনে হয়েছিল যে আমার একটা সাংঘাতিক ক্ষতি হয়ে গেল কিন্তু এখন মনে করি যে ক্ষতি হয়নি। কারণ, আমার সমসাময়িক যাঁরা মুসলিম লীগে ছিলেন, পলিটিক্যাল ফোর্স হিসেবে এখন আর তাঁদের কেউই বেঁচে নেই। আমি কিছু হতে পারিনি সত্যি কিন্তু তবু মনে করি, আমি এখনো রাজনৈতিকভাবে জীবিত। এখন আর মনে করি না যে এ কারণে আমার একটা ক্ষতি হয়েছে।

বস্তুত শহীদ সাহেব ছাড়া মুসলিম লীগের ১৯৪৬-এর যে বিজয়, সেটা সম্ভব হতো না। কিন্তু যখন প্রশ্ন উঠল যে পূর্ব পাকিস্তানের মুসলিম লীগের নেতা হবেন কে? সেখানে তিনি নির্বাচিত হতে পারলেন না। নির্বাচিত হলেন খাজা নাজিমুদ্দিন। এমনকি কলকাতা থেকে নারায়ণগঞ্জে এলে তাঁকে স্টিমার থেকে নামতে পর্যন্ত দেওয়া হয়নি। আমি খবরটা আগেই পেয়েছিলাম এবং একটা ফার্স্ট ক্লাসের টিকিট কিনে ওই স্টিমারে উঠে যাই। সোহরাওয়ার্দী সাহেব তাঁর কেবিনে ছিলেন। তাঁর পাশে যে রেস্তোরাঁ ছিল, আমি সেখানে গিয়ে বসি। একসময় তিনি কেবিন থেকে বেরিয়ে আসেন এবং রেস্তোরাঁয় আমাকে ওখানে বসে থাকতে দেখে রীতিমতো অবাক হয়ে যান।

বললেন, 'আরে মোখলেস, তুমি এখানে?'

আমি বললাম, 'স্যার, আপনাকে তো সবাই ছেড়েছে, আমি আপনার সঙ্গে না এসে আর পারলাম না।' আমার এ কথা শোনার পরপরই সোহরাওয়ার্দী সাহেবের চোখ দিয়ে তখন অঝোর ধারায় পানি গড়িয়ে পড়ছে।

দুজনে মিলে অনেক কথা বললাম। ১৯৪৬-এর উপনির্বাচনে আমাকে মনোনয়ন দিতে পারেননি বলে খুব দুঃখ প্রকাশ করলেন।

যা-ই হোক, আমি এটুকু বলতে চাই যে পাকিস্তান মুসলিম লীগে এবং বাংলাদেশের রাজনীতিতে শহীদ সোহরাওয়ার্দীর অবদান অতুলনীয়। এ রকম একজন মানুষকে নিগৃহীত হতে দেখে আমার সেদিন খুব খারাপ লেগেছিল। বলতে পারেন, এর প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ আমি তাঁর সঙ্গে চলে গিয়েছিলাম। আমার সঙ্গে যেমন ঘনিষ্ঠতা ছিল ফজলুর রহমান সাহেবের, তেমনি শহীদ সাহেবেরও। তাঁরা দুজনই ছিলেন ভিন্ন শিবিরের লোক। কিন্তু পরে তাঁরা আবার এক শিবিরে এসে মিলিত হয়েছিলেন।

ফজলুর রহমান সাহেব ১৯৪৬-এর নির্বাচনের পর শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মন্ত্রিসভায় যোগ দেন রাজস্ব ও জেলসংক্রান্ত মন্ত্রী হিসেবে। তবে '৪৭ সালে পার্টিশনের একটু আগেভাগে সোহরাওয়ার্দী-শরৎ বসু যুক্তবঙ্গের যে আন্দোলন হয়, সে ব্যাপারে আমি কিছু বলতে পারব না। আমার কোনো ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা নেই।

২২. মুক্তিযুদ্ধ—১৯৭১ পর্ব

আওয়ামী লীগের সঙ্গে যেসব ছাত্র-কর্মী বা যুবকর্মী ছিলেন, পঞ্চাশের দশকের গোড়ার থেকেই তাঁরা মোটামুটিভাবে মুক্তচিন্তার অধিকারী ছিলেন। তাঁরা পাকিস্তান, আমেরিকার সঙ্গে বা আমেরিকার পররাষ্ট্রনীতির সঙ্গে যুক্ত হোক, সেটা তাঁরা চাননি। কিন্তু শহীদ সাহেব প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পরপরই ঢাকায় এসে মার্কিন

পররাষ্ট্রনীতির সঙ্গে যুক্ত হওয়ার পক্ষে খুব জোর ওকালতি করার কারণ সম্পর্কে বলতে গেলে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে কিছু বলতে পারব না। তবে আমি অনুমান করতে পারি যে অমনটা করা না হলে ক্ষমতায় আসা যেত না।

এ দেশে যখন গণ-আন্দোলন হয় এবং যখন মুক্তিযুদ্ধ আরম্ভ হয়, তখন শাহ আজিজুর রহমানের যে ভূমিকা দেখা গেছে, সেটা চলমান গণ-আন্দোলনের পক্ষেও নয়, মুক্তিযুদ্ধের পক্ষেও নয়।

আটষট্টি থেকে একাত্তর সাল পর্যন্ত যাদু মিয়ার ভূমিকা সম্পর্কে বলতে গেলে বলতে হয় যে ইয়াহিয়ার সঙ্গে তাঁদের একটা সমঝোতা হয়েছিল। ইয়াহিয়া সেই সমঝোতার কথা ভুলে গিয়েছিলেন। পাত্তা দেননি। সে কারণে যাদু মিয়া রাগ করেছিল। সেই রাগ-অভিমান থেকে ইয়াহিয়ার বিরুদ্ধে কথা বললে ইয়াহিয়া তাকে জেলে ঢুকিয়ে দেন। জেল থেকে মুক্ত হওয়ার পর যাদু মিয়ার রাজনীতিটা আমার কাছে খুব স্পষ্ট ছিল না। তখন তার রাজনৈতিক নানা প্রশ্নে তাঁর সঙ্গে আমার মতপার্থক্য দেখা দেয়।

একাত্তর সালে তাঁর ভূমিকা কী ছিল, তাও জানি না। কিন্তু যখন মার্চের ওই গোলযোগটা আরম্ভ হলো, তখন আমি তাকে খোঁজ করে বের করি। কারণ, আমার একটা ভয় ছিল যে সে পাকিস্তানিদের হাতে পড়ে যেতে পারে এবং তাকে দিয়ে পাকিস্তানিরা অনেক কুকাজ করাতে পারে। সে জন্য আমি তাকে খুঁজে বের করি।

সে আত্মগোপন করেছিল। সেখান থেকে তাকে আমি খুঁজে বের করি। ওই সময় আমরা গুলশান হয়ে লোকজনকে পার করে দেওয়ার একটা ব্যবস্থা করেছিলাম। ওখান থেকেই অনেক বড় বড় লোককে পার করিয়ে দেওয়া হয়।

যা-ই হোক, আমি যাদু মিয়াকে গুলশানে নিয়ে আসি তাকে ওখান দিয়েই পার করিয়ে দেওয়ার জন্য। কিন্তু যেদিন বিকেলবেলা তাকে পাঠাব, সেদিনই গুলশান লেকের ওপারে, বাড্ডায় আর্মিরা চড়াও হয়। আমরা একটা বাড়ির ছাদ থেকে ব্যাপারটা দেখেছিলাম। আমি যখন যাদুকে বোঝাচ্ছি এই রাস্তা দিয়ে তুমি যাবে, ঠিক তখনই ওখানে গোলমালটা শুরু হলো। তাতে করে সে ভয় পেয়ে গিয়ে বলল, 'আপনাকে কথা দিচ্ছি, আমি যাব কিন্তু এই রাস্তা দিয়ে যাব না।' তারপর সে অন্য রাস্তা দিয়ে আরিচাঘাট হয়ে কলকাতায় যায় এবং সেখানে যাওয়ার পর আওয়ামী লীগ-ওয়ালাদের সঙ্গে তার বনিবনা হয়নি।

বস্তুত যাদু মিয়ার রাজনৈতিক ভূমিকা সম্পর্কে তাদের মনোভাব খুব একটা পরিষ্কার ছিল না। ওই সময় আমি যেহেতু কলকাতায় ছিলাম না, সে কারণে তার ভূমিকা সম্পর্কে আমি ঠিকঠাকমতো কিছু বলতে পারব না। তবে তার জীবনের ওপর আঘাত আসতে পারে—এ রকম একটা ভয় ছিল এবং সে ভয়ের জন্য যাদু মিয়া আবার দেশের ভেতরে ফিরে আসে এবং ফিরে এসে আমাদের

দেশের বাড়িতে গেলে পাকিস্তানি আর্মি আমাদের বাড়ির ওপর চড়াও হয়ে তা জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দেয়। তাতে অনেক লোকজন মারা যায় এবং যাদু মিয়াকে পাকিস্তানি সেনারা ওখান থেকে ধরে নিয়ে আসে। নিয়ে এসে তারা তাকে সৈয়দপুর সেনানিবাসে আটকে রেখেছিল বলে শুনেছি। এই সময় তারা তার কাছ থেকে একটা বিবৃতি লিখিয়ে নেয়। সেটা পরে নাকি রংপুর বেতার মারফত প্রচার করা হয়েছিল।

অবশ্য, এসবই আমার শোনা কথা। আমি সম্যক কিছু জানি না। এ ব্যাপারে তাকে জিজ্ঞাসাও করিনি। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭২ সালের দিকে যাদু মিয়া ঢাকায় আসে। আসার পর আওয়ামী লীগের অনেক নেতা-কর্মী শেখ মুজিবের ওপর যাদু মিয়াকে গ্রেপ্তার করার ব্যাপারে চাপ সৃষ্টি করতে শুরু করেন। যাদু মিয়া এবং শেখ মুজিব আসলে খুবই অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। ফার্স্ট ফ্রেইন্ড বলতে যা বোঝায়, তা-ই ছিলেন তাঁরা। এই সময় আমার কাছে একটা খবর এল (একজন দায়িত্বশীল নেতাই তিনি) আমাকে এসে জানালেন যে, তিনি শেখ সাহেবের ওখানে বসে ছিলেন। তখন কয়েকজন লোক শেখ সাহেবকে বলতে শোনেন যে, মশিউর রহমান তো এখন ঢাকাতেই আছেন। তাঁকে গ্রেপ্তার করা হোক। জবাবে শেখ সাহেব বলেছিলেন, 'আচ্ছা, সে হবে।' তিনি এ রকম কিছু কথা বলে তাঁদের তুলে দিলেন।

আমি যাদুকে এসে বললাম, 'তুমি ঢাকায় এসে বসে আছো কেন? তোমাকে নিয়ে তো এ ধরনের কথাবার্তা হচ্ছে। তুমি একটু সরে থাকো।' আমার এ কথা শোনার পর আমাকে অবাক করে দিয়ে সে সঙ্গে সঙ্গে টেলিফোন তুলে শেখ মুজিবের নাম্বারে ডায়াল করে। লাইন পেয়ে যেতেই সে শেখ মুজিবকে বলে, 'এই... তুই নাকি আমাকে অ্যারেস্ট করবি!'

ওদিক থেকে মুজিব কী বলেছিলেন, আমি জানি না, কিন্তু দুজনের মধ্যে খুবই হাসি-ঠাট্টা হয়েছিল সেদিন। যা-ই হোক, অনেক দিন পর্যন্ত শেখ মুজিব জানতেন যে যাদু মিয়া ঢাকায় আছে। কিন্তু দলের চাপ থাকা সত্ত্বেও তিনি তাকে গ্রেপ্তার করেননি।

পরে যাদু মিয়া যখন উত্তেজিত হয়ে এ রকমের একটা উক্তি নাকি করেছিল যে 'আমি কদিনের মধ্যেই এই সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করতে পারি,' কেবল তখনই তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। ১৯৭২ সালের কথা এসব।

প্রশ্ন উঠতে পারে, যাদু মিয়া তো জানতেন যে মুক্তিযুদ্ধে শাহ আজিজুর রহমানের কী ভূমিকা ছিল, তেমন একজন লোককে জিয়াউর রহমানের মন্ত্রিসভায় নিয়ে আসার জন্য তিনি উদ্যোগী হয়েছিলেন কেন? এমন প্রশ্নের জবাবে বলতে হয়, এটা অন্য কোনো কারণে নয়। সে জিয়াকে কথা দিয়েছিল বলেই শাহ

আজিজকে সেখানে ভিড়িয়েছিল। তার নিজেরও একটা ইচ্ছা বা আকঙ্ক্ষা ছিল। এ দুটো প্রত্যাশা পূরণ করতে গিয়েই তাদের আনতে হয়েছিল। বস্তুত জিয়াউর রহমানকে যাদু মিয়া এই বলে কথা দিয়েছিল যে মুসলিম লীগের তার পুরোনো বন্ধুদের জিয়ার দলে আনতে হবে এবং শাহ আজিজুর রহমান মুসলিম লীগের ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট ছিলেন বলেই তাঁর সাহায্য নিয়ে তাঁর সেই মুসলিম লীগারদের আনতে হয়েছিল। কাজটা করতে গিয়ে যাদু বিচার করেনি, কারা মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে আর বিপক্ষে কারা ছিল। আসলে যাদু মিয়া তার লক্ষ্য সাধন করতে চেয়েছিল।

২৩. ফজলুর রহমান/শেরে-বাংলা প্রসঙ্গ

একটু অপ্রাসঙ্গিক হলেও ফজলুর রহমান সাহেব সম্পর্কে, তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলো সম্পর্কে আমাকে একটু বলতে হবে।

আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার দু-এক বছর পর আমার মনে হয়, উনচল্লিশ সাল থেকে তাঁর সংস্পর্শে আসি। তখন তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের সদস্য এবং এই বিশ্ববিদ্যালয়েরই কনস্টিটিউয়েন্সি থেকে বেঙ্গল অ্যাসেমব্লিতেও সদস্য। সে সময় ঢাকায় একটা সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা চলছিল। মুসলিম স্বার্থ রক্ষায় সর্বতোভাবে তিনি কাজ করতেন। এর একটা উদাহরণ দিই—ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের যখন তিনি সদস্য, তখন মুসলমান শিক্ষক যারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরি পেয়েছিলেন, তাঁদের প্রত্যেকের চাকরি পাওয়ার পেছনে ফজলুর রহমান সাহেবের একটা অবদান ছিল। এবং এমনও দেখা গেছে যে একজন সুপিরিয়র অ্যান্ড বেটার কোয়ালিফিকেশনের হিন্দু ক্যান্ডিডেট আর লেসার কোয়ালিফিকেশনের একজন মুসলিম ক্যান্ডিডেট—এই দুজনের ভেতর থেকে মুসলমান ক্যান্ডিডেটটিকেই ফজলুর রহমান সাহেব অনেক সময় নিয়োগ দিতে পেরেছেন।

এর ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের এবং যাকে নিয়োগ দেওয়া হচ্ছে, উভয়ের সুনাম সে রকমভাবে রক্ষা না করা গেলেও তিনি মুসলমান ক্যান্ডিডেটকে নিযুক্ত করতে পেরেছেন। আমি মনে করি যে মুসলিম স্বার্থ রক্ষা করার জন্য যত রকমভাবে কাজ করা সম্ভব তিনি তার সবই করেছেন। এই সময়জুড়ে ফজলুর রহমান সাহেবকে আমি এভাবেই দেখেছি।

আমার রাজনীতিসম্পৃক্ত অভিজ্ঞতা সম্পর্কে আপনাদের আমি বলেছি। আমি একটা অসাম্প্রদায়িক মানুষ হলেও রংপুর কলেজে এসে শ্রীপদ্ম আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যাই। এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ফজলুর রহমানের মতো মানুষদের সংস্পর্শে এসে আমি মুসলিম লীগ এবং পাকিস্তানবাদের আদর্শে উজ্জীবিত হই। শুধু তা-ই নয়, তাঁদের সঙ্গে আমার পরিচয় শুধু নয়, বেশ অন্তরঙ্গ সম্পর্কও ছিল।

তাঁরা আমাকে খুবই স্নেহ করতেন। আমার নিজের দিক থেকে বলব যে আমি তাঁদের আমার অভিভাবক বলেই মনে করতাম। বিশেষ করে, ফজলুর রহমান সাহেব ও মওলা মামাকে। ফজলুর রহমান সাহেব মওলা মামার বাসাতেই থাকতেন এবং তাঁরা আমাকে খুবই স্নেহ করতেন। আমিও তাঁদের দ্বারা অনেক ব্যাপারে প্রভাবিত হয়েছি। আমি তো কোনো রাজনৈতিক দল বা গোষ্ঠীর সঙ্গে জড়িত না থাকলেও এই যে আমার রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করার ক্ষমতা কিংবা রাজনৈতিক চিন্তা করার ক্ষমতা, তার হাতেখড়ি তাঁদের কাছ থেকেই। কোনো সামাজিক কিংবা রাজনৈতিক ঘটনা বিশ্লেষণ করার পর একটা সিদ্ধান্ত টানার যে ক্ষমতা, এও আমার তাঁদের কাছ থেকেই পাওয়া।

বাঙালি স্বার্থ এবং মুসলিম স্বার্থ রক্ষা করার জন্য করাচিতে আমি ফজলুর রহমান সাহেবকে অনেক কিছু করতে দেখেছি। তাঁর আরবি হরফ প্রচলন করার ব্যাপারে যে কথা বলা হয়ে থাকে, তার মূলে ছিল তাঁর ঘোর পাকিস্তানি হওয়ার ব্যাপার। কায়েম হওয়া পাকিস্তান কী করে রক্ষা করা হবে, সেই লক্ষ্যে তাঁর একটা ভাবনা ছিল। এ জন্যই দু-একটা ক্ষেত্রে তাঁকে আপনারা মনে করতে পারেন যে বাঙালি স্বার্থ কিংবা বাংলা ভাষার প্রতি তাঁর সহানুভূতি ছিল না। কিন্তু তাঁর চরিত্রে সাংঘাতিক একটা জিনিস ছিল এবং সেটা বোধ হয় ভৌগোলিক কারণেই হয়েছিল।

আমাদের উত্তরবঙ্গে বাড়ি কিন্তু আমরা অতখানি চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে পারিনি। ফজলুর রহমান সাহেব অনেক উদ্ভট পরিস্থিতির চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে পারতেন। বুক চিতিয়ে দাঁড়াতেন। চর অঞ্চলের লোক ছিলেন তো, পদ্মার চরের লোক হিসেবে সাংঘাতিক একটা একরোখা মনোভাব ছিল তাঁর। এটা আমার মধ্যে নেই। আমি তাঁর মধ্যে আর একটি জিনিস দেখেছি যে পশ্চিম পাকিস্তানের মাটিতে দাঁড়িয়ে পাঞ্জাবিদের বিরুদ্ধে কথা বলার মতো বুকের পাটা আর কারোর ছিল না।

আমি একমাত্র ফজলুর রহমানের নাম করতে পারি, বাঙালিদের মধ্যে যতজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হয়েছিলেন, ফজলুর রহমান ছাড়া অন্য কেউ পাঞ্জাবিদের সামনে মুখ খুলতে পারেননি।

কোরীয় যুদ্ধের পর গোলাম মোহাম্মদ অর্থমন্ত্রী, তিনি চাচ্ছিলেন মুদ্রার অবমূল্যায়ন। ফজলুর রহমান সাহেব বলেছিলেন যে অবমূল্যায়ন নয়। এ কারণে গোলাম মোহাম্মদ ও ফজলুর রহমানের মধ্যে একটা তিক্ত সম্পর্ক চলছিল।

ফজলুর রহমান সাহেবের যুক্তিটা ছিল এ রকমের যে আমরা হচ্ছি প্রাথমিক কমোডিটির রপ্তানিকারক, মুদ্রার অবমূল্যায়ন করে আমাদের কোনো লাভ হবে না এবং গোলাম মোহাম্মদ অর্থমন্ত্রী হয়ে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি অবিচার করছিলেন বলে আমি ফজলুর রহমান সাহেবের বাড়িতে তাঁর প্রণীত বাজেটের ওপরে কাট

মোশান দেখেছি এবং দ্যাট কাট মোশান প্রস্তাব করেছিলেন নুরুল আমিন।

সেই কাট মোশানটা নেওয়ার সময় লিয়াকত আলী খান বলেছিলেন, 'মোশানটা আসতে পারবে না, আমরা সংসদের বাইরে ব্যাপারটার মীমাংসা করব।' এগুলো আমি করতে দেখেছি। কাজেই বাঙালি স্বার্থ তিনি জলাঞ্জলি দিয়েছেন—ভাষার প্রশ্নে তাঁর ভূমিকার বিচারে সে কথা আপনারা বলতে পারেন। সংস্কৃতি বা কালচারের প্রশ্নে তাঁর ভূমিকার বিচারে এ কথা হয়তো বলতে পারেন, কিন্তু তিনি মূলত বাঙালি ছিলেন এবং বাংলা ভাষা তাঁর নিজেরও ভাষা ছিল কিন্তু তিনি ছিলেন এই পাকিস্তান রক্ষা করা এবং পাকিস্তানের অখণ্ডত্ব রক্ষা করার জন্য নিবেদিতপ্রাণ একজন। এ জন্যই তাঁর সম্পর্কে অনেক সময় অনেকের এ রকমের একটা ধারণা হতে পারে। কিন্তু আমি মনে করি যে তিনি একজন বাঙালি ছিলেন এবং বাঙালি স্বার্থ জলাঞ্জলি দেননি।

আরেকটা জিনিস বলব যে ফজলুর রহমান সাহেব সবকিছু সত্ত্বেও এই যে ফাতেমা জিন্নাহ যে প্রার্থী হয়েছিলেন আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে, এ জন্য একজনই দায়ী ছিলেন, তিনি ফজলুর রহমান। কারণ, আইয়ুব খান যখনই তাঁর সংবিধানটা গ্রহণ করলেন, তখন থেকেই ফজলুর রহমানরা জানতেন যে আইয়ুব প্রেসিডেন্ট হওয়ার জন্য নির্বাচনটা করবেনই।

২৪. ফাতেমা জিন্নাহর রাষ্ট্রপতি পদে প্রার্থিতা

ফজলুর রহমান সাহেব তখন করাচি থেকে ঢাকায় এসে বসবাস করতে শুরু করেছেন। কিন্তু তিনি কেবল নিজে থাকেন। তাঁর পরিবারের সদস্যরা থাকে করাচিতেই। সেবার তিনি এখানে এলে আমি একদিন তাঁর সঙ্গে এমনিই দেখা করতে যাই। আমি তাঁর সঙ্গে রাজনীতি না করলেও সামাজিক সম্পর্ক রাখতাম। ঈদের আগেই তিনি চলে যাবেন বলে আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলাম।

আমি বললাম, 'আপনি যে যাচ্ছেন, কদিন পরে আসবেন?'

আমাকে বললেন, 'বলো তো, এই আইয়ুবের বিরুদ্ধে কাকে প্রার্থী হিসেবে দাঁড় করানো যায়?'

আমি বললাম, 'প্রার্থী তো আপনার জানাশোনার মধ্যেই আছে।' কথাটা আমি হঠাৎ করেই বলে ফেললাম।

শুনে বললেন, 'কে আছে আমার জানাশোনার মধ্যে?'

আমি বললাম, 'ফাতেমা জিন্নাহ।'

বললেন, 'বলো কী, ফাতেমা জিন্নাহ!'

আমি বললাম, 'হ্যাঁ, তিনিই একমাত্র প্রার্থী হতে পারেন।'

তিনি বললেন, 'আসবে না।'

বললাম, 'তাঁকে একটা কথা বলেন যে আপনি কি আপনার ভাইয়ের মতো কেবল বিবৃতি দিয়েই দায়িত্ব শেষ করবেন, না পাকিস্তান কী পর্যায়ে আছে, সে ব্যাপারে আপনার কি কোনো দরদ-টরদ কিছু নেই? আর যদি দরদ থাকেই, তাহলে আপনাকে কিছু করতে হবে।'

তিনি বললেন, 'ঠিক আছে, যাই।'

ঈদের নামাজ পড়ার পর তিনি ফাতেমা জিন্নাহর সঙ্গে দেখা করেন।

দেখা করে এসব কথা তাঁকে বললেন। প্রথমবার কোনো ধরনের সাড়া দেননি। তারপর যখন কোরবানির ঈদে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলেন, তখন আবার কথাটা বললেন।

ফাতেমা জিন্নাহ তখন বলেছিলেন, 'তুমি এসব কী বলছ ফজলুর রহমান?'

ফজলুর রহমান সাহেব তখন একটু সাহস সঞ্চয় করে বললেন, 'এ দেশকে বাঁচানোর জন্য আপনাকে তো আরও একটু সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হবে।'

সেবারও ওই পর্যন্তই কথা হয়েছিল। এরপর উনি আরও দু-তিনবার তাঁর সঙ্গে দেখা করেন। শেষ পর্যন্ত তিনি ফাতেমা জিন্নাহকে রাজিই করিয়ে ফেললেন।

অ্যাবডিকেশন অব আইয়ুব খান বাই আলতাফ গওহর শিরোনামে একটা বই আছে, ওই বইয়ে লেখা একটা কথার জন্য আমি তার উল্লেখ করছি। সেখানে আলতাফ গওহর লিখেছিলেন, 'ফাতেমা জিন্নাহ যে প্রার্থী হবেন, আমরা সেটা জানতেই পারিনি, দিস ওয়াজ অ্যা সারপ্রাইজ টু দেয়ার ক্যাম্প।'

আসলে ব্যাপারটাকে চূড়ান্তভাবে গোপন রাখা হয়েছিল। একেবারে শেষ মুহূর্তে তা প্রকাশ করা হয়েছিল। তারপর তো যে সাড়া বা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছিল, সেটা তো আপনারা চোখের সামনেই দেখেছেন এবং ওখানে মানে পশ্চিম পাকিস্তানে কালারাগের নওয়াব ছাড়া আইয়ুবকে আর কেউ বাঁচাতে পারত না। তিনি পশ্চিম পাকিস্তানে কোনো ভোটই দিতে দেননি। সেখানে তিনি আইয়ুবের পক্ষে যাতে ভোট পড়ে, সে লক্ষ্যে জোরজবরদস্তি করেছেন।

এখানে এমন একটা ঘটনার কথা আমি বলতে চাই, যেটা কেউ জানতেন না। অথচ আমিও তখন ওই ব্যাপারটা নিয়ে খুবই খাটাখাটনি করছিলাম। ফজলুর রহমান সাহেবও খাটছিলেন। কিন্তু, আমি তখন শুনেছিলাম যে মুসলিম লীগের মধ্যে কিছু কিছু লোক ভেতরে ভেতরে একটা ছায়া মন্ত্রিসভা তৈরি করে ফেলেছিলেন। কারণ, তাঁরা স্থির ছিলেন যে ফাতেমা জিন্নাহ জিতে যাবেন এবং তিনি জিতে গেলে যে ছায়া মন্ত্রিসভা গঠন করেছিলেন, সে সংক্রান্ত খবরটা প্রকাশ হয়ে পড়েছিল। এর মধ্যে মওলানা ভাসানীকে আনা হয়েছিল, আওয়ামী লীগকেও আনা হয়েছিল; কিন্তু তাঁদের মধ্যে সব সময় একটা দ্বিধা ছিল যে ফাতেমা জিন্নাহ নির্বাচনে জিতলে মুসলিম লীগকে আবার পুনরুজ্জীবিত করা হবে না তো? এ

কারণেই তাঁরা ইতস্তত করতে লাগলেন। কিন্তু যখন তাঁরা এটা জানলেন যে তলে তলে একটা ছায়া মন্ত্রিসভা গঠন করা হয়ে গেছে, তখন তাঁরা পরিষ্কার জানিয়ে দিলেন যে যা হতে চলেছে, তা মুসলিম লীগের পুনরুজ্জীবন ঘটাবে, যে মুসলিম লীগকে আমরা ১৯৫৪ সালে পরাজিত করেছিলাম। ফলে ভাসানী এবং আওয়ামী লীগ পিছিয়ে গেল।

২৫. ইত্তেফাক প্রসঙ্গ

আরেকটা ঘটনার কথা উল্লেখ না করলেই নয়। এই সময়ই আইয়ুব খান চিঠি লিখে মওলানা সাহেবকে জানালেন যে 'আমি একটা কাজ করতে চাই। *ইত্তেফাক* তো আসলে আপনারই কাগজ ছিল। পত্রিকাটিকে আবার আমি আপনার কাছে ফেরত দিতে চাই। আপনি ওটা নিয়ে নেন।' মওলানা সাহেব আমাকে বললেন, 'এর একটা জবাব দিয়ে দাও।'

আমি বললাম, 'আপনি বলেন, জবাবে কী লিখতে হবে?'

মওলানা সাহেব বললেন, 'দেখ, *ইত্তেফাক* পত্রিকার আমিই প্রতিষ্ঠাতা ছিলাম। কিন্তু পত্রিকাটির যা কিছু উন্নতি, সেটা তো আর আমি করিনি। সে কাজটা করেছেন মানিক মিয়া[১৭] এবং অন্যরা। আজকে *ইত্তেফাক* দৈনিক পত্রিকা এবং তার গ্রাহকসংখ্যাও অনেক। বেশ ভালো কাগজ হিসেবেও প্রতিষ্ঠিত। আমি তো আর কাগজ পরিচালনা করি না, এখন আর ওটা আমার ফিরে পাওয়ার কোনো অধিকার নেই। তা ছাড়া আমি নিতেও চাই না। বর্তমানে যারা আছে, তারাই চালাক। তারা পত্রিকাটিকে কোনো দিন দেশের স্বার্থের বিরুদ্ধে ব্যবহার করবে না বলে আমি আশা করি। নিজেদের একান্ত স্বার্থে ব্যবহার করবে না বলেও আমি আশা করি। কাজেই যেভাবে চলছে, তাতেই আমি সন্তুষ্ট। ওসবের মধ্যে আমি আর ফিরে যেতে চাই না।'

মওলানা সাহেবের আরেকটা গুণের কথা বলতে চাই। সেটা হলো, খবরের কাগজের প্রতি তাঁর একটা বড় দুর্বলতা ছিল। তিনি এটা বিশ্বাস করতেন যে সংবাদপত্র ছাড়া রাজনৈতিক বা অন্যান্য মতবাদ প্রচার করা এবং দেশে একটা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করা সম্ভব নয়। তিনি 'ন্যাপ' গঠন করার পরপরই একদিন আমাকে অনেক রাতে ডেকে আমার হাতে সাত হাজার টাকা তুলে দিয়ে বললেন, 'তুমি একটা কাগজ বের করো।'

আমি বললাম, 'আমার তো কাগজ বের করার কোনো অভিজ্ঞতা নেই। আমি এই টাকা দিয়ে কী করব? তা ছাড়া এ টাকা আপনি পেলেন কোত্থেকে?'

বললেন, 'টাকাটা আমি তোমাকে দিচ্ছি। তোমার কাছে রাখো। একটা পত্রিকা বের করতে হবে। তার প্রারম্ভিক কিছু খরচাপাতি লাগবে। এই টাকাটা সেই কাজে লাগিয়ো।'

যা-ই হোক, এ কথা শোনার পর আমি মওলানাকে বললাম, 'তা কাগজের নাম কী হবে? আপনি যদি একটু এ ব্যাপারে বলেন!'

কাজী নজরুল ইসলাম সম্পর্কে তাঁর ধারণা ছিল খুবই ভালো। সেই সূত্র ধরেই বললেন, 'এক কাজ কর, নজরুল ইসলামের একটা কাগজ ছিল না *ধূমকেতু* নামে। ওই নামেই তুমি একটা কাগজ বের করো।'

আমি বললাম, *ধূমকেতু* তো ধূমকেতুর মতোই উদয় হয়েছিল এবং একইভাবে সে অস্ত গিয়েছিল।

বললেন, 'তোমারটারও দশা একই রকম হতে পারে। তুমি ওই নামেই চালাও। নাম দাও *ধূমকেতু*।' শেষমেশ ঠিক করা হলো, *ধূমকেতু* নামে একটা পাক্ষিক অথবা সাপ্তাহিক কাগজ প্রকাশ করা হবে। তারই প্রাথমিক খরচাপাতি চালানোর জন্য তিনি আমাকে এই সাত হাজার টাকা দিলেন।

ধারণা করলাম, টাকাটা তিনি সিতারউদ্দিনের কাছ থেকে পেয়েছেন। সেই টাকাই তিনি তুলে দিয়েছেন আমার হাতে। তা-ই দিয়ে প্রারম্ভিক খরচপাতি করে আমরা *ধূমকেতু* বের করলাম। পত্রিকাটির সম্পাদক ছিলেন কাজী মো. ইদ্রিস। আনোয়ার জাহিদ ও গোলাম মাওলাও এর সঙ্গে জড়িত ছিলেন। 'ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি'র রাজনীতির পেছনে যে দর্শন ছিল, রাজনৈতিক দর্শন; তারই প্রতিফলন ঘটানো হতো এই পত্রিকার মাধ্যমে। এটা একটা মতবাদসর্বস্ব কাগজ ছিল। কোনো সংবাদপত্রের চরিত্র ছিল না *ধূমকেতুর*। এর মধ্যে কিছু কিছু লেখা এবং কার্টুন বেশ জনপ্রিয় হয়েছিল। ১৯৫৮ সালে মার্শাল ল হওয়ায় পত্রিকাটা আর চালানো যায়নি। কাজেই আপনাআপনি ওটাকে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল।

সাধারণ মানুষের লোক বলে পরিচিত হওয়ার একটা বাসনা পৃথিবীর প্রায় সব বড় মানুষেরই ছিল। রবীন্দ্রনাথ এ জন্য তাঁর এক কবিতায় লিখেছিলেন, 'মোর নাম এই বলে খ্যাত হোক/ আমি তোমাদেরই লোক'।

মওলানা ভাসানীর কিন্তু কষ্ট করে 'আমি তোমাদেরই লোক' বলে পরিচয় দেওয়ার কিছুই ছিল না। কেননা, ওনার সাধারণ লোকের ঘরেই জন্ম। সাধারণ লোকের স্বার্থের জন্যই কাজ করে গেছেন এবং সাধারণ মানুষের নেতা বলেই সাধারণ মানুষ তাঁকে গ্রহণ করেছিল। মাঝেমধ্যে তিনি কোমর একটু-আধটু দুলিয়েছিলেন বটে কিন্তু মাথার কলসিটা ঠিকই ছিল। অর্থাৎ তিনি সাধারণ মানুষের স্বার্থের বিরুদ্ধে কোনো দিন কোনো কাজ করেননি।

একেবারেই সাধারণ মানুষ ছিলেন তিনি। তাঁকে ঢাকায় এবং তাঁর কাগমারি অথবা তাঁর পাঁচবিবির বাড়িতে দেখেছি যে হাজার হাজার লোক তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসত। উনি তাদের পীরও ছিলেন।

মওলানা ভাসানী বাংলা এবং উর্দু দুটো ভাষাই জানতেন। এবং দুটো ভাষাতেই ভালো বক্তব্য দিতে পারতেন। আমি তাঁকে করাচিতে এবং অন্য নানা জায়গায় অবাঙালি শ্রোতাদের মধ্যে বক্তব্য দিতে শুনেছি। সেখানেও তারা, মানে সাধারণ মানুষজন তাঁর বক্তব্য অনেক আগ্রহের সঙ্গে শুনেছে। মওলানা ভাসানীকে তারা তাদের লোক বলেই গ্রহণ করেছে।

বাংলাদেশের কোনো নেতাকে আমি এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার জনগণের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করতে এর আগে শুনিনি।

কিন্তু মওলানা ভাসানী একমাত্র নেতা, যিনি আমাদের রাজনীতিতে একটা নতুন মাত্রা যোগ করলেন। তিনি বড় বড় মিটিংয়ে, পাকিস্তান, ইন্ডিয়া, এশিয়া, আফ্রিকা, ল্যাটিন আমেরিকার জনগণের আন্দোলনের সঙ্গে জোরালো ভাষায় একাত্মতা ঘোষণা করতেন।

শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের জীবনীতে একটা গল্পের উল্লেখ আছে। গল্পটা এ রকমের: একদিন তাঁর এক ভক্ত এসে বিবেকানন্দ সম্পর্কে অভিযোগ করে বললেন যে তিনি এমন কিছু কাজ করে থাকেন যেটা তাঁর করা উচিত নয়। শ্রী রামকৃষ্ণও বললেন, না, ও ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু অভিযোগকারী সেই ব্যক্তি কয়েকবারই এসে একই রকমের অভিযোগ করতে লাগলেন। ঠিক এই ঘটনার মুখে শ্রী রামকৃষ্ণ যে গল্পটা বলে শোনালেন, সেটা এ রকমের: গ্রামের কুয়ো থেকে জল আনতে যায় গ্রামের যুবতী তরুণীরা, তখন আশপাশের ছেলে-ছোকড়াও যায় তার সঙ্গে সঙ্গে। তারা শিস ইত্যাদি বাজিয়ে তাদের উত্ত্যক্ত করে, হাসিঠাট্টাও করে। তারপর সবাই জলটল নিয়ে কলসি মাথায় নিয়ে ফিরতে থাকে বাড়িমুখো। ছেলেরা আগের মতোই শিস বাজায়। আর মেয়েরাও কোমর দোলায়। কিন্তু কোনো দিন কি তাদের মাথা থেকে কলসি পড়ে যায়? পড়ে না। বিবেকানন্দও এমনই। তিনি যদি এদিক-ওদিক করেনও, তিনি আমার কাজ ঠিক ঠিকই করে যাবেন। চিন্তার কোনো কারণ নেই।

মওলানা ভাসানীও তেমনি মাঝেমধ্যে একটু কোমর দুলিয়েছিলেন সত্য; কিন্তু সাধারণ মানুষের স্বার্থের জন্য তিনি সারা জীবনই লড়াই করেছেন। তাদের স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে তিনি কোনো দিন কিছু করেননি।

মওলানা ভাসানীর যে ব্যাপক পরিচিতি, সাধারণ মানুষের বন্ধু বলে তাঁর যে খ্যাতি কিংবা তিনি নিজেও সাধারণ লোক বলে সাধারণ মানুষজনও তাঁকে তাদের নিজেদের লোক বলে ভাবে—এই যে তাঁর একটা গুণ অথবা এই যে তাঁর জনপ্রিয়তা, তাঁকে সাংগঠনিকভাবে কাজে লাগাতে ব্যর্থ হয় ন্যাপ।

সেই ব্যর্থতার কারণে মওলানা ভাসানীও পরের দিকে খুবই হতাশ হয়ে পড়েছিলেন। আসলে এনএপি বা ন্যাপ-এর মধ্যে দুটো ভাগ ছিল। এক ভাগে

ছিল বামপন্থী। অর্থাৎ লোকজন যাদের কমিউনিস্ট বলে জানত। তাদের সংখ্যাই ছিল ন্যাপে বেশি। আরেকটা গ্রুপ ছিল ডানপন্থী। বামপন্থীদের নেতৃত্ব দিত কমিউনিস্টরা এবং ডানপন্থীদের নেতৃত্ব দিতেন মাহমুদ আলী এবং অন্যরা। মওলানা ভাসানী এই দুটো গ্রুপের মধ্যে একটা ভারসাম্য রক্ষা করে চলতেন এবং মনে করতেন যে কমিউনিস্টদের যে সাংগঠনিক দক্ষতা এবং জনগণের স্বার্থে কাজ করার লক্ষ্যে তাঁদের নিজেদের উৎসর্গ করার যে মনোভাব, তিনি তাঁর সমাজতন্ত্রের লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার ক্ষেত্রে এটাকে একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার বলে মনে করতেন। কিন্তু পরে এ ব্যাপারে তাঁর ভয়ানক মোহভঙ্গ ঘটেছিল।

আরেকটা কারণে তার মোহভঙ্গ হয়েছিল ঠিক তখন, যখন মস্কো কমিউনিস্ট পার্টির চীনের পার্টির মধ্যকার নীতিগত বিরোধের জের ধরে এখানেও কমিউনিস্টরা বিরোধ ও বিভেদে জড়িয়ে পড়ে। তারা একত্রে আর কাজ করতে পারল না। সংক্ষেপে বলতে গেলে বলতে হয়, মওলানা ভাসানী তাঁর সমাজতন্ত্রের লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য কমিউনিস্টদের যেভাবে ব্যবহার করবেন বলে ঠিক করেছিলেন, তেমনটা না হওয়ায় তিনি সত্যি সত্যি হতাশ হয়েছিলেন। ঠিক এই একই কারণে পরে তিনি কমিউনিস্টদের সংস্রব প্রায় ত্যাগ করেছিলেন। ত্যাগ করে তিনি আবার তাঁর ওই প্রাথমিক জীবনের ধর্মীয় রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের মধ্যে চলে গিয়েছিলেন। অর্থাৎ আবার সেই ইসলাম পন্থার অনুসারী রাজনীতি শুরু করলেন। পরের দিকে আমার মনে হয়েছিল তিনি ইসলামিক সোশ্যালিজম বা ইসলামিক সমাজতন্ত্র কায়েম করার কথাও বোধ হয় বলতে শুরু করেছিলেন। ফলে এ কথা সম্ভবত বলা যায় যে যাঁরা তাঁর সঙ্গে কাজ করতেন, তাঁদের ব্যর্থতার কারণেই, তাঁদের মধ্যকার চরম বিভেদের কারণেই মওলানা ভাসানী আবার এসব কিছুর মধ্যে চলে গিয়েছিলেন।

মওলানার বিশাল সব সম্মেলন, ন্যাপের সম্মেলন, কৃষক সম্মেলন—এ-জাতীয় সব সম্মেলনে প্রচুর লোকসমাগম হতো। যেসব লোক আসত, তাদের আবার রাজনৈতিকভাবে ঐক্যবদ্ধ করে তাদের একটা কাজের মধ্যে নিয়ে আসার যে ব্যাপারটা, সেই কাজটা মওলানা করতে পারতেন না। এই লোকগুলোকে তিনি যে ন্যাপে ডেকে আনলেন কিংবা তাঁর কর্মীদের মধ্যে নিয়ে এলেন, তাদের সংগঠিত করে একটা রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে ব্যবহার করতে না পারা একটা বিরাট ব্যর্থতার ব্যাপার।

মওলানা ভাসানী নিজে কোনো দিন এভাবে সংগঠন করতে পারেননি, অন্তত আমি যখন থেকে তাঁকে জানতাম, তত দিন পর্যন্ত পারেননি। তিনি সংগঠন করতেন না, সে ক্ষমতাও তাঁর ছিল না। দেখেছি, তিনি বিশাল সব কৃষক সম্মেলন

ডাকছেন—পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সব বড় বড় নেতা তাতে যোগ দিলেন, লাখ লাখ লোকসমাগম হলো। কিন্তু তিনি কেন ডাক দিয়েছেন, সে ব্যাপারে কোনো স্পষ্ট বক্তব্য নেই। তাঁরা এসেছেন মওলানা সাহেব ডেকেছেন বলে। সাধারণ মানুষজন এসেছেন তাঁদের 'পীর' বা 'হুজুর' ডেকেছেন বলে। কেন তাঁরা যোগ দিলেন, কৃষক সমিতির উদ্দেশ্যটা কী, তাঁদের কেন ডাকা হলো—বলার আগেই তাঁর গলা ভেঙে গেল, তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন। আর তাঁর দলভুক্ত নেতা-কর্মীরা, কৃষক ও শ্রমিক ফ্রন্টের নেতা-কর্মীরাও রাজনৈতিকভাবে এসব কিছুকে যথাযথ কাজে লাগাতে পারলেন না। আর তেমনটা না করতে পারার জন্য শেষ পর্যন্ত দেখা গেল যে এত বড় একটা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হওয়ার পরও তার কোনো প্রভাব পড়ল না। এটা একটা মস্ত বড় ব্যর্থতা। এটা কেবল তাঁর নিজের ব্যর্থতা নয়, তাঁর দলভুক্ত অন্যান্য ফ্রন্টের নেতা-কর্মীর পাশাপাশি অন্য আর যাঁরা এসবের সঙ্গে জড়িত ছিলেন, তাঁদেরও ব্যর্থতা।

জনগণের অভাব-অভিযোগ সাম্প্রতিক কালে অনেক বেড়েছে। লোকজন কথায় কথায় বলে থাকে যে, মওলানা ভাসানীর মতো কেউ যদি থাকত, তাহলে এখন আমাদের এমন দুর্দশা হতো না। যখনই জনসাধারণের তরফ থেকে কোনো ধরনের অভিযোগ উঠেছে, তার দুর্ভোগের শিকার হয়েছে, তখনই তার প্রতিকারের আশায় তারা ভাসানী সাহেবের কাছে ছুটে গেছে। এ রকমটা যখনই হয়েছে মওলানা সাহেব সঙ্গে সঙ্গে সংবাদপত্রে একটা বিবৃতি দিয়ে দিতেন। সেই বিবৃতি ছাপানোর সঙ্গে সঙ্গেই যারা দেশের কর্তা ছিলেন, তাঁদের টনক নড়ে যেত। তাঁরা দ্রুতই মওলানার উত্থাপিত সমস্যাগুলোর সমাধানে তৎপর হতেন।

এমনও দেখা গেছে, সাধারণ মানুষ তাদের দাবি জানাতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে যাওয়ার উদ্যোগ নিয়ে পথে নামলেই মওলানা সাহেবও তাদের কাতারে শামিল হতেন। তিনি এ ধরনের কোনো মিছিল বা সমাবেশে গেলে, ফলাও করে সেটা প্রচারও করা হতো। মানুষ জানত, কেন মওলানা ভাসানী পথে নেমেছেন সাধারণ মানুষকে তাঁর সঙ্গী করে।

আজকে এত অভাব-অভিযোগের পর মানুষ কাউকে তাদের পাশে পায় না। মওলানা ভাসানীর অবর্তমানে একটা রাজনৈতিক শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে। আজকে মানুষ জানে না কার কাছে গেলে তাদের অভাব-অভিযোগের প্রতিকার হবে। আজকে মওলানা ভাসানীর সম্পর্কে অনেক কথা বলা যায়, তাঁর সমালোচনাও করা যায়। কিন্তু এ কথা নিশ্চিত করেই বলা যায় যে মওলানা ভাসানী বজ্রকণ্ঠে যে প্রতিবাদ করতেন, সেই প্রতিবাদে শাসনকর্তাদের আসন টলে উঠত। এই একজন মানুষের অভাব, দেশের সাধারণ মানুষ হাড়ে হাড়ে অনুভব করছে। এই

অভাব যে কোনো দিন পূরণ হবে, এমন কোনো আশার আলো আমরা দেখছি না। দেশে যে শুধু রাজনৈতিক শূন্যতাই আছে, তা নয়, নেতা ও নেতৃত্বেরও শূন্যতা আছে। মওলানা ভাসানীর মৃত্যুর পর নেতৃত্বের যে শূন্যতা, সেটা পূরণ হবে বলে মনে হয় না।

টিকা

১. তেভাগা আন্দোলন বাংলার ইতিহাসের একটি কৃষক আন্দোলন। ১৯৪৬ সালে বাংলার রংপুর, দিনাজপুর, ময়মনসিংহসহ উত্তরবঙ্গে এ কৃষক আন্দোলন গড়ে উঠেছিল। তেভাগা আন্দোলনের মূল দাবি ছিল উৎপন্ন ফসলের তিন ভাগের দুই ভাগ পাবেন চাষি এবং এক ভাগ পাবেন মালিক। তেভাগা আন্দোলনের মূল দাবি ছিল 'জান দেব তবু ধান দেব না'।

২. ফজলুর রহমান (১৯০৫-১৯৬৬) একজন রাজনীতিবিদ। ১৯৩৩ সালে মুসলিম লীগের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করে ১৯৩৭ সালে প্রথমবারের মতো এবং ১৯৪৬ সালে দ্বিতীয়বারের মতো ঢাকা শহর থেকে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৪৩ সালে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার চিফ হুইপ ও ১৯৪৬ সালে বঙ্গীয় সরকারের রাজস্ব মন্ত্রী নিযুক্ত হন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর লিয়াকত আলী খানের নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষা, বাণিজ্য ও শরণার্থী পুনর্বাসন, খাজা নাজিমুদ্দিনের নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষা ও বাণিজ্য ও আই আই চুন্দ্রীগড়ের নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকারের বাণিজ্য, অর্থ ও আইনবিষয়ক মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এ ছাড়া তিনি পূর্ববঙ্গ পরিষদের নির্বাচিত সদস্য, পাকিস্তান দ্বিতীয় গণপরিষদের সদস্য, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্য, বঙ্গীয় রয়েল এশিয়াটিক সোসাইটির সদস্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্য, নিখিল ভারত মুসলিম লীগের ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য, নিখিল পাকিস্তান মুসলিম লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য এবং পাকিস্তান হিস্টোরিক্যাল সোসাইটির প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। পাকিস্তান আন্দোলনে তার অবদান উল্লেখযোগ্য। উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার এবং আরবি হরফে বাংলা লেখার অন্যতম প্রবক্তা।

৩. ভারতের শাসনতান্ত্রিক সমস্যার সমাধান এবং ভবিষ্যৎ সংবিধান রচনার ব্যাপারে ভারতীয় নেতাদের সঙ্গে আলোচনার জন্য ব্রিটিশ মন্ত্রিসভার সদস্য স্যার স্টাফোর্ড ক্রিপসের নেতৃত্বে ভারত সচিব লর্ড প্যাথিক লরেন্স ও নৌ-প্রধান আলেকজান্ডারকে নিয়ে তিন সদস্যের যে প্রতিনিধিদল ভারতে আসে, তা-ই ক্যাবিনেট মিশন নামে পরিচিত।

৪. আবুল হাশিম (১৯০৫-১৯৭৪) একজন চিন্তাবিদ ও রাজনীতিবিদ। পড়াশোনা শেষে দক্ষ আইনজীবী হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৩৬ সালে বঙ্গীয় বিধানসভার সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৩৭ সালে মুসলিম লীগের রাজনীতিতে যোগ দেন। ১৯৩৮ সালে বর্ধমান জেলা মুসলিম লীগের সভাপতি, ১৯৪২ সালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য, ১৯৪৩ সালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। তাঁর কর্মকুশলতা, সাংগঠনিক দক্ষতা ও সাম্যবাদী আদর্শে মুগ্ধ হয়ে তরুণসমাজ ব্যাপকভাবে লীগের পতাকাতলে সমবেত হয়। ফলে মুসলিম লীগ একটি গণসংগঠনে পরিণত হয় এবং ১৯৪৬ সালের বঙ্গীয় আইন সভার নির্বাচনে মুসলিম লীগ বিজয়ী হয়।

১৯৪৭ সালে দেশভাগের পর পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার বিরোধী দলের নেতা হিসেবে নেতৃত্ব প্রদান করেন। ১৯৫০ সালে কলকাতা ছেড়ে ঢাকায় আসেন। ১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলনে বিশেষ ভূমিকা পালন করেন ও গ্রেপ্তার হয়ে ১৬ মাস কারাজীবন ভোগ করেন। মুক্তি পাওয়ার পর খেলাফতে রব্বানী পার্টির সভাপতির দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৬০ সালে ইসলামিক একাডেমির প্রথম পরিচালক নিযুক্ত হন। পরবর্তীতে মুসলিম লীগের রাজনীতি পরিত্যাগ করে বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করেন।

৫. ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে মুসলিম লীগকে পরাজিত করার জন্য আওয়ামী লীগ, কৃষক প্রজা পার্টি, গণতন্ত্রী দলসহ সমমনা দলগুলোকে নিয়ে একটি নির্বাচনী জোট গঠন করা হয়। এটি যুক্তফ্রন্ট নামে পরিচিত। যুক্তফ্রন্ট ঐতিহাসিক ২১ দফা তাদের নির্বাচনী ইশতেহার হিসেবে ঘোষণা করে।

৬. মসিউর রহমান (১৯২৪-১৯৭৯) একজন রাজনীতিবিদ। ১৯৬০ সাল পর্যন্ত রংপুর জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। মুসলিম লীগের নেতা হিসেবে ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের বিরোধিতা করেন। পঞ্চাশের দশকে মুসলিম লীগের রাজনীতি ত্যাগ করে মওলানা ভাসানীর ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টিতে যোগ দেন। শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক ছয় দফা দাবির বিরোধিতা করেন। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ চলাকালে প্রথমে ভারতে আশ্রয় গ্রহণ ও পরবর্তী সময়ে পাকিস্তানি বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করেন ও মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করেন। স্বাধীনতার পর দালাল আইনে গ্রেপ্তার হন। মওলানা ভাসানীর মৃত্যুর পর ১৯৭৭ সালে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯৭৮ সালে জিয়াউর রহমানের বিএনপিতে যোগ দেন। মসিউর রহমান যাদু মিয়া নামে পরিচিত। দক্ষ পার্লামেন্টারিয়ান ও বাগ্মী হিসেবে খ্যাতি ছিল।

৭. ১৯৪১ সালের নভেম্বরে মুসলিম লীগ ও কৃষক প্রজা পার্টির কোয়ালিশন সরকার থেকে মুসলিম লীগের বেরিয়ে যাওয়ার পর এ কে ফজলুল হক ও তাঁর মন্ত্রিসভা ৭ ডিসেম্বর ইস্তফা দেয়। ফজলুল হককে সংগঠন ও মুসলিম কার্যবিরোধী কর্মকাণ্ডের জন্য মুসলিম লীগ থেকে বহিষ্কার করা হয়। ফজলুল হক ডিসেম্বর মাসে মন্ত্রিসভা গঠন করেন। ৪৩ জন সদস্য নিয়ে খাজা নাজিমুদ্দিন মুসলিম লীগে রয়ে যান এবং বিরোধী দলের নেতৃত্ব দেন। নতুন মন্ত্রিসভায় ফজলুল হক ছাড়াও চারজন হিন্দু ও চারজন মুসলিম সদস্য ছিলেন। উগ্র হিন্দু মহাসভার নেতা ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জিকে গুরুত্বপূর্ণ অর্থ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব দেওয়া হয়। তাঁকে অন্তর্ভুক্ত করার কারণে কেউ কেউ এ মন্ত্রিসভাকে 'শ্যামা-হক' মন্ত্রিসভা নামে অভিহিত করেন।

৮. হামিদুল হক চৌধুরী (১৯০১-১৯৯২) একজন রাজনীতিবিদ ও আইনজীবী। শিক্ষাজীবন শেষে ১৯৩৭ সালে মুসলিম লীগের মনোনয়নে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। পাকিস্তান আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। ভারত-পাকিস্তান সীমান্ত নির্ধারণে র‍্যাডক্লিফ কমিশনের সদস্য হন। দেশভাগের পর কলকাতা থেকে ঢাকায় আগমন। ১৯৪৯ সালে পূর্ববঙ্গ প্রাদেশিক সরকারের অর্থমন্ত্রী, ১৯৫৩ সালে শেরেবাংলার নেতৃত্বে কৃষক প্রজা পার্টি গঠন ও এর সহসভাপতি হিসেবে নির্বাচিত, ১৯৫৫ সালে পাকিস্তান দ্বিতীয় গণপরিষদের সদস্য নির্বাচিত, ১৯৫৮ সালে পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থমন্ত্রী নিযুক্ত হন। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ফ্রন্টের কোষাধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। শেখ মুজিবুর রহমানের ছয় দফার বিরোধিতা করেন। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করেন। হানাদার বাহিনীকে সহায়তা করার জন্য গঠিত

শান্তি কমিটির শীর্ষ নেতা ছিলেন। *দৈনিক পাকিস্তান অবজারভার* পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা।

৯. ফরিদ আহমদ (১৯২৩-১৯৭১) একজন রাজনীতিবিদ। পাকিস্তান সরকারের ভাষানীতির প্রতিবাদে এবং ভাষা আন্দোলনের সমর্থনে ঢাকা কলেজের অধ্যাপনার চাকরিতে ইস্তফা দেন। ১৯৫৪-১৯৬৯ পর্যন্ত নেজামে ইসলাম পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্টের মনোনয়নে পূর্ববঙ্গ পরিষদের সদস্য, ১৯৫৫ সালে পাকিস্তান দ্বিতীয় গণপরিষদের সদস্য, ১৯৫৭ সালে চুন্দ্রীগড় মন্ত্রিসভার শ্রমমন্ত্রী, ১৯৫৬ সালে কক্সবাজার মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান, ১৯৬২ সালে মৌলিক গণতন্ত্রের অধীনে উপনির্বাচনে জাতীয় পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৬৪ সালে কম্বাইন্ড অপজিশন পার্টি গঠনে মুখ্য ভূমিকা পালন ও মিস ফাতেমা জিন্নাহর পক্ষে প্রচারণাকাজে অংশ নেন। ডাক এর বিশিষ্ট সদস্য হিসেবে ১৯৬৯ সালে আইয়ুববিরোধী গণ-আন্দোলনে অংশ নেন। ১৯৬৯ সালে পাকিস্তান গণতান্ত্রিক দল গঠনে বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করেন। শেখ মুজিবুর রহমানের ছয় দফার বিরোধিতা করেন। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করেন। হানাদার বাহিনীর সহযোগী শান্তি কমিটি ও রাজাকার বাহিনী গঠন ও নেতৃত্ব দেন। ১৯৭১ সালে জনগণ কর্তৃক ধৃত ও বিক্ষুব্ধ জনতার প্রহারে নিহত হন।

১০. জিতেন ঘোষ (১৯০১-১৯৭৬) একজন লেখক ও রাজনীতিবিদ। ছাত্রাবস্থায় অসহযোগ আন্দোলনের ডাকে কলেজজীবন ত্যাগ করেন। ছাত্রাবস্থায় যুগান্তর দলের সঙ্গে যুক্ত হন। ১৯২৫ সালে বিপ্লবী পার্টির সংগঠক হিসেবে বার্মায় গমন ও সেখানে কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। ১৯৩০ সালে দেশে ফেরার পর ১৯৩১ সালে গ্রেপ্তার এবং বিনা বিচারে সাত বছর কারাভোগের পর ১৯৩৮ সালে মুক্তি পান। ওই বছর ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন ও পরের বছর পার্টির সদস্যপদ লাভ করেন। ১৯৪০ সালে আবার গ্রেপ্তার হন ও ১৯৪১ সালে মুক্তি পান। ১৯৪৩ সালে দুর্ভিক্ষের সময় চাঁদা তুলে বিক্রমপুরে একটি এতিমখানা প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৪৭ সালে ঢাকা জেলা কমিউনিস্ট পার্টির সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৭১ সালে বাংলাদশের স্বাধীনতাযুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশ নিয়ে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেন।

১১. জ্ঞান চক্রবর্তী (১৯০৭-১৯৭৭) একজন রাজনীতিবিদ। স্কুল বয়সেই সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনে সম্পৃক্ত হন। ১৯৩০ সালে গোপন বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের জন্য গ্রেপ্তার হন। ১৯৩৮ সালে দেউলী বন্দিশিবির থেকে মুক্তি লাভ করেন। ১৯৩৮ সালে ঢাকা জেলা কমিউনিস্ট পার্টির পরিচালনায় গণসাহিত্যচক্র নামে একটি প্রকাশনা সংস্থা স্থাপন করেন। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধে অংশ নেন।

১২. ওয়াহিদুজ্জামান (১৯১২-১৯৭৬) একজন রাজনীতিবিদ। ডাকনাম ঠান্ডামিয়া। মুসলিম লীগের সদস্য হিসেবে পাকিস্তান আন্দোলনে অংশ নেন। নিখিল ভারত মুসলিম লীগের কাউন্সিলর, বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য, বেঙ্গল কো-অপারেটিভ অর্গানাইজেশনের সেক্রেটারি, কলকাতা করপোরেশনের কাউন্সিলর, বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক পরিষদের সদস্য, পূর্ব পাকিস্তান কো-অপারেটিভ ব্যাংকের চেয়ারম্যান, পাকিস্তান স্টেট ব্যাংকের বোর্ড অব ডাইরেক্টরসের মনোনীত সদস্য ও নির্বাচিত সদস্য, পাকিস্তান প্রথম গণপরিষদের সদস্য, পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য, কনভেনশন মুসলিম লীগের নিখিল পাকিস্তান কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য, ১৯৬২ সালে আইয়ুব খানের মৌলিক গণতন্ত্রের অধীনে জাতীয় পরিষদের সদস্য ও আইয়ুব মন্ত্রিসভার বাণিজ্যমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি শেখ মুজিবের ছয় দফার বিরোধিতা করেন। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে বিরোধিতা করেন। হানাদার বাহিনীর সহযোগী শান্তি কমিটির অন্যতম নেতা ছিলেন।

১৩. শাহ আজিজুর রহমান (১৯২৫-১৯৮৭) একজন রাজনীতিবিদ ও আইনজীবী। অবিভক্ত বাংলার অন্যতম ছাত্রনেতা হিসেবে পরিচিত। ১৯৪৫-১৯৪৭ সাল পর্যন্ত নিখিল বঙ্গ মুসলিম ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। পাকিস্তান আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। ১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলনের বিরোধিতা করেন। ১৯৫২-১৯৫৮ সাল পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৬৪ সালে আওয়ামী লীগে যোগ দেন। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার আসামি পক্ষের অন্যতম আইনজীবী। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধে বিরোধিতা করেন। পাকিস্তানের প্রতিনিধিদলের সদস্য হিসেবে জাতিসংঘে গিয়ে মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষে বক্তব্য প্রদান করেন। পরবর্তী সময়ে জিয়াউর রহমানের সঙ্গে বিএনপির রাজনীতিতে যোগ দেন। ১৯৭৯ সালে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হন।

১৪. কাজী মোতাহার হোসেন (১৮৯৭-১৯৮১) একজন সাহিত্যিক, শিক্ষাবিদ ও বিজ্ঞানী। পড়াশোনার শেষ অবস্থায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞানের ডেমোনস্ট্রেটর হিসেবে কর্মজীবন শুরু। কর্মজীবনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের সহকারী প্রভাষক, গণিত ও পরিসংখ্যান বিভাগের প্রভাষক, পরিসংখ্যান বিভাগ আলাদা হলে এর রিডার ও বিভাগীয় প্রধান, অধ্যাপক পদে উন্নীত, সুপার নিউমারারি অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট অব স্ট্যাটিসটিক্যাল রিসার্চ অ্যান্ড ট্রেনিংয়ের পরিচালক ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমেরিটাস অধ্যাপক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ঢাকায় মুসলিম সাহিত্য সমাজের প্রতিষ্ঠাতা।

১৫. খাজা কায়সার (১৯১৮-১৯৮৫) একজন লেখক ও কূটনীতিক। শিক্ষাজীবন শেষে ১৯৪১ সালে ভারতীয় পুলিশ বাহিনীতে যোগ দেন। দেশভাগের পর ১৯৫০ সালে পাকিস্তান ফরেন সার্ভিসে যোগ দেন। কূটনীতিক হিসেবে পিকিং, নিউইয়র্ক, ওয়াশিংটন, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, সুইডেন, ডেনমার্ক, নরওয়ে, বার্মা, সিঙ্গাপুর, কোরিয়া, ভিয়েতনাম, থাইল্যান্ড এবং চীনে পাকিস্তান ও পরে বাংলাদেশের হাইকমিশনার, পররাষ্ট্র দপ্তরের পরিচালক, জাতিসংঘে বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি, নিরাপত্তা পরিষদের প্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

১৬. আবদুর রশিদ তর্কবাগীশ (১৯০০-১৯৮৬) একজন রাজনীতিবিদ। স্কুলে পাঠ্যাবস্থায় অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন। লাহোরে তর্ক প্রতিযোগিতায় সুনাম অর্জন করে তর্কবাগীশ উপাধি লাভ করেন। আঞ্জুমানে ওয়াদিনের পক্ষ থেকে বাংলার বিভিন্ন স্থানে ইসলাম ধর্ম প্রচার করার কাজ করেন। পরবর্তী সময়ে কৃষক আন্দোলনে যোগ দেন। কৃষক খাতক সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৩৬ সালে মুসলিম লীগে যোগ দেন ও ১৯৪৬ সলে বঙ্গীয় বিধানসভার সদস্য নির্বাচিত হন। পাকিস্তান আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। ১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলনে ছাত্রদের ওপর পুলিশের গুলি চালানোর প্রতিবাদে পূর্ববঙ্গ আইন পরিষদের অধিবেশন থেকে পদত্যাগ করেন। ১৯৪৭ সাল পরবর্তী প্রতিটি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন এবং এ সময় তাঁকে বহুবার

কারাবরণ করতে হয়েছে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ও আশির দশকে এরশাদের সামরিক শাসনবিরোধী আন্দোলনে জোরালো ভূমিকা পালন করেন।

১৭. তফাজ্জল হোসেন (১৯১১-১৯৬৯) একজন সাংবাদিক ও সম্পাদক। তাঁর ডাকনাম মানিক মিয়া। শিক্ষাজীবন শেষে সোহরাওয়ার্দীর সহযোগিতায় সরকারি চাকরিতে যোগ দিলেও পরবর্তী সময়ে সোহরাওয়ার্দীর কথামতো সরকারি চাকরি থেকে পদত্যাগ করেন। কলকাতা প্রাদেশিক মুসলিম লীগ অফিসের সেক্রেটারি হিসেবে নিয়োগ পান। রাজনৈতিক মতাদর্শে সোহরাওয়ার্দীর ভাবশিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৪৬ সালে সোহরাওয়ার্দী কর্তৃক *দৈনিক ইত্তেহাদ* পত্রিকার পরিচালনা বোর্ডের সেক্রেটারি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৪৮ সালে পত্রিকাটির প্রকাশনা বন্ধ হয়ে গেলে কলকাতা থেকে ঢাকায় চলে আসেন। ১৯৫১ সালে আওয়ামী লীগের মুখপত্র হিসেবে সাপ্তাহিক *ইত্তেফাক* পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৫৩ সালে এটি তাঁর সম্পাদনায় দৈনিক পত্রিকায় পরিণত হয়। ১৯৫৮ সালে সামরিক শাসন জারি হলে ১৯৫৯ সালে গ্রেপ্তার হন। বাংলাদেশের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে ষাটের দশকে প্রতিটি আন্দোলনে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেন। ১৯৬৩ সালে আন্তর্জাতিক প্রেস ইনস্টিটিউট পাকিস্তান শাখার সভাপতি, পাকিস্তান প্রেস কোর্ট অব অনার সংস্থার সেক্রেটারি, পিআইএ'র ডিরেক্টর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

কপি অনুলিখন : **রীতা ভৌমিক**

বই আলোচনা

রাজনীতিতে দায়িত্বশীলতা ও গণতন্ত্রের শর্ত

হাসান শফি

মুক্ত গণতন্ত্র রুদ্ধ রাজনীতি (বাংলাদেশ ১৯৯২-২০১২)—মতিউর রহমান
প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা (ফেব্রুয়ারি ২০১৪)

দেশ ও জনগণের সর্বাধিক কল্যাণ এবং চূড়ান্ত অনিষ্ট করার সামর্থ্য বা ক্ষমতা রয়েছে রাজনীতি ও রাজনীতিকদের। কোনো দেশের রাজনীতি যদি হয় নীতিহীন, পচনগ্রস্ত; তবে সে দেশটির অন্যান্য প্রতিষ্ঠানকেও সেই সংক্রমণ থেকে রক্ষা করা কার্যত অসম্ভব হয়ে পড়ে। একইভাবে, কিছু কিছু সীমাবদ্ধতার পরও, রাষ্ট্র পরিচালনব্যবস্থা হিসেবে পৃথিবীতে এখন পর্যন্ত গণতন্ত্রের কোনো বিকল্প নেই। কিংবা হয়তো আছে, অধিকতর ও কার্যকর গণতন্ত্র। দায়িত্বশীলতা যার প্রধান ও অপরিহার্য শর্ত। মতিউর রহমান তাঁর *মুক্ত গণতন্ত্র রুদ্ধ রাজনীতি* বইটির অন্তর্ভুক্ত রচনাগুলোর মধ্য দিয়ে মূলত এই দায়িত্বশীল রাজনীতির আবশ্যকতার কথাই বলতে চেয়েছেন। ১৯৯১-এর অক্টোবর থেকে ২০১০-এর অক্টোবর পর্যন্ত দুই দশকের সময় পরিসরে সংবাদপত্রের মন্তব্য প্রতিবেদন হিসেবে এগুলো লিখিত হয়। এর মধ্যে বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদকে নিয়ে লেখা প্রথম রচনাটি অধুনালুপ্ত দৈনিক *আজকের কাগজ*-এ প্রকাশিত হয়েছিল। বাকি সব রচনাই তাঁর নিজের সম্পাদিত দৈনিক *ভোরের কাগজ* ও দৈনিক *প্রথম আলো*-র জন্য লেখা।

দীর্ঘ স্বৈরশাসনের অবসানে এ দেশে গণতন্ত্রের অভিযাত্রা শুরু হওয়ার পরও যে তা বারবার মুখ থুবড়ে পড়েছে এবং পড়ছে, তার জন্য লেখক দায়ী করেছেন প্রধানত আমাদের রাজনৈতিক শক্তি, বিশেষ করে প্রধান দুটি দলের দায়িত্বশীলতার অভাব বা ব্যর্থতাকে। ১৯৯১ সালে জন-আকাঙ্ক্ষার মুখে ও দুটি দলের সমঝোতার ভিত্তিতে এ দেশে সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্তিত হলেও তা কখনো

কার্যকর রূপ পায়নি। যদিও প্রতি আমলেই সরকারের তরফে বারবার সংসদকেই সব কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে ঘোষণা এবং গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। তবে তার জন্য অত্যাবশ্যক যে করণীয়গুলো, সে ব্যাপারে কখনোই কেউ আগ্রহ বা আন্তরিকতার পরিচয় দেয়নি। সংসদীয় কমিটিগুলোকে কার্যকর করা, পরিষদে বিরোধী দলকে গুরুত্বের সঙ্গে নেওয়া ও তাকে তার ভূমিকা পালন করতে দেওয়া, প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ ইত্যাদি কোনো প্রতিশ্রুতিই রক্ষিত হয়নি। ফলে, সামরিক শাসনের অবসানের পরও দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে এ দেশে যা চলছে, মতিউর রহমানের ভাষায় তা হলো 'নির্বাচিত সরকারের স্বৈরতান্ত্রিক শাসন'। তিনি তাঁর লেখায় বার কয়েকই এই অভিধাটি ব্যবহার করেছেন। বাংলাদেশের চালু শাসনব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি লিখেছেন, 'এখানে দলীয় নীতি, নির্বাচনী ঘোষণা—এসবের কোনো মূল্য নেই।... সংসদীয় দলের কোনো ভূমিকা থাকে না। দল ঢুকে যায় সরকারের ভেতরে, দল আর সরকার সমার্থক হয়ে যায়, সরকার চলে একজনের ইচ্ছা-অনিচ্ছার ভিত্তিতে—তখন তিনিই সব' (পৃ. ৬৬)।

২

সংসদের ভেতরেই হোক কিংবা বাইরে, বাংলাদেশের দুটি প্রধান দল ও তাদের জোটসঙ্গীদের সম্পর্ক সব সময় বিরোধিতা ও বৈরিতার। দেশের পাহাড়প্রমাণ সমস্যার মোকাবিলায় কোথাও দুই পক্ষের মধ্যে সমঝোতা ও সহযোগিতার লেশমাত্র নমুনা দেখা যায় না। বরং সবকিছুর জন্য পরস্পরকে দোষারোপ করাই আমাদের রাজনৈতিক সংস্কৃতির প্রধান বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। মতিউর রহমানের মতে, রাজনৈতিক দলগুলোর সব সময় সব ব্যাপারে জেতার আগ্রহ এবং অপর পক্ষকে বিন্দুমাত্র ছাড় না দেওয়ার মানসিকতা এর পেছনে কাজ করে (পৃ. ২২৫)। লেখকের আশঙ্কা, সমস্যার মূলে না গিয়ে ও তা সমাধানের চেষ্টা না করে, কিংবা মূল ইস্যু থেকে চোখ ফিরিয়ে বা তাকে পাশ কাটিয়ে, এভাবে একে অপরকে দোষারোপ করার, পাল্টাপাল্টির যে ভয়ংকর রাজনৈতিক সংস্কৃতি দেশে গড়ে উঠেছে, তা দেশকে প্রকৃতই ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাচ্ছে (পৃ. ২০৫)। সরকার কিংবা বিরোধী দলে যে অবস্থানেই থাকুন, আমাদের রাজনৈতিক নেতারাও যে কখনো কিছু দোষ করতে পারেন, তাঁদেরও যে কমবেশি ভুল হতে পারে, এটা তাঁরা মনে হয় বিশ্বাস করেন না। ফলে দোষ বা ভুল স্বীকারের, আত্মসমালোচনার এবং জনগণের কাছে ক্ষমা চাওয়ার সংস্কৃতি এ দেশে আজও গড়ে ওঠেনি। আর নেতারা যেখানে অভ্রান্ত, নির্দোষ, 'ফুলের মতো পবিত্র', সেখানে কর্মী-সমর্থকদের তো দোষ স্বীকারের প্রশ্নই ওঠে না! যদিও, মতিউর রহমান ঠিকই লক্ষ করেছেন,

'নেতা-নেত্রীদের মুখে যখন সামান্যও আত্মসমালোচনার কথা শুনেছে, দেশবাসী তা পছন্দ করেছে (পৃ. ১৭১)। এমনকি ওই দলটির প্রতি মানুষ সহানুভূতিও জানিয়েছে। দু-একবার নির্বাচনী ফলাফলেও যার প্রতিফলন ঘটেছে। উল্টো দিকে রাজনৈতিক দল বা তার নেতাদের দম্ভ ও ঔদ্ধত্যকে যে মানুষ পছন্দ করে না, তারও প্রমাণ এমনকি ভোটের ফলাফলেও আমরা দেখেছি। কিন্তু এসব দৃষ্টান্ত থেকে আমাদের রাজনৈতিক দলগুলো কিংবা তাদের নেতারা কোনো শিক্ষা কি নিতে পেরেছেন? আমাদের রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে কোনো স্থায়ী বা গুণগত পরিবর্তন কি তা ঘটাতে পেরেছে? মতিউর রহমানের এই মন্তব্য প্রতিবেদনগুলো পড়তে গিয়ে পাঠকের মনে এ প্রশ্নগুলো বারবারই জাগবে বলে মনে হয়। নির্বাচনে অতিরিক্ত সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভের ব্যাপারটিকেও লেখক অন্তত আমাদের দেশে গণতন্ত্রের জন্য একটা বড় বিপদ বা ঝুঁকি হিসেবে দেখেছেন। কারণ, তাতে দলীয় স্বেচ্ছাচার বা একনায়কতন্ত্রের সুযোগ সৃষ্টি হয়। তিনি লিখেছেন, 'যত বড় সংখ্যা তত বড় ঝুঁকি' (পৃ. ৩৩৩)।

শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে বলতে গিয়েও লেখক এর জন্য বড় রাজনৈতিক দলগুলোর দায়িত্বহীন রাজনীতিকেই দায়ী করেছেন। নির্মাণকাজের টেন্ডার নিয়ে ছাত্রদলের দুটি গ্রুপের সশস্ত্র সংঘর্ষের শিকার হয়ে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী ছাত্রী সাবেকুন নাহার সনির মৃত্যুর ঘটনায় তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়ে লিখেছেন, 'এখন দেশে যে ছাত্ররাজনীতি চলছে, তা চলতে দিয়ে আমাদের শিক্ষাজীবন, শিক্ষাব্যবস্থা, শিক্ষার পরিবেশ ফিরিয়ে আনা সম্ভব নয়' (পৃ. ১২৫)। একইভাবে ছাত্রলীগের দুটি গ্রুপের সংঘর্ষের বলি হয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী ছাত্র আবু বকর সিদ্দিকের মৃত্যুর পর লিখেছেন, 'স্বাধীনতার পর প্রায় চার দশকজুড়ে ছাত্ররাজনীতির নামে বাংলাদেশকে এক সন্ত্রাসকবলিত বিপন্ন দেশে পরিণত করা হয়েছে।... অতীতের গৌরবোজ্জ্বল ছাত্ররাজনীতির দোহাই দিয়ে এসব আর মেনে নেওয়া যায় না। এখন সময় হয়েছে প্রশ্ন তোলার যে ছাত্রসংগঠন ও ছাত্ররাজনীতির নামে এসব সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড আমরা আর কত দিন মেনে নেব?' (পৃ. ৩৭৬) একই প্রসঙ্গে অন্যত্র লিখেছেন, সন্ত্রাস দমনের কাজটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই শুরু করতে হবে (পৃ. ১১৮)। দেশে জঙ্গি তৎপরতা সম্পর্কে লিখতে গিয়েও মতিউর রহমানের অভিমত, বড় দুই দলের ঝগড়ার সুযোগেই এই ধর্মীয় উগ্রবাদ বিস্তার লাভ করছে, এবং 'শুধু বিদেশি মদদে ও অর্থে নয়, যা সবচেয়ে বিপজ্জনক তা হলো, তারা এতে সমাজের কোনো কোনো অংশকে সম্পৃক্ত করতেও পেরেছে' (পৃ. ২১৯)। তাঁর মতে, ক্ষমতার রাজনীতি ও সংকীর্ণ দলীয় স্বার্থে বিভিন্ন সময় দুটি দলই কমবেশি জঙ্গিবাদকে আশ্রয়-প্রশ্রয় দিয়েছে। এ প্রসঙ্গে একাধিক রচনায় তিনি ২১ আগস্ট আওয়ামী লীগের জনসভায় গ্রেনেড

হামলা ও পরবর্তী ঘটনাক্রমে সে সময়ের ক্ষমতাসীন বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের ভূমিকার যেমন সমালোচনা করেছেন, একইভাবে নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে ফতোয়াকে বৈধতা দিয়ে ইসলামী ঐক্যজোটের সঙ্গে আওয়ামী লীগের চুক্তি স্বাক্ষরেরও নিন্দা করেছেন। লিখেছেন, 'ওই সমঝোতার পক্ষে কোনো একটা যুক্তিও গ্রহণযোগ্য নয়' (পৃ. ২৪৪)। এবং, তাঁর মতে, 'যেকোনো মূল্যে ক্ষমতার ক্ষুধা নিবারণের জন্য মরিয়া' হয়ে ওঠা থেকেই ছিল সেদিন স্বৈরাচার ও মৌলবাদীদের নিয়ে আওয়ামী লীগের সে 'মহাজোট' গঠন (পৃ. ২৪৫)। দেশে জঙ্গি তৎপরতার সূচনাপর্ব সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য আছে বইটিতে। লেখকের মতে, পাকিস্তান ও ভারত দুটি দেশই তাদের ভূ-রাজনৈতিক স্বার্থে এ দেশে জঙ্গিবাদকে মদদ দেয় (পৃ. ২৬০)। জঙ্গিবাদ মোকাবিলায় ক্ষমতাসীনদের ব্যর্থতা, তাদের অস্পষ্ট বা রহস্যময় ভূমিকা এবং কৌশলগত ভুলেরও সমালোচনা করেছেন লেখক। মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত জঙ্গিনেতা শায়খ আবদুর রহমান যে সাংবাদিকদের সামনে কথা বলতে চেয়েছিলেন, লেখক মনে করেন, তাঁকে সে সুযোগ দেওয়া উচিত ছিল (পৃ. ২১৮) তা না দিয়ে কিছু সত্য বা তথ্যকে যে চিরতরে ঢাকাচাপা দেওয়া হয়েছে, সে তো সহজেই বোধগম্য।

৩

বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক রাজনীতির এক প্রধান দুর্বলতা, ব্যর্থতার বড় প্রমাণ হিসেবে মতিউর রহমান যে সত্যটির প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন তা হলো, দীর্ঘ লড়াই-সংগ্রামের মাধ্যমে যার পতন ঘটিয়ে এ দেশে গণতন্ত্র একদিন তার যাত্রা শুরু করেছিল, সেই 'পতিত' স্বৈরাচার আজও এ দেশের ক্ষমতার রাজনীতিতে এক গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টর হয়ে আছে। পৃথিবীর আর কোথাও যার সমতুল্য উদাহারন খুঁজে পাওয়া যাবে না। তিনি লিখেছেন, 'স্বৈরাচারী আর দুর্নীতিবাজ এরশাদ আমাদের দেশের প্রধান দুই দল আর দুই নেত্রীর কাছে বেশ মূল্যবান রাজনৈতিক কেনাবেচার বস্তু হয়ে আছেন এখনো' (পৃ. ৯৫)। সময়ে সময়ে তাঁর বিরুদ্ধে যে দুর্নীতির মামলাগুলো চাঙা করা হয়, সে কেবল 'চাপে ফেলে তাঁকে দলে ভেড়ানো'র জন্য (পৃ. ৯৬)। মতিউর রহমান কথাগুলো লিখেছিলেন ২০০১ সালের সেপ্টেম্বরে। এক যুগ পর আজও বাস্তবতাটি কি একই রয়ে যায়নি? এভাবে এরশাদের দুর্নীতির বিচার না করে, তার সঙ্গে আপস করে, আমাদের পরবর্তী 'গণতান্ত্রিক' সরকারগুলো তাদের প্রতিশ্রুত দুর্নীতিবিরোধী লড়াইয়ের নৈতিক ভিত্তি হারিয়ে ফেলেছে। পরে নিজেরাও আকণ্ঠ দুর্নীতিতে নিমজ্জিত হয়েছে। এরশাদের বিদেশে বিপুল অর্থ পাচারের বিবরণের পর তাই মতিউর রহমানকে আবার বিএনপির শাসনামলে হাওয়া ভবনকে কেন্দ্র করে

দুর্নীতির মহোৎসব এবং আওয়ামী লীগ আমলে মিগ ক্রয়ে বিরাট দুর্নীতির প্রসঙ্গ নিয়ে লিখতে হয়।

এখানে বলা দরকার, আমাদের সংবাদপত্রে প্রকাশিত কলাম জাতীয় রচনায় সাধারণত কোনো বিশেষ প্রসঙ্গে লেখকের অভিমত বা মন্তব্যই প্রকাশ পায়। সেই সঙ্গে হয়তো কারও কারও লেখায় কখনো কিছু তত্ত্বকথারও সংশ্লেষ ঘটে। সচরাচর তথ্য এসব রচনায় প্রাধান্য পায় না। *মুক্ত গণতন্ত্র রুদ্ধ রাজনীতি* গ্রন্থে সংকলিত রচনাগুলোকে হয়তো এই অর্থে 'মন্তব্য প্রতিবেদন' বলা হয়েছে যে এর অনেকগুলোতে অনুসন্ধানী সাংবাদিকসুলভ তথ্য উদ্‌ঘাটন বা উপস্থাপনের পাশাপাশি সে-সম্পর্কে লেখকের মন্তব্য বা অভিমত প্রকাশ পেয়েছে। সাধারণ পাঠক তাঁদের এ যাবৎ অজানা অনেক তথ্য হয়তো এ বইটি পাঠেই প্রথম জানতে পারবেন। যেমন, এরশাদ যে বলে থাকেন, দেশকে গৃহযুদ্ধ বা অধিকতর রক্তপাতের হাত থেকে বাঁচাতে তিনি স্বেচ্ছায় ক্ষমতা ছেড়ে দিয়েছিলেন, তাঁর পদত্যাগের পূর্ববর্তী ঘটনাক্রম (প্রকাশ্য ও নেপথ্য) উল্লেখ করে মতিউর রহমান দেখিয়েছেন, কথাটা মোটেও সত্য নয়। প্রকৃতপক্ষে এরশাদের ক্ষমতার মূলভিত্তি সেনাবাহিনী তাঁর প্রতি সমর্থন প্রত্যাহার করে নেওয়ায় এবং শেষ পর্যায়ে তাদের একরকম চাপের মুখেই তিনি পদত্যাগে বাধ্য হয়েছিলেন (পৃ. ৩৮৬-৮৯)। ক্ষমতায় থাকাকালে বিদেশে এরশাদের বিপুল অঙ্কের অর্থ পাচারের তথ্য আছে বইটিতে। আছে পরবর্তী বিএনপি ও আওয়ামী লীগ বা তাদের জোটশাসিত সরকারের আমলের দুর্নীতি ও অপশাসনের বেশকিছু তথ্যও। সেদিক থেকে গ্রন্থটি এ দেশে রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়নের তথ্যবিবরণী হিসেবে ভবিষ্যৎ পাঠকদের জানাশোনার পরিধিই শুধু বাড়াবে না, তাঁদের চিন্তার খোরাকও জোগাবে বলে আমাদের ধারণা।

৪

আমাদের রাজনৈতিক সংস্কৃতির বাস্তবতার কথা বলতে গিয়ে বেশ কিছু অপ্রিয় সত্যকে লেখক বেশ কঠিন ভাষায়ই তুলে ধরেছেন। মনে মনে হলেও সে-কথাগুলোর সঙ্গে একমত না হয়ে আমাদের উপায় নেই। কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যাক : (১) আমাদের দেশের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক ব্যাপারে বিদেশিদের নাক গলানোর আমরা সমালোচনা করি, যখন তাদের কোনো বক্তব্য আমাদের বিপক্ষে যায়। কিন্তু সেই আমরাই আবার যখন দরকার, তাদের কাছে ধরনা দিই, প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে তাদের কাছে নালিশ জানাই, তাদের সালিস মানি। (২) ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের রিপোর্টে দুর্নীতিতে শীর্ষ বলে যখন বাংলাদেশের নাম ওঠে, বিরোধী দলে থাকলে আমরা তাতে উল্লসিত হই, প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে

তথ্যটিকে ব্যবহার করতে পেরে যারপরনাই আত্মপ্রসাদ লাভ করি, কিন্তু সেটাই যদি হয় নিজেদের আমলে তবে তার যথার্থতা বা পেছনের উদ্দেশ্য নিয়ে প্রশ্ন তুলি। যেকোনো অবস্থায় ব্যাপারটি যে দেশ ও জাতির জন্য চূড়ান্ত লজ্জার, এটা কোনো পক্ষই যেন বুঝতে পারি না বা মনে রাখতে চাই না। (বাংলাদেশ তখন পর্যন্ত পরপর পাঁচবার দুর্নীতিতে চ্যাম্পিয়ন হয়। এর মধ্যে চারবার ঘটে বিএনপির আমলে। কিন্তু শুরুটা যে আওয়ামী লীগের সময়ে, সে কথাটা এ প্রসঙ্গে লেখক মনে করিয়ে দিয়েছেন (পৃ. ৩৩১)। (৩) ক্ষমতার বাইরে থাকতে প্রতিটি রাজনৈতিক দলই সংবাদপত্রের স্বাধীনতার পক্ষে কথা বলে, কিন্তু ক্ষমতায় গেলে তাদের একমাত্র চাওয়া হয়ে দাঁড়ায়, প্রচারমাধ্যম সত্য প্রচারের দায়িত্ব পালন নয়, বরং তাদের পক্ষে থাকুক। এর ব্যত্যয় দেখলে রাজনৈতিক দলের নেতানেত্রীরা পত্রিকার বিরুদ্ধে বিষোদ্‌গার করেন (পৃ. ২২৫)। (এ দেশে প্রতিটি সরকারই তাদের সময়ে কোনো কোনোভাবে সংবাদপত্রসহ প্রচারমাধ্যমকে নিয়ন্ত্রণ করতে চেয়েছে। দেশে জঙ্গি তৎপরতা সম্পর্কে পত্রপত্রিকায় সংবাদ প্রকাশ ও আলোচনার মুখে বিএনপি-জামায়াত দলীয় সাংসদেরা যে সংবাদপত্র নিয়ন্ত্রণে আইন চেয়েছিলেন, সে কথাটা লেখক স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন (পৃ. ২০৯)।

সংসদ নির্বাচনে অংশ নিয়ে ফলাফল নিজেদের পক্ষে না গেলেই সে নির্বাচনের নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তুলব, 'সূক্ষ্ম' বা স্থূল কারচুপির অভিযোগ আনব, সংসদ অধিবেশনে অংশ নেব না বা লাগাতার বর্জনের মাধ্যমে সংসদকে অকার্যকর এবং মেয়াদ শেষের আগেই সরকারের পতন ঘটাতে সচেষ্ট হব; সরকারে থাকলে হরতালের বিরুদ্ধে কথা বলব, প্রতিটি হরতালে দেশের অর্থনীতির কী পরিমাণ ক্ষতি হয় জাতির সামনে তা তুলে ধরব, হরতালকেন্দ্রিক সন্ত্রাস সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করার নামে পাল্টা মিটিং-মিছিল করে তাদের আরও সন্ত্রস্ত করে তুলব, আর বিরোধী দলে গেলেই কথায় কথায় হরতালের ডাক দেব, বলব যে হরতাল ছাড়া উপায় নেই ; লেখকের মতে, এসব আর যা-ই হোক, দায়িত্বশীল রাজনীতির পরিচয় নয়। যদিও বছরের পর বছর এটাই হয়ে চলেছে আমাদের দেশে। হরতাল প্রসঙ্গে মতিউর রহমান লিখেছেন, রাজনৈতিক সংগ্রামের এক 'চরম' কর্মসূচিকে এভাবে ক্রমাগত অপব্যবহারের মাধ্যমে বর্তমানে 'সবচেয়ে সহজ কর্মসূচি'তে রূপান্তরিত করা হয়েছে। এখন ডাকলেই হরতাল হয় (পৃ. ৫৪)। তিনি তথ্য দিয়েছেন, ১৯৬২ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর থেকে ১৯৬৬ সালের ৭ জুন পর্যন্ত চার বছর সময়কালে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে মাত্র তিন দিন হরতাল ডাকা হয়েছিল (পৃ. ৫৫)। ১৯৬০ দশকের ছাত্র আন্দোলনের একজন অগ্রণী কর্মী হিসেবে মতিউর রহমান তাঁর সে সময়ের অভিজ্ঞতার সঙ্গে এখনকার অবস্থার তুলনা করে লিখেছেন, 'এখন তো রাজনৈতিক দল কোনো প্রচারপত্রও বিলি করে না, দাবিদাওয়াভিত্তিক পোস্টার

দেয়ালে সাঁটে না, রাস্তার মোড়ে মোড়ে সভা অর্থাৎ স্ট্রিট কর্নার মিটিং করে না, মিছিল করে না—এমনকি জনসভাও করে কদাচিৎ' (পৃ. ৫৮)। দেশে সুস্থ ও সুষ্ঠু গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা চালু ও বিকাশের স্বার্থেই সংসদে ও সংসদের বাইরে বিক্ষোভ-প্রতিবাদের বিকল্প উপায় অনুসন্ধান ও অনুসরণের কথা বলেছেন লেখক।

যদি একান্তভাবে দলান্ধ না হই, কিংবা শুধু তর্কের খাতিরে তর্ক করতে না চাই, তবে লেখকের অনেক মন্তব্য বা পর্যবেক্ষণের সঙ্গেই আমাদের সহমত না হয়ে উপায় নেই। যেমন তিনি বলেছেন, বিগত সবকটি নির্বাচনেই যখন যারা জিতেছে, দেখা গেছে, তারা তাদের কোনো কাজ বা আচরণের দ্বারা সে বিজয় অর্জন করেনি, পূর্ববর্তী মেয়াদে ক্ষমতাসীন প্রতিদ্বন্দ্বী দলটির ব্যর্থতা বা অপশাসনেরই ফসল তুলেছে তারা। অর্থাৎ প্রধানত নেতিবাচক ভোটেই নির্বাচনের ফলাফল নির্ধারিত হয়েছে। আর এ প্রসঙ্গে যা লক্ষণীয় তা হলো, সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে বিজয়ী দলটির প্রাপ্ত ভোটের হারের তুলনায় তাদের আসনপ্রাপ্তির হার বেশি (পৃ. ১০৩)।

৫

লেখক মনে করেন, জাতির বিভক্তি আজ একটি বাস্তবতা। একে অস্বীকার করার যেমন উপায় নেই, তেমনি এ কথাও আমাদের বুঝতে ও স্বীকার করতে হবে যে এই বাস্তবতা নিয়ে দেশ ও জাতিকে বেশি দূর অগ্রসর করে নেওয়া কারও পক্ষেই সম্ভব হবে না। অন্তত কিছু মৌলিক বিষয়ে জাতীয় পর্যায়ে ন্যূনতম একটা সমঝোতায় আমাদের পৌঁছতেই হবে। এরও অতিরিক্ত মতিউর রহমান যা মনে করেন তা হলো, বাংলাদেশে গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ শেষ পর্যন্ত আওয়ামী লীগ ও বিএনপি এ দুটি বড় দলের আচরণ এবং ভবিষ্যতে তারা কতটা সংশোধিত হতে পারে তার ওপর নির্ভর করছে। এ প্রসঙ্গে ২০০০ সালের ২১ ডিসেম্বর লেখা মন্তব্য প্রতিবেদনে তিনি একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন, যা আজকের দিনেও প্রাসঙ্গিক বলে মনে করি। তিনি লিখেছিলেন, 'বাংলাদেশে আওয়ামী লীগ ও বিএনপি একে অপরকে সম্পূর্ণভাবে পরাভূত বা নিশ্চিহ্ন করার যত চিন্তাই করুক না কেন, সেটা সহজসাধ্য কোনো কাজ নয়। আমরা বিগত দুই নির্বাচনে দুই দলের প্রাপ্ত ভোটসংখ্যার দিকে দৃষ্টিপাত করলেই সেটা বুঝতে পারব' (পৃ. ৭৮)। তাঁর মতে, অন্য যেকোনো দেশের মতোই এ দেশেও গণতন্ত্রকে এগিয়ে যেতে হলে তাকে দুই পায়ের ওপর ভর করেই এগোতে হবে। আর সে দুই পায়ের একটি যদি আওয়ামী লীগ হয় তবে অন্যটি বিএনপি। এখন পর্যন্ত এটাই হলো বাস্তবতা। এই বাস্তবতাকে অস্বীকার করে যারা গণতন্ত্রকে কার্যকর করার বা তাকে প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি দেওয়ার কথা বলেন, তাঁরা সে ব্যাপারে সত্যিসত্যি কতটা আন্তরিক, লেখক সে-সম্পর্কে সন্দিহান।

অবশ্য দেশের বড় দুটি দলের মধ্যে কোনো ব্যাপারেই যে কোনো সমঝোতা নেই বা কখনো দেখা যায়নি, তা বলাও সত্যের অপলাপ হবে। ঐক্য বা সমঝোতার এমন দু-একটি ক্ষেত্রও লেখক শনাক্ত করেছেন। যেমন, ১৯৯১ সালে পঞ্চম জাতীয় সংসদে সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনী পাসের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি পদটিকে ক্ষমতাহীন ঠুঁটো জগন্নাথে পরিণত করার ব্যাপারে উভয় দলের মধ্যে এই মতৈক্য দেখা গিয়েছিল (পৃ. ৪৯)। বলা বাহুল্য দেশের জন্য যা মঙ্গলজনক হয়নি। একইভাবে নির্বাচন কমিশনকে যথেষ্ট শক্তিশালী ও টেকসই হতে না দেওয়ার ব্যাপারেও যেন উভয় দলের মধ্যে একটা ঐক্য বা সমঝোতার মনোভাব কাজ করে (পৃ. ২৩৫-৬)। যদিও, এ বিষয়ে তো কোনো সন্দেহ নেই যে শুধু নির্বাচন কমিশনকে শক্তিশালী ও স্বাধীনভাবে কাজ করতে দেওয়ার মাধ্যমেই দেশ অনেক বিপদ-সংকট থেকে রক্ষা পেতে পারে।

৬

এক-এগারোর পরিবর্তন ও সেনাসমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সমর্থক হিসেবে *প্রথম আলো* পত্রিকাটি তার অনুরাগী ও বিরোধী উভয় মহলে এক রকম পরিচিতি লাভ করে। বস্তুত এক চূড়ান্ত নৈরাজ্যকর পরিস্থিতির অবসানে এক-এগারোর পরিবর্তন সেদিন প্রায় সমগ্র দেশবাসীর জন্যই স্বস্তি বয়ে এনেছিল। আর সদ্য-ক্ষমতাচ্যুত দলটি এবং ক্ষতিগ্রস্ত কিছু মহল ছাড়া সেদিন সবাই পরিবর্তনটিকে স্বাগত জানিয়েছিল। যদিও জাতির উদ্ধারকর্তা হিসেবে আবির্ভূতরা তাঁদের প্রতি ব্যাপক জনগণের সেই আস্থার মর্যাদা শেষ পর্যন্ত ধরে রাখতে পারেননি। গ্রন্থভুক্ত মন্তব্য প্রতিবেদনগুলো পাঠে দেখা যায়, এক-এগারোর পরিবর্তনের পর একেবারে শুরু থেকেই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা নির্বাচন, উপদেষ্টাদের অনেক কথাবার্তা (তাঁদের পরস্পরবিরোধী এমনকি একই উপদেষ্টার স্ববিরোধী বক্তব্য) ও কাজকর্ম, সেনাবাহিনীর ওপর অধিক নির্ভরশীলতা, দ্বৈত শাসন, অনেক বিষয়ে সিদ্ধান্তহীনতা কিংবা সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে দোদুল্যমানতা ও দীর্ঘসূত্রতা, নির্দলীয় সরকার হয়েও রাজনৈতিক দল গঠনের প্রক্রিয়ায় তাদের সংশ্লিষ্টতা বা পৃষ্ঠপোষকতা, রাজনৈতিক নেতাদের প্রতি আচরণে বাড়াবাড়ি, অর্থনীতির ক্ষেত্রে বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ-এর পরামর্শ গ্রহণে অধিক আগ্রহ, এ সবকিছুর সমালোচনাও করেছেন মতিউর রহমান সে সময় তাঁর পত্রিকায় প্রকাশিত এ লেখাগুলোতে। গোড়ায় তত্ত্বাবধায়ক সরকার জনগণের মধ্যে যে প্রত্যাশা জাগিয়েছিল, তা যখন দ্রুত আস্থাহীনতায় পর্যবসিত হতে থাকে, তখন তা নিয়ে কথা বলতেও লেখক দ্বিধা করেননি। এবং সেসব কথাও তিনি বেশ স্পষ্টভাবেই বলেছেন। যদিও সেই সঙ্গে সেনা-সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সমালোচকদেরও

সমালোচনা করে লিখেছেন, 'সেসব দিনের ভয়ংকর সব কথা এখন আমরা অনেকেই ভুলে যাচ্ছি। রাজনীতিবিদদের অনেকে এখন উল্টো সুরে কথা বলছেন, যেন দেশে ১১ জানুয়ারির পরিবর্তনের কোনো প্রয়োজন ছিল না, রাজনৈতিক নেতৃত্বের কোনো ভুল বা বাড়াবাড়ি ছিল না, কোনো ষড়যন্ত্র ছিল না। ভাবখানা এমন যে দ্রুত একটা নির্বাচন দিয়ে অতীতের ব্যর্থ রাজনৈতিক নেতৃত্বের হাতে ক্ষমতা দিয়ে দিলেই সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে' (পৃ. ৩১১)। লেখকের মতে, বিচারপতি কে এম হাসানকে প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে মেনে না নিয়ে আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব একটা 'ঐতিহাসিক' ভুল করেছিল। পরবর্তী বিপর্যয়কর পরিস্থিতির জন্য যা বহুলাংশে দায়ী। আর এই দায় থেকে দলটি অব্যাহতি পেতে পারে না (পৃ. ২৪৯)।

গোড়ায় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দুর্নীতিবিরোধী অভিযান এবং নানা সংস্কারমূলক প্রতিশ্রুতি ও পদক্ষেপ দেশবাসীর ব্যাপক অংশের মধ্যে যে প্রত্যাশা জাগিয়েছিল, মতিউর রহমানের লেখাগুলোতে হয়তো তারই প্রতিধ্বনি শুনি আমরা। কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে আশাভঙ্গের অনুভূতি নিয়েও দেখা যায় তিনি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ওপর আস্থা বজায় রাখতে চেয়েছেন, সেনাবাহিনীর সহায়তা নিয়ে তারা যেভাবে ভোটার তালিকা সংশোধন ও জাতীয় পরিচয়পত্র প্রদানের মতো দুটো গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করেছে, সেভাবেই প্রতিশ্রুত অন্যান্য সংস্কারমূলক কাজও তারা সম্পন্ন করবে, এমন আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন। এ ব্যাপারে সরকারকে বারবার তাগিদও দিয়েছেন। প্রশাসনিক সংস্কার, বিকেন্দ্রীকরণ এমনকি জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগেই স্থানীয় সরকার সংস্থাসমূহের নির্বাচন অনুষ্ঠানের কথাও বলেছেন তিনি। যেহেতু, লেখকের মনে হয়েছে, নির্বাচিত সরকার ক্ষমতায় এসে এই কাজগুলো করবে না। তাঁর সে ধারণা যে অমূলক ছিল না, সে তো আজ একটি প্রমাণিত সত্য। তা হলেও একটি অনির্বাচিত ও অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের এমনকি জাতির বৃহত্তর স্বার্থেও এত সব দায়িত্ব পালনের নৈতিক ভিত্তি বা সুযোগ আছে কি না, সে প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবেই উঠতে পারে। লেখক অবশ্য তত্ত্বাবধায়ক সরকার পদ্ধতি যে একটা স্থায়ী ব্যবস্থা হতে পারে না, দেশের মানুষ যে দীর্ঘ সময় ধরে একটা অনির্বাচিত সরকারের অধীনে থাকতে চাইবে না, সে কথাও খুব স্পষ্ট করেই বলেছেন (পৃ. ২৬৭)। এমনকি সে-সময় সেনাপ্রধান মইন উ আহমেদ দেশশাসন সম্পর্কে প্রকাশ্যে যেসব অভিমত দিতে শুরু করেছিলেন, তার সঙ্গে অনেক বিষয়ে একমত পোষণ করেও মতিউর রহমান প্রশ্ন তুলেছেন, সেনাপ্রধান হিসেবে তাঁর অবস্থান থেকে তিনি সেটা দিতে পারেন কি না (পৃ. ২৬৮)। এই ভূখণ্ডের সামরিক শাসনামলের ইতিহাসের প্রতি ইঙ্গিত করে বলেছেন, জনগণ চায় না, সেই ইতিহাস ফিরে আসুক (পৃ. ২৬৯)।

রাজনীতিতে সেনাবাহিনীর জড়িত হওয়ার বিরুদ্ধেই তিনি শুধু মত ব্যক্ত করেননি, (পৃ. ৩৬০) এমনকি নির্বাচিত সরকারের আমলেও রাজনৈতিক বিবেচনায় সেনাপ্রধান নিয়োগের তিনি সমালোচনা করেছেন। (পৃ. ৩৫৬) অবাধ তথ্যপ্রবাহের এই যুগে কেন সেনাবাহিনী নিয়ে সংসদে বা সংসদের বাইরে কোনো কথা হবে না, তা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন লেখক। তাঁর মতে, এ অবস্থাটা কখনোই কারও জন্য মঙ্গলজনক হতে পারে না। লিখেছেন, 'যাদের ট্যাক্সে, যাদের অর্থে এবং যাদের রক্তে এই সেনাবাহিনী গড়ে উঠেছে, তাদের এ সম্পর্কে কথা বলার অধিকার রয়েছে।... সমরাস্ত্র, সামরিক পরিকল্পনা এবং বিশেষ কোনো গোপনীয় বিষয় ছাড়া সবকিছু নিয়ে আলোচনা হতে পারে।' (পৃ. ৩৪) সরকারি প্রেসনোটের মতো সেনাবাহিনীসংশ্লিষ্ট কোনো বিষয়ে আইএসপিআরের ভাষ্য যে মানুষের বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন করতে পারে না, বরং তারা ভাবে, 'যা রটে তা কিছু বটে', প্রসঙ্গত সে-কথাও উল্লেখ করেছেন। প্রসঙ্গটির অবতারণা করেছেন তিনি ইয়াজউদ্দিনের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে তাঁর ভূমিকার সমালোচনা করতে গিয়ে। বলেছেন, সশস্ত্র বাহিনীর সুপ্রিম কমান্ডার ও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের চ্যান্সেলর হিসেবে রাষ্ট্রপতি পদের যে গুরুত্ব ও মর্যাদা, অন্ধ দলানুগত্য দ্বারা তিনি তাকে ভূলুণ্ঠিত করেছেন। রাষ্ট্রের এই সর্বোচ্চ সাংবিধানিক পদটিকে বিতর্কিত করে তুলেছেন। আর এর জন্যও লেখক দায়ী করেছেন শেষ পর্যন্ত আমাদের রাজনৈতিক নেতৃত্বকে। যাঁরা রাষ্ট্রপতিকে তাঁর প্রত্যাশিত ভূমিকা পালন করতে দেননি। বরং তাঁকে তাঁদের ক্রীড়নক হিসেবে ব্যবহার করতে চেয়েছেন।

বিডিআর বিদ্রোহ সম্পর্কে লিখতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যেভাবে সাহসিকতার সঙ্গে পরিস্থিতি মোকাবিলা করেছেন, লেখক সে জন্য তাঁর প্রশংসা করেছেন। তবে সেই সঙ্গে তিনি এও বলেছেন, সংসদকে আস্থায় নিয়ে, বিরোধী দলসহ সবার সহযোগিতা ও জাতীয় মতৈক্যের ভিত্তিতে এবং দেশবাসীকে পুরো ঘটনা জানিয়ে এ রকম জাতীয় সংকট মোকাবিলা করা উচিত। লিখেছেন, 'সরকার এককভাবে চাইলে অনেক কিছু নিশ্চয়ই করতে পারে। কিন্তু সবাই মিলে করলে আরও ভালো হয়। জাতীয় সমঝোতা গড়ার এ রকম উদ্যোগ বাংলাদেশের জন্য জরুরি।' (পৃ. ৩৪৬) পাকিস্তানিদের নৃশংসতার কথা আমরা জানি, একাত্তরে সে অভিজ্ঞতা আমাদের হয়েছে। পিলখানা হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে মতিউর রহমানের মন্তব্য : 'আমরা একটি সহনশীল জাতি ও সমাজ বলে উচ্চ কণ্ঠে কত না কথা বলি দেশ-বিদেশে। কিন্তু সারা বিশ্ব অবাক দৃষ্টিতে দেখল, আমরা বাঙালিরা কত নিষ্ঠুর হতে পারি।' (পৃ. ৩৪২) পঁচাত্তরের ১৫ আগস্টের ট্র্যাজেডি ও পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহ এবং তার সুদূরপ্রসারী প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে 'দেশের গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক মহল থেকে আজও তেমন কোনো গভীর অনুসন্ধানী পর্যালোচনা হলো না' বলে লেখক

আক্ষেপ ব্যক্ত করেছেন (পৃ. ১৩৬)। দেশের গণতান্ত্রিক ভবিষ্যতের স্বার্থেই, দলীয় সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে উঠে, এ ব্যাপারে ভাবনাচিন্তার সূত্রপাত হওয়া দরকার বলে তিনি মনে করেন।

৭

সমালোচনার ক্ষেত্রে গত প্রায় দুই দশকে পালাক্রমে ক্ষমতায় আসা প্রধান দুটি রাজনৈতিক দল বা তাদের জোট এবং মধ্যবর্তী তত্ত্বাবধায়ক সরকার কাউকেই তিনি ছাড় দেননি। তেমনি কারও প্রতি বিশেষ অনুরাগ বা পক্ষপাতের প্রমাণও অন্তত গ্রন্থভুক্ত লেখাগুলোতে পাওয়া যায় না। ১৯৯৯-এর ৯ মে যিনি লিখছেন, 'প্রধানমন্ত্রী, ছাত্রলীগকে সামলান', তাঁকেই আবার ২০০১ সালের ১৭ নভেম্বর লিখতে দেখা যায়, 'প্রধানমন্ত্রী, ছাত্রদলকে সামলান'। গ্রন্থভুক্ত লেখাগুলোর (মোট সংখ্যা ৬২) আরও কয়েকটির শিরোনাম থেকেও আশা করি বিষয়টি স্পষ্ট হবে, যেমন : 'বিএনপি কোন পথে?', 'বিএনপি কি পথ হারিয়ে ফেলেছে?', 'দুর্নীতি, এরশাদ ও দেশের প্রধান দুই দল', 'শেখ হাসিনা, মানুষের কথা শুনুন', 'ডা. বি. চৌধুরীর এই ট্র্যাজিক বিদায় কেন?' 'প্রসঙ্গ : সেনাবাহিনীর অপারেশন ক্লিন হার্ট', 'কিবরিয়া ভাইকেও বাঁচতে দেওয়া হলো না', 'বাংলা ভাই মিডিয়ার সৃষ্টি নয়, আবিষ্কার', '২১ আগস্ট, ১৭ আগস্ট এবং তারপর?', 'শেখ হাসিনা অসত্য বলেছেন', 'ড. ফখরুদ্দীনের কাছে প্রত্যাশা : উপদেষ্টা তালিকা উৎসাহজনক নয়', 'তারেকের দুর্নীতির বিচার হতে হবে', 'দুই নেত্রীকে সরে দাঁড়াতে হবে', '২১ আগস্টের হামলা : সত্য বেরিয়ে আসছে, আষাঢ়ে গল্পকারদের কী হবে?', 'প্রধানমন্ত্রী, ছাত্রলীগকে সামলাতে পারলেন না?', 'হাসান মশহুদ চলে যাওয়ায় ক্ষতি কার?', 'খুনি চক্রকে রক্ষা করেছে জিয়া, এরশাদ ও খালেদা সরকার', 'প্রধানমন্ত্রী, বকরের মা-বাবাকে কী বলবেন?' ইত্যাদি। বিশেষ করে আওয়ামী লীগ ও বিএনপি দুটি দলের সমালোচনার ব্যাপারে লেখকের এই প্রায়-সমদর্শিতা কিংবা অন্যভাবে দেখলে সমদূরত্বের মনোভাব দৃষ্টে কেউ কেউ প্রশ্ন তুলতে পারেন, দল দুটির জন্মের ইতিহাস কিংবা দার্শনিক ভিত্তি কি লেখকের বিবেচনায় থাকা উচিত ছিল না? পরিপ্রেক্ষিতে বলা যেতেই পরে, একজন সাংবাদিকের কাজ কি ইতিহাসবিদের কিংবা দার্শনিকের? সমকালীন ঘটনাপ্রবাহ অনুসরণ ও বিশ্লেষণ করে তিনি কেবল তাঁর ভাষ্যই রচনা করতে পারেন। এমনকি ভবিষ্যদ্বক্তার ভূমিকাও নিতে পারেন না তিনি। বিরোধী দল হিসেবে আওয়ামী লীগের জন্ম ও বিকাশ কঠিন আন্দোলন-সংগ্রাম ও নির্যাতনবরণের পথে। পক্ষান্তরে বিএনপির জন্ম সেনানিবাসে, ক্ষমতার ছত্রছায়ায়, সামরিক শাসনের গর্ভ থেকে। এটা তো ঐতিহাসিক সত্য। ফলে জিয়ার মৃত্যুর পর এই দলটির স্বাভাবিক মৃত্যু ঘটবে,

পত্রপত্রিকায় এমন কথা একসময় অনেকেই লিখেছিলেন। কিন্তু তাঁদের সে ভবিষ্যদ্বাণীকে ভুল প্রমাণ করে, রাজপথের আন্দোলন-সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বিএনপি দেশের একটি বৃহৎ ও জনপ্রিয় দল হিসেবে পুনর্জন্ম লাভ করে। কিন্তু গত দুই দশকের আচরণ বা ভূমিকা বিচারে মতিউর রহমান আমাদের দেশের এই প্রধান দুটি দলের মধ্যে তেমন পার্থক্য লক্ষ করেননি। বিশেষ করে প্রশ্নটা যেখানে গণতন্ত্র ও দায়িত্বশীল রাজনীতির। তাঁর *মুক্ত গণতন্ত্র রুদ্ধ রাজনীতি* পড়ে যে-কেউ এই ধারণাতেই উপনীত হবেন।

বইয়ের প্রথম রচনাটি বিচারপতি সাহাবুদ্দীনের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির পদ থেকে বিদায় গ্রহণ উপলক্ষে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য হিসেবে লিখিত। এতে লেখক রাষ্ট্রের শীর্ষপদে অধিষ্ঠিত থাকাকালে ওই 'ছোট দেহাকৃতির সরল মানুষ'টি যেভাবে তাঁর পদের মর্যাদা সমুন্নত রেখেছেন, যেভাবে সততা ও নিরপেক্ষতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেছেন, তার কিছু দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। আমাদের দুর্ভাগ্য যে শেষ পর্যন্ত তা একটি অননুকরণীয় দৃষ্টান্তই হয়ে রইল।

৮

পাঠক বইটিতে অনেক ঘটনার পুনরুল্লেখ, অনেক বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি পাবেন। কিন্তু সেটা এ কারণে যে একই ধরনের ঘটনা বা অঘটন এ দেশে বছরের পর বছর ধরে প্রায় একইভাবে ঘটে চলেছে। ইতিহাসের ব্যাখ্যায় আমরা প্রায়ই 'ক্রান্তিকাল' শব্দটি ব্যবহার করি। সংকট উত্তরণের কোনো সম্ভাবনা ছাড়াই, নেতিবাচক অর্থে আমাদের দেশের বেলায় সেই ক্রান্তিকালটি দীর্ঘস্থায়ী হয়েছে।

বলা হয়, জনসাধারণের স্মৃতিশক্তি খুব দুর্বল। কথাটা আংশিক হলেও সত্যি। শাসকেরা সাধারণত জনগণের এই বিস্মৃতিপ্রবণতারই সুযোগ নেয়। সাময়িক প্রসঙ্গধর্মী হয়েও মতিউর রহমানের এই লেখাগুলো তাঁর তথ্যমূল্যে ও বিশ্লেষণী গুণে কেবল আমাদের সমসাময়িক ইতিহাসের একটি কালপর্বের নির্ভরযোগ্য দলিল হিসেবেই গণ্য হবে না, পাঠকের স্মৃতিকে জাগিয়ে রাখতেও সাহায্য করবে। গবেষকদের জন্যও এ বই হবে এক দরকারি সহায়ক গ্রন্থ।

খ্যাতি
বই আলোচনা
চিন্তা

বাংলাদেশ অভ্যুদয়ের বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট

আজিজুল রাসেল

১৯৭১ : এ গ্লোবাল হিস্ট্রি অব দ্য ক্রিয়েশন অব বাংলাদেশ —শ্রীনাথ রাঘবন
(নিউ দিল্লি : পার্মানেন্ট ব্লাক, ২০১৩), আইএসবিএন ৮১-৭৮২৪-৩৮০-৬

১

শ্রীনাথ রাঘবনের *১৯৭১ : এ গ্লোবাল হিস্ট্রি অব দ্য ক্রিয়েশন অব বাংলাদেশ* গ্রন্থটি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের একটি গভীর ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা প্রদান করে। পূর্বকথন এবং এপিলগ ছাড়া বইটিতে ১০টি অধ্যায় রয়েছে। তাঁর এ গবেষণাগ্রন্থে তিনি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের বিরাজমান ইতিহাসতত্ত্বকে সমালোচনা করেছেন।

রাঘবন ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে দেশ বিভাগ-পরবর্তী সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূ-রাজনৈতিক ঘটনা হিসেবে বিবেচনা করেন। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের মতো এ রকম খুব কমসংখ্যক যুদ্ধেরই এমন বৈশ্বিক গুরুত্ব রয়েছে। এর প্রথম গুরুত্ব হলো এটি খুব অল্প সময়ের মধ্যে বাংলাদেশের মতো একটি বড় ও জনবহুল দেশ সৃষ্টি করেছে।

পেশাদার এবং অপেশাদার ইতিহাসবিদসহ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস নিয়ে ইতিমধ্যে বেশ কিছু বই লেখা হয়েছে। কিন্তু বেশির ভাগ ইতিহাসবিদই নিজেদের যুক্ত করেছেন আবেগের সঙ্গে। কোনো কোনো ইতিহাসবিদ সন্ধান করেছেন নিতান্তই কম গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন: কে ঘোষণা করেছেন বাংলাদেশের স্বাধীনতা? আবার বাংলাদেশ, ভারত এবং পাকিস্তানের কিছু কিছু সামরিক অফিসার তাঁদের মতো করে যুদ্ধের স্মৃতিকথা ও বিভিন্ন দিক নিয়ে লিখেছেন। অনেকে এসব স্মৃতিকথাকেই ইতিহাস ভেবে থাকেন। এটা ঠিক, যুদ্ধের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এসব ব্যক্তির স্মৃতিচারণামূলক গ্রন্থ বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের

ইতিহাস লেখায় গুরুত্বপূর্ণ উৎস হতে পারে। এসব স্মৃতি এমনকি অনেক সময় ইতিহাস রচনায় নিয়ামক ভূমিকা রাখতে পারে। সংঘর্ষ বা সাংঘর্ষিক অঞ্চল বা যুদ্ধের ইতিহাস রচনা ইতিহাসবিদদের জন্য খুব একটা সহজ কাজ নয়। সংঘর্ষ বা যুদ্ধের কারণে ইতিহাস রচনার প্রথাগত এবং অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উৎস, আর্কাইভসের লিখিত দলিল-দস্তাবেজ পাওয়ার সুযোগ খুব কম থাকে। ইতিহাসবিদদের তাই অন্যান্য উৎসের ওপর নির্ভর করতে হয়। তবে এসব উৎস ব্যবহার করায় ঝুঁকি রয়েছে। যুদ্ধের এসব স্মৃতিচারণামূলক গ্রন্থে নিজস্ব ধ্যানধারণা, আত্মপক্ষ সমর্থন ও ঘটনা আড়াল করার প্রবণতা থাকতে পারে ও আছে।

সম্প্রতি কিছু কিছু ইতিহাসবিদ মুক্তিযুদ্ধের আঞ্চলিক ইতিহাস সন্ধানে সচেষ্ট হয়েছেন। তবে যাঁরা এসব ইতিহাস অনুসন্ধান করেছেন, তাঁরাও গতানুগতিক ঘটনা বর্ণনা থেকে বেরোতে পারেননি। আঞ্চলিক যোদ্ধাদের জাতীয় ইতিহাসে স্থাপন করার কোনো প্রচেষ্টা তাঁরা নেননি বা এটি কীভাবে করতে হয় সে পদ্ধতি তাঁদের জানা নেই। তাঁদের ইতিহাস শুধু ঘটনার বয়ান। যুক্তি, তর্ক ও বিশ্লেষণের জায়গা সেখানে নেই। তাঁদের ইতিহাস রচনার উৎসও একপক্ষীয়। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তির জন্য যাঁরা লড়েছিলেন, শুধু তাঁদের সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে এ ইতিহাস রচিত। এককথায় বলতে গেলে এটি কথ্য ইতিহাস এবং একপক্ষীয় কথ্য ইতিহাস। যুদ্ধে জড়িত অন্য পক্ষের কণ্ঠ সেখানে নেই বা ইতিহাসের কোনো দালিলিক প্রমাণ দ্বারা তা যাচাই করা হয় না। এটা ঠিক, যুদ্ধকালীন দালিলিক প্রমাণ পাওয়া বেশ কষ্টসাধ্য।

এসব সাধারণ প্রবণতার বাইরে এসে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে অন্য আলোয় দেখতে চেষ্টা করেছেন বদরুদ্দীন উমর। দুই খণ্ডে রচিত *The Emergence of Bangladesh* গ্রন্থে এ অঞ্চলে বিভিন্ন আন্দোলন-সংগ্রামে শ্রমিক ও কৃষকের অংশগ্রহণ দেখিয়েছেন। ১৯৭১ সালের বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপট চমৎকারভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। বদরুদ্দীন উমর ১৯৪৭ থেকে ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত সময়কালকে দেখেছেন তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের শ্রেণিসংগ্রাম হিসেবে। এ অংশে তিনি বিভিন্ন মিল-কারখানা ও ট্রেড ইউনিয়ন এবং কৃষকসংগ্রামের কথা লিখেছেন। গ্রন্থটির দ্বিতীয় খণ্ডে তিনি আলোচনা করেছেন ১৯৫৮ থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত সময়কালকে। এ সময়কালকে তিনি চিহ্নিত করেছেন জাতীয়তাবাদের উত্থান হিসেবে। উমর তাঁর এ গ্রন্থে বিভিন্ন প্রকার মৌলিক উৎস ও নিজের অভিজ্ঞতা ব্যবহার করেছেন। তবে গ্রন্থটির অন্যতম প্রধান সীমাবদ্ধতা হলো লেখক প্রধানত একজন রাজনীতিবিদ হওয়ায় কোনো কোনো ঘটনা নির্মোহ বিশ্লেষণের চেয়ে নিজের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি আরোপ করতে গিয়ে পদ্ধতিগত ইতিহাস চর্চা থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েন।[১]

বাংলাদেশের নাগরিক নন, এমন কিছু ইতিহাসবিদ এবং সাংবাদিকও বাংলাদেশ জন্মের ইতিহাস অনুসন্ধানে ব্রতী হয়েছেন। এঁদের মধ্যে কেউ কেউ চেষ্টা করেছেন পদ্ধতিগতভাবে বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টিভঙ্গিগত বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস রচনা করতে। আবার কেউ কেউ একপক্ষীয় দৃষ্টিকোণ থেকে পদ্ধতিগতভাবে ভুল ইতিহাস রচনা করেছেন। এর অন্যতম উদাহরণ শর্মিলা বোসের *দ্য ডেড রেকনিং*।[২]

এ পর্যন্ত রচিত বেশির ভাগ ইতিহাস বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে দেখেছে একটি বছর, অর্থাৎ ১৯৭১ সালের ঘটনাবলির মধ্যে। যেন বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হয়েছে কেবল ১৯৭১ সালের নয় মাসের যুদ্ধের ফলেই। আর কিছু কিছু ইতিহাসবিদ রয়েছেন, যাঁরা গতানুগতিকভাবে ঘটনাপরম্পরাকে যুক্ত করেছেন। এ পর্যন্ত বেশির ভাগ ইতিহাবিদই ব্যর্থ হয়েছেন বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পেছনের রাজনৈতিক কারণ ব্যাখ্যা করতে : কী কারণে, কী পরিস্থিতিতে, কখন থেকে এ অঞ্চলের মানুষ একটি জাতিরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখতে শুরু করে এবং কারাই বা প্রথম স্বপ্ন দেখা শুরু করেন। ভারতীয় উপমহাদেশ ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশদের কাছ থেকে স্বাধীনতা লাভ করে। ভারতীয় উপমহাদেশের রাজনৈতিক ক্ষমতা ভাগাভাগির সমীকরণে বড় উপমহাদেশটি বিভক্ত হয়ে যায় দুটি দেশে : ভারত ও পাকিস্তান।

মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে রচিত প্রায় সব ইতিহাসেই কৃষক-শ্রমজীবী মানুষ উপেক্ষিত হয়েছে। পূর্ববাংলার কৃষকেরা ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের শেষ দিনটি পর্যন্ত তো বটেই, উত্তর-ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রেও তাঁদের অধিকার ও দাবি আদায়ের আন্দোলনে সচেষ্ট ছিলেন। ১৯৪০-এর দশক থেকে পূর্ববঙ্গ আলোড়িত ছিল টঙ্ক, তেভাগা ও নানকার বিদ্রোহের মতো শক্তিশালী বিদ্রোহে। ইতিহাসবিদ এড্রিয়েন কুপার তাঁর গবেষণাগ্রন্থ *Sharecropping and sharecroppers' Struggle in Bengal*-এ দেখিয়েছেন কীভাবে প্রায় ২০ বছর ভাগচাষিরা অবিশ্রাম লড়াই চালিয়ে গিয়েছিলেন জমিদার, জোতদার এবং ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক সরকারের বিরুদ্ধে।[৩]

পাকিস্তান আন্দোলনের কারণে কৃষক সংগ্রাম সাময়িক সময়ের জন্য ম্লান হয়ে গেলেও তা একেবারে থেমে যায়নি। বিভিন্নভাবে, বিভিন্ন কাঠামোয় তা চলতে থাকে। কৃষক এবং নিম্নবর্গের মানুষেরা উত্তর ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রেও পাকিস্তান আন্দোলনে ভূমিকা রাখেন। শোষিত কৃষকেরা মনে করেছিলেন পাকিস্তান রাষ্ট্র হবে তাঁদের প্রত্যাশিত রাষ্ট্র। এ রাষ্ট্রে হিন্দু জমিদার-জোতদারদের শোষণ থেকে তাঁরা মুক্তি পাবেন। কিন্তু এ প্রত্যাশার মোহভঙ্গ ঘটতে তাঁদের বেশি দেরি হয়নি। তাজুল ইসলাম হাশমী তাঁর *Peasant Utopia: The Communalization of Class Politics in East Bengal 1927, 1974* গ্রন্থে পূর্ববঙ্গের কৃষকদের চৈতন্যের একটি দিককে পিজেন্ট ইউটোপিয়া হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।[৪]

উত্তর-ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রে বিভিন্ন আন্দোলন-সংগ্রাম এবং উচ্চবর্গের রাজনৈতিক সমাবেশে কৃষক ও শ্রমিকেরা অংশ নিতেন। যুক্তফ্রন্ট, আওয়ামী লীগ এসব দলের সঙ্গে মিশেও তাঁরা তাঁদের দাবি-দাওয়াকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতেন। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন থেকে স্বাধীনতা পেয়ে পাকিস্তান রাষ্ট্র কায়েম হলেও কৃষক ও শ্রমিক তাদের কল্পিত রাষ্ট্রের দেখা পাননি। তাঁদের অবস্থার তেমন কোনো পরিবর্তন হয়নি। স্বভাবতই তাঁদের আশাভঙ্গ হতে থাকে, যে মুসলিম লিগ ঔপনিবেশিক ভারতের শেষ নির্বাচনে বাংলায় বিপুলভাবে বিজয়ী হয়েছিল, মাত্র কয়েক বছরের ব্যবধানে ১৯৫৪ সালে দলের ভরাডুবি ঘটে। এরপর মুসলিম লিগ বাংলায় আর মাথা তুলে দাঁড়াতেই পারেনি। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে প্রথম প্রাপ্তবয়স্ক সবাই ভোটাধিকার পেয়েছিল। উল্লেখ্য, বাংলাদেশের জনসংখ্যার বেশির ভাগই তখন ছিলেন কৃষক। কৃষকেরা তাঁদের মোহভঙ্গের প্রথম প্রতিশোধ নিলেন ১৯৫৪ সালে মুসলিম লিগের কবর রচনা করে। কিন্তু ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে কৃষক ও শ্রমিকদের যুক্তফ্রন্টের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার আরেকটি কারণও ছিল। কৃষকদের সমাবেশে যুক্ত করতে তাঁদের অনেক দাবি-দাওয়াই তাঁদের নির্বাচনী ইশতেহারে যুক্ত করতে হয়েছিল। একই ঘটনা ঘটেছিল ১৯৬৬ সালের ছয় দফার ক্ষেত্রেও। রাজনীতিকেরা তখন বুঝেছিলেন, কৃষক-শ্রমিক অন্য কথায় নিম্নবর্গের মানুষেরাই শোষকদের বিরুদ্ধে লড়াই-সংগ্রামে বড় শক্তি ছিলেন। শুধু তা-ই নয়, কৃষক, শ্রমিক এবং নিম্নবর্গের মানুষেরা ১৯৪৭ থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে কখনো স্বতন্ত্রভাবে আবার কখনো উচ্চবর্গের রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পাকিস্তান সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন-সংগ্রামে অংশ নিয়েছেন এবং বিভিন্ন পর্যায়ে নেতৃত্ব দিয়েছেন। ১৯৪০-এর দশক থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত সময়কালে টেক্সটাইল, সিমেন্ট, ডক ও অন্য শ্রমিকেরা তাঁদের দাবি আদায়ের সংগ্রামে মুখর ছিলেন। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ক্ষেত্রে এসব নিম্নবর্গের মানুষের কণ্ঠ খুঁজে পাওয়া যায় না। ভারতীয় স্বাধীনতাসংগ্রাম ইতিহাসে নিম্নবর্গের ইতিহাসবিদেরা নিম্নবর্গের মানুষের চৈতন্য ও অবদানের কথা লিখেছেন।

২

রাঘবনের *১৯৭১ : এ গ্লোবাল হিস্ট্রি অব ক্রিয়েশন অব বাংলাদেশ* গ্রন্থটি এই প্রথম কোনো বিদেশি ইতিহাসবিদের লিখিত ইতিহাসসম্মত গবেষণাপদ্ধতি অনুসরণ করে লিখিত পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থ। এ গ্রন্থে তিনি বহু গুরুত্বপূর্ণ উৎস ব্যবহার করেছেন। রাঘবনের মতে, মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে রচিত বেশির ভাগ ইতিহাসই অসম্পৃক্ত নয়। তবে দু-একটি ইতিহাসকর্ম যে এই দোষ উত্তীর্ণ হতে পারেনি, তা নয়। এ ক্ষেত্রে ভালো উদাহরণ হলো রিচার্ড সিশন এবং লিও রোজেসের *War and Secession*। গ্রন্থটিতে লেখকেরা বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও ভারতের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে একটি চমৎকার ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ ইতিহাস উপস্থাপন করেছেন।[৫]

সিশন তাঁদের বইটি প্রকাশ করার পর গত ২০ বছরে যুদ্ধ-সংক্রান্ত অনেক দলিল প্রকাশ হয়েছে। কিন্তু কোনো ইতিহাসবিদই এসব দলিল-দস্তাবেজের পূর্ণ ব্যবহার করতে পারেননি। রাঘবনের মতে, এর একটি কারণ হতে পারে দক্ষিণ এশিয়ার পেশাদার ইতিহাসবিদেরা ১৯৪৭ সালের পরের ইতিহাস নিয়ে কাজ করতে আগ্রহ দেখাননি। এ ছাড়া দুই দশক ধরে সাংস্কৃতিক ও সামাজিক ইতিহাস দক্ষিণ এশিয়ার ইতিহাসের কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল। এর ফলে রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক ইতিহাস উপেক্ষিত হয়েছে। এটা আশ্চর্যের বিষয় নয়, বাংলাদেশের বেশির ভাগ ইতিহাসবিদ ১৯৭১ সালের যুদ্ধকে দেখতে চেষ্টা করেছেন স্মৃতি, সংঘর্ষ এবং আইডেনটিটি বা পরিচয়ের দিক থেকে (পৃ. ৫)।

রাঘবনের মতে, এখনো মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে নতুন নতুন অনেক কাজ হচ্ছে কিন্তু এই নতুন গবেষণা পুরোনো গবেষণার মূল বর্ণনাকে কোনো প্রশ্ন করতে পারেনি। বাংলাদেশের জন্ম নিয়ে যা লেখালেখি হয়েছে, সেগুলোর প্রধান দুটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে একপক্ষীয় এবং আদিষ্টবাদ বা ডিটারমিনিজম। বেশির ভাগ বই লেখা হয়েছে একটি পক্ষকে সমর্থন করে এবং এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে জাতীয়তাবাদী প্রভাব। এভাবে যেসব বই পাকিস্তানি দৃষ্টিভঙ্গি থেকে লেখা হয়েছে, তাতে যুদ্ধকে দেখা হয়েছে বিচ্ছিন্নতাবাদীদের কাজ হিসেবে এবং দক্ষিণ এশিয়ায় মুসলমানদের আবসভূমি পাকিস্তানের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা হিসেবে। এসব বইয়ে বাঙালিদের উপস্থাপন করা হয়েছে বিশ্বাসঘাতক হিসেবে (পৃ. ৫)।

অন্যদিকে, রাঘবনের মতে বাংলাদেশিদের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে যেসব গ্রন্থ রচিত হয়েছে, তাতে যুদ্ধকে জাতীয় মুক্তির লড়াই হিসেবে দেখা হয়েছে। এসব গ্রন্থে গল্প বলা হয়েছে বাঙালি জাতীয়তাবাদ উদ্ভব ও বিকাশের। বেশির ভাগ ভারতীয় গ্রন্থে ১৯৭১ সালের যুদ্ধকে দেখা হয় তৃতীয় ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ হিসেবে। এই গ্রন্থগুলোর মতে, যুদ্ধে ভারতীয় বিজয় শুধু পাকিস্তান ভেঙে টুকরোই করেনি, বরং পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পেছনে যে আদর্শিক মন্ত্র ছিল তাও এ যুদ্ধ ভেঙে খান খান করে দেওয়া হয়। এসব গ্রন্থের বয়ানগুলোই যে শুধু সমস্যাপূর্ণই তা নয়। এসব গ্রন্থে লেখকেরা যুদ্ধের বৈশ্বিক প্রভাবের কথা বলতে গেলে বিবেচনাই করেননি। এমনকি সবচেয়ে ভালো যে কাজ, সিশন ও রোসের বইতেও, যুদ্ধে আন্তর্জাতিক প্রভাবকে খাটো করে দেখা হয়েছে (পৃ. ৬)।

বিভিন্ন বিষয়ে মতের পার্থক্য থাকলেও এসব গ্রন্থে একটি ধারণা পোষণ করা হয়ে থাকে : পাকিস্তানের ভাঙন এবং স্বাধীন বাংলাদেশের জন্মের ঘটনাকে দেখা

হয় নিয়তি হিসেবে। সালমান রুশদীর উপন্যাস *সেইম*-এ নিয়তি স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। বদরুদ্দীন উমরও এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বেরোতে পারেননি। উমরের মতে, পাকিস্তানের শুরু থেকেই পাকিস্তান রাষ্ট্র ছিল অস্থিতিশীল। পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে দূরত্ব এবং দুই অংশের মধ্যে সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক জীবন ও ঐতিহ্যে বিস্তর ফারাক ছিল। অর্থনৈতিক ক্ষেত্র এবং ক্ষমতা ভাগাভাগির ক্ষেত্রে বৈষম্য ছিল উল্লেখ করার মতো। এসব ব্যাপার শুরু থেকেই পাকিস্তানের রাজনৈতিক গন্তব্য খুঁজে নিয়েছিল, যা যৌক্তিক এবং অপরিহার্যভাবেই পাকিস্তান ভাঙার দিকে নিয়ে গিয়েছিল।[৬] একইভাবে আনাতল লিয়েভেনের মতে, নৃতাত্ত্বিক ও সাংস্কৃতিকভাবে একেবারে আলাদা এবং এক হাজার মাইল শত্রু রাষ্ট্র ভারত দ্বারা খণ্ডিত দুটি ডানা হিসেবে হয়তো বেশি দিনই টিকে ছিল।[৭] এমনকি যেসব পণ্ডিত সরাসরি এই দৃষ্টিভঙ্গি প্রচার করেন না, তাঁরাও কোনো না কোনোভাবে বলতে চেয়েছেন যে পাকিস্তান রাষ্ট্র কাঠামোই ছিল এমন যে এটি ভেঙে যাবে। তাই বাংলাদেশ রাষ্ট্রের জন্ম অনেকটা এ রকম হয়ে যায় যে এটি ঘটনাপঞ্জি এবং ভবিষ্যদ্বাণী করা ইতিহাস (পৃ. ৬)।

এটা ঠিক, পাকিস্তানের দুটি অংশের মধ্যে ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতা ছাড়াও অনেক ভিন্নতা ছিল। প্রথমেই আসে ভাষার প্রশ্ন। শুরু থেকেই পূর্ব পাকিস্তানের নেতারা এবং মধ্যবিত্ত শিক্ষিত শ্রেণি বাংলা ভাষাকে একটি অন্যতম দাপ্তরিক ভাষা হিসেবে স্বীকৃতির দাবি তোলেন। পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব এ দাবিকে মেনে নিতে তীব্র অনীহা প্রকাশ করে।

দ্বিতীয় এবং অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল অর্থনৈতিক প্রশ্ন। দেশ বিভাগের ফলে পূর্ব পাকিস্তানের সঙ্গে বাংলার অন্যান্য অঞ্চল এবং আসামের সঙ্গে অর্থনৈতিক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। উল্লেখ্য, দেশ বিভাগের আগে পূর্ব বাংলার সঙ্গে বাংলার অন্যান্য অংশ এবং আসামের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক যোগাযোগ ছিল। পূর্ব বাংলার অন্যতম অর্থনৈতিক ফসল ছিল পাট এবং একসময় এই পাটই ছিল এখানকার কৃষকশ্রেণি এবং উঠতি মধ্য শ্রেণির জীবন ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে অপরিহার্যভাবে জড়িত। পাটের মাধ্যমেই বাংলার, বিশেষ করে পূর্ব বাংলার অর্থনীতি যুক্ত হয়েছিল বৈশ্বিক অর্থনীতির সঙ্গে।[৮] দেশ বিভাগ যে সমস্যা তৈরি করেছিল তা আরও গুরুতর হয় পাকিস্তান সরকারের বিভিন্ন অর্থনৈতিক নীতির মাধ্যমে। এখন পূর্ব পাকিস্তানে উৎপাদিত প্রধান বাণিজ্যিক কৃষিপণ্য পাটের মাধ্যমে যে বৈদেশিক অর্থ আয় হতো, তা ব্যবহার করা হতো পশ্চিম পাকিস্তানে শিল্পায়নের জন্য। এ ছাড়া দেশ বিভাগ-পরবর্তী সময়ে পাকিস্তান যেসব বৈদেশিক সাহায্য পেত, তার বেশির ভাগ অংশই পাচার করা হতো পাকিস্তানের পশ্চিম অংশে। এমনকি ১৯৫০-এর দশকে যখন পূর্ব পাকিস্তানের জন্য বরাদ্দ বৃদ্ধি করা

হয়েছিল, তখনো পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্য ছিল বিস্তর। পূর্ব পাকিস্তানের বার্ষিক প্রবৃদ্ধির হার যদিও ১৯৫৪-৫৫ থেকে ১৯৫৯-৬০ সালে ১ দশমিক ৭ শতাংশ থেকে ১৯৫৯-৬০ থেকে ১৯৬৪-৬৫ সালে ৫ দশমিক ২ শতাংশে উন্নীত হয়েছিল, কিন্তু তা পাকিস্তানের পশ্চিম অংশ থেকে ছিল অনেক কম। একই সময়ে পাকিস্তানের প্রবৃদ্ধির হার বৃদ্ধি পেয়েছিল ৩ দশমিক ২ শতাংশ থেকে ৭ দশমিক ২ শতাংশ (পৃ. ৭)।

একটি যুক্তি অনেকেই দিয়ে থাকেন যে পাকিস্তানের ভাগ্য নিদেনপক্ষে ১৯৫০ দশকেই স্পষ্ট হয়ে যায়। এই যুক্তি আসলে বাঙালি রাজনীতিবিদদের যুক্ত পাকিস্তান কাঠামোর মধ্যে থাকার যে প্রচেষ্টা ছিল, তাকে খাটো করে দেখে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দাবিদাওয়া, অধিকার উত্থাপনের মাধ্যমে বাঙালি রাজনৈতিক নেতারা চেষ্টা করেছিলেন ঐক্যবদ্ধ পাকিস্তানে কাজ করে যেতে। পূর্ব পাকিস্তানে জনসংখ্যার হার পশ্চিম পাকিস্তান থেকে বেশি হওয়ায় জাতীয় রাজনৈতিক পর্যায়ে/কেন্দ্রে অধিষ্ঠিত হওয়ার সম্ভাবনা দ্বারা তাঁরা প্রথমে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। এখন প্রশ্ন হলো—'কখন এবং কেন বাঙালিরা পাকিস্তান থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে' এ প্রশ্নের উত্তর বেশ জটিল (পৃ. ৮)।

পাকিস্তান ভাঙার অনিবার্যতা তত্ত্বের বিপরীতে গিয়ে এই বইয়ে বলতে চেষ্টা করা হয়েছে, ১৯৭১ সালে স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম কোনো অনিবার্য ঘটনা ছিল না। বাংলাদেশের জন্ম আগে থেকে ঠিক করা কোনো বিষয় তো ছিলই না, বরং এটি হলো বিভিন্ন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ঘটা একটি ঘটনা। পাকিস্তান কেন তার আধিপত্য ও কর্তৃত্ব হারাল তা বোঝতে হলে আমাদের আরও সংক্ষিপ্ত সময় অর্থাৎ ১৯৬০-এর দশকের শেষ সময়ের ওপর দৃষ্টি দিতে হবে। ১৯৬০-এর দশকের শেষের দিকে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন একটি আপসহীন দাবি হিসেবে জোরালো হয়ে ওঠে। সামরিক সরকার নির্বাচিত সরকারকে ক্ষমতা দিতে টালবাহানা করছিল। তারপরও রাজনৈতিক সমাধান না হলেও খুব সহজেই পাকিস্তান ভেঙে যায়নি। এই বইয়ে যে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ প্রদান করা হয়েছে, তাতে দেখা যায় যুদ্ধে ভারত ও বাংলাদেশের বিজয় কোনো নির্ধারিত বিষয় ছিল না বরং এই যুদ্ধে অনেক অপ্রত্যাশিত বাঁক পরিবর্তন হয়েছে (পৃ. ৮)। লেখক বলতে চেষ্টা করেছেন, পাকিস্তানের ভাঙন শুধু বোঝা যাবে এই ঘটনাগুলোকে বৈশ্বিক পরিসরে স্থাপন করে এবং আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক কূটনীতি ও রাজনীতি বিশ্লেষণের মাধ্যমে।

১৯৬০-এর এবং ১৯৭০-এর দশকের বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট তিনটি বড় ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া দ্বারা গঠিত। সবগুলোই একটি নির্দিষ্ট কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল। ইউরোপীয় সাম্রাজ্যের ব্যুপনিবেশায়ন, যা শুরু হয়েছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকেই। আন্তর্জাতিক ব্যবস্থায় এটি গতির সঞ্চার করেছিল। তৃতীয়

বিশ্বের উদ্ভব বিশ্বের ভূগোল উল্টে দিয়েছিল। তা ছাড়া ১৯৭০-এর দশকের প্রথম দিকে উত্তর-ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রে সংকট আঁচ করা যায়। ঔপনিবেশিক একনায়কতন্ত্রের (authoritarian) উত্তরাধিকার, নতুন শাসকশ্রেণির দুর্নীতি এবং অদক্ষতার ফলে এশিয়া এবং আফ্রিকায় একের পর এক স্বৈরাচারী সামরিক শাসকের আবির্ভাব হয়েছে।

এরপর রয়েছে স্নায়ুযুদ্ধ, যা ইউরোপে শুরু হয়েছিল আদর্শগত এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে একটি নিরাপত্তা প্রতিযোগিতা হিসেবে। এই স্নায়ুযুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের সমর্থক সহযোগী রাষ্ট্রগুলোও ছিল।

৩

এবার নির্দিষ্টভাবে দৃষ্টি দেওয়া যাক বইয়ের কিছু গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের ওপর। প্রথম অধ্যায়ে, অধ্যায়ের শিরোনাম 'টার্নিং পয়েন্ট', লেখক আলোচনা করেছেন ১৯৬৮ এবং ১৯৬৯ সালে পাকিস্তানের রাজনৈতিক সংকট নিয়ে। লেখকের মতে, ১৯৬৮ সালে ছাত্র-আন্দোলন সারা বিশ্বকে আলোড়িত করেছিল। বিশ্বজুড়েই শুরু হয়েছিল ছাত্র-আন্দোলন। বিশ্বের প্রায় ২০টিরও বেশি দেশ ছাত্র-আন্দোলন দ্বারা আন্দোলিত হয়েছিল: উত্তর আমেরিকা এবং পশ্চিম ইউরোপ, চীন এবং পূর্ব ইউরোপ, পূর্ব এবং পশ্চিম এশিয়া, আফ্রিকা এবং লাতিন আমেরিকা, কোনো দেশই ছাত্র-আন্দোলন থেকে নিজেদের দূরে রাখতে পারেনি। ১৯৬৮-এর ছাত্র-আন্দোলন সদ্য শুরু হওয়া বিশ্বায়নের প্রভাব এবং প্রতিফলন বলা যায়। এ ছাড়া অন্য ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট যেমন, ষাটের দশকে স্নায়ুযুদ্ধ এবং ব্যু-পনিবেশায়ন প্রক্রিয়াও এসব আন্দোলন প্রভাবিত করেছে বলে লেখক মনে করেন। পাকিস্তানে সে সময় যে আন্দোলন চলছিল তার রূপ এবং প্রকৃতি অনেক ক্ষেত্রেই বিশ্বের অন্যান্য জায়গার সমসাময়িক আন্দোলনের সঙ্গে মিলে যায় বলে লেখক মনে করেন (পৃ.১৪-৩৩)।

রাঘবনের মতে, ছাত্র-আন্দোলনের মূল কারণ ছিল পঞ্চাশ এবং ষাটের এ দুই দশকে উচ্চশিক্ষার প্রসার। বিশ্ববিদ্যালয় অধিভুক্ত কলেজের সংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছিল এ সময়ে। উদাহরণ হিসেবে লেখক টেনেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা। ১৯৬৮ সালের দিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রসংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছিল ৫০ হাজার, যাদের মধ্যে সাত হাজার শিক্ষার্থীই থাকতেন বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে। দ্বিতীয় কারণ হিসেবে লেখক বলছেন, পূর্ববর্তী শিক্ষা আন্দোলন, যা থেকে ১৯৬৮ সালের আন্দোলন প্রেরণা নিয়েছিল। ১৯৬২ সালে আইয়ুব খান গঠিত শিক্ষা কমিশন যখন স্নাতক শিক্ষাকে দুই বছর থেকে তিন বছর করার সিদ্ধান্ত

নিয়েছিলেন, ছাত্ররা তখন এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন। শিক্ষার্থীরা ভেবেছিলেন, সরকারের এই সিদ্ধান্ত শুধু চাকরিতে ঢোকার ক্ষেত্রেই তাঁদের দেরি করিয়ে দেবে না বরং তাদের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাকেও মাটি করে দেবে (পৃ. ১৫-১৬)।

১৯৬৮ সালের ব্যাপক বিক্ষোভের তৃতীয় যে কারণটির কথা লেখক বলছেন তা হলো অর্থনৈতিক। বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী পশ্চিম ইউরোপ, জাপান ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পুঁজিপতিরা বেশ পুঁজির মুখ দেখেছিল। পাকিস্তানেও আইয়ুব খানের অধীনে ব্যাপক উন্নয়ন ঘটেছিল। তবে এ উন্নয়নের সুবিধা ভোগ করেছিল ছোট বেসরকারি খাত। এটি অপরিকল্পিত কোনো ফলাফল ছিল না: আইয়ুব খানের অর্থনৈতিক পরিকল্পনা সাজানো ও বাস্তবায়ন করা হয়েছিল পশ্চিমা সহযোগিতায় এবং এর উদ্দেশ্য ছিল বুর্জোয়াদের সুবিধা দেওয়ার জন্য। ১৯৬৩ থেকে ১৯৬৮ সাল পর্যন্ত অতি দরিদ্র মানুষের সংখ্যা ৮ দশমিক ৬৫ মিলিয়ন থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৯ দশমিক ৩৩ মিলিয়নে দাঁড়ায়। পরিকল্পনা কমিশনের প্রধান অর্থনীতিবিদ যখন আবিষ্কার করলেন যে দেশের ৬৬ শতাংশ শিল্পসম্পদ এবং ৮৭ শতাংশ ব্যাংকিং ও ইন্স্যুরেন্স নিয়ন্ত্রিত হয় শুধু ২২ পরিবার দ্বারা, তখনই এ বিষয়ে জনসচেতনতা এবং অসন্তোষ তৈরি হয়। সে সময় ছাত্র-আন্দোলনকারীদের মধ্যে একটি জনপ্রিয় স্লোগান ছিল '২২ পরিবার' (পৃ. ১৬)।

চতুর্থত, অন্যান্য জায়গার মতো প্রজন্মপরম্পরায় আন্দোলনের মাত্রা পরিবর্তিত হয়েছিল। শহরের পরিবেশে বিশ্ববিদ্যালয়ে যাওয়ার সুযোগ পাওয়ায় শিক্ষার্থীরা তাঁদের মা-বাবার সঙ্গে নিজেদের পার্থক্য সম্পর্কে সচেতন হয়েছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন এই জ্ঞানার্থীদের মা-বাবাদের শিক্ষার সুযোগ খুব কম ছিল, বলতে গেলে ছিলই না। এসব ছাত্ররা শহরে আসায় পারিবারিক ঐতিহ্যের সঙ্গে বন্ধন দুর্বল হয়ে গিয়েছিল। তা ছাড়া তরুণ প্রজন্মের এসব ছাত্ররা তাঁদের মুরব্বিদের মতো পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রতি তীব্র অনুরাগ ধারণ করতেন না। তাঁদের মা-বাবারা এমন এক প্রজন্মের মানুষ ছিলেন, যাঁরা পাকিস্তান আনার জন্য লড়াই করেছেন কিন্তু নতুন শিক্ষার্থীরা ছিলেন এমন এক প্রজন্মের, যাঁরা বড় হয়েছিলেন আইয়ুব খানের স্বৈরাচারিতার মধ্য দিয়ে। পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের অধীনে কাজ করার যে আগ্রহ পুরোনো প্রজন্মের ছিল, তা নতুন প্রজন্ম কখনো সহ্য করতে পারত না। পঞ্চম যে কারণটির কথা লেখক বলছেন তা হলো নতুন প্রজন্মের এই তরুণদের একটি নতুন সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল। ষাটের দশকে সংরক্ষণশীল পুরোনো সংস্কৃতির বিরুদ্ধে তরুণদের প্রতি সংস্কৃতি বেশ উর্বর হয়ে উঠেছিল (পৃ. ১৭)।

এ ছাড়া পাকিস্তান ভাঙার অন্যতম যে বড় কারণের কথা লেখক বলছেন তা হলো পাকিস্তানে ছাত্র-আন্দোলন বিশ্বের অন্যান্য জায়গার আন্দোলন দ্বারা

অনুপ্রাণিত হয়েছিল। এসব ছাত্র-আন্দোলনের ভাষা এবং তাত্ত্বিক ভিত্তি ছিল আন্তর্জাতিক। বেশির ভাগ ছাত্রনেতাই পরিচিত ছিলেন মার্কস, লেনিন এবং মাওয়ের লেখাজোখার সঙ্গে (পৃ. ১৭)।

রাঘবনের মতে, এ সবকিছু সম্ভব হয়েছিল প্রযুক্তিগত উন্নতির দরুন। প্রযুক্তিগত উন্নয়নের ফলে বিশ্বের এক প্রান্ত থেকে সংবাদ অন্য প্রান্তে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হয়েছিল। ১৯৬৮ সাল থেকে ইংরেজি এবং পাকিস্তানের ভার্নেকুলার সংবাদপত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, পশ্চিম ইউরোপ এবং অন্যান্য অঞ্চলের আন্দোলনের সংবাদ ছবিসহ বিশদভাবে প্রকাশ করত। ১৯৬৭ সালেই প্রথম পাকিস্তানে টেলিভিশন আসে। ১৯৬৭ সালের শেষের দিকে পশ্চিম পাকিস্তানের করাচি, লাহোর এবং রাওয়ালপিন্ডিতে প্রথম টেলিভিশন কেন্দ্র করা হয়। ১৯৬৮ সালের প্রথম দিকে ঢাকায় একটি টেলিভিশন কেন্দ্র স্থাপন করা হয়। এটা ঠিক যে সেই সময় সংবাদপত্র, রেডিও এবং টেলিভিশনকে কঠোর নিয়ন্ত্রণ করা হতো, কিন্তু তারপরও এসব গণমাধ্যমে গোটা বিশ্বের খবর প্রচার করা হতো (পৃ. ১৮-১৯)। এভাবে ১৯৬০-এর দশককে, বিশেষ করে ১৯৬৮ সালকে, রাঘবন একটি বিশেষ সময় হিসেবে মনে করেন যখন থেকে পাকিস্তানের পশ্চিম অংশের প্রতি পূর্ব পাকিস্তানের অসন্তোষ তীব্রভাবে প্রকাশ পাচ্ছিল, ঘন ঘন আন্দোলন হচ্ছিল, শোনা যাচ্ছিল ভাঙনের ধ্বনি।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে ১৯৭০ সালের নির্বাচন ও আওয়ামী লীগের বিজয় এবং ক্ষমতা হস্তান্তর নিয়ে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব ও সামরিক শাসক ইয়াহিয়া খানের টালবাহানার কথা আলোচনা করা হয়েছে। নির্বাচনের ক্ষমতা হস্তান্তরে গড়িমসি করায় পূর্ব পাকিস্তানে ব্যাপক বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছিল। এই গড়িমসিকে নিন্দা জানিয়ে বিভিন্ন সভা-সমাবেশ, মিছিল এবং ধর্মঘট হয়েছিল পূর্ব পাকিস্তানে। শেষ পর্যন্ত গণ-আন্দোলন দমাতে সামরিক পদক্ষেপ, অপারেশন সার্চলাইট ছিল পাকিস্তান ভাঙনে শেষ কুঠারাঘাত।

তৃতীয় অধ্যায়ে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে প্রতিবেশী দেশের অবস্থান ও ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এই অধ্যায়ে লেখক তাঁর যুক্তি ও বিশ্লেষণের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ অনেক প্রাথমিক উৎস ব্যবহার করেছেন। ১৯৭১ সালের মার্চজুড়েই শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন উদ্বিগ্ন। শেখ মুজিবুর রহমানের ব্যক্তিগত প্রতিনিধি ক্যাপ্টেন সুজাত আলিকে মার্চের ১৪ তারিখে ঢাকায় ভারতীয় হাইকমিশনারের কাছে পাঠানো হয়েছিল সংকটাপূর্ণ পরিস্থিতিতে বিশেষ সাহায্যের আবেদন নিয়ে।

পাকিস্তান কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব আড়াই ডিভিশন সেনাবাহিনী উড়িয়ে এনেছিল পাকিস্তানের পশ্চিম ফ্রন্ট থেকে। ভারতীয় কূটনৈতিক নথিতে বলা হয়, 'পূর্ব পাকিস্তান যে পরিস্থিতিতে এখন আছে, সেখান থেকে আর ফেরা সম্ভব নয়।

ভারতীয় নেতাদের কাছে একবার সাহায্যের আবেদন পাঠিয়েই মুজিব ক্ষান্ত হননি। ১৪ মার্চের আগে এবং পরে, বহুবার তিনি ভারতীয় নেতৃবৃন্দের কাছে সাহায্যের আবেদন জানিয়েছিলেন। আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক তাজউদ্দীন আহমদ ৫ এবং ৬ তারিখে ঢাকায় ভারতীয় রাষ্ট্রদূত কেসি সেনগুপ্তের কাছে সাহায্যের আবেদন করেছিলেন। সম্ভাব্য পাকিস্তানি আক্রমণের মুখে এবং স্বাধীনতা আন্দোলন চলাকালীন ভারতে রাজনৈতিক আশ্রয় এবং অন্যান্য সহযোগিতা পাওয়ার সম্ভাবনা আছে কি না তা খতিয়ে দেখেছিলেন (পৃ. ৫৫)। ভারতীয় নীরবতা মুজিবকে ভীষণ বিরক্ত করেছিল। নতুন দিল্লি প্রথম দিকে কেন মুজিবকে সহযোগিতা করছিল না, সেই প্রশ্নের উত্তর খুঁজেছেন লেখক। বাঙালিদের সহযোগিতা করাই কি সংগত ছিল না? পূর্ব পাকিস্তানে রাজনৈতিক উত্তেজনা যখন তুঙ্গে ছিল, ভারত তখন ব্যস্ত ছিল নির্বাচন নিয়ে। নির্ধারিত সময়ের এক বছর আগেই নির্বাচন দিয়েছিলেন ইন্দিরা গান্ধী। এ ছাড়া পশ্চিম বাংলায় নকশাল আন্দোলন নিয়েও বিপাকে ছিল ভারত সরকার। ভারতীয় পররাষ্ট্রসচিব, ত্রিলোকি নাথ কাউল, একমত হয়েছিলেন, পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানকে উৎসাহিত করার প্রয়োজন নেই, স্বাভাবিকভাবেই এই বিচ্ছেদকে এড়ানো যাবে না। পররাষ্ট্রসচিবের মত যে অমূলক ছিল না তা বোঝা যায় সেসময়ে ভারতীয় অন্য কর্মকর্তাদের আলোচনা থেকেও। পররাষ্ট্রবিষয়ক পার্লামেন্টারি কমিটির একটি সভায় বালরাজ মাধক উপস্থিত সবাইকে সতর্ক করে বলেছিলেন, 'পূর্ব পাকিস্তান পাকিস্তান থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে এবং পশ্চিম বাংলা ভারত থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে। সম্ভবত আসামও ভারত থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে... রাশিয়া এবং চীনপন্থীরা এদের মদদ দিচ্ছে। ভারতের গবেষণা সংস্থা আর অ্যান্ড এ ডব্লিউ বর্তমানে RAW তথ্য দিচ্ছিল পাকিস্তানের ভাঙনই অনিবার্য। মুজিবও এ জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। এর বাইরে ছয় দফা থেকে বেরোনের কোনো উপায় মুজিবের ছিল না। জাতীয় পরিষদের সভা বাতিলের পর আওয়ামী লীগের সদস্যরা আর অ্যান্ড এ ডব্লিউর কাছে তাদের চাহিদা মোতাবেক মেশিনগান, মর্টার, তিন মিলিয়ন টন খাদ্য সরবরাহ, ওষুধ, যোগাযোগ উপকরণ, ভারতের ভেতরে দ্রুত যোগাযোগের পরিবহন, ছোট বিমান এবং হেলিকপ্টার, ব্রডকাস্টিং সুবিধাসহ রেডিও ট্রান্সমিটারের চাহিদার কথা জানিয়েছিল (পৃ. ৫৭-৫৮)।

এ ক্ষেত্রেও ভারত তেমন দ্রুত সাড়া দেয়নি। ভারতের ভেতরে অভ্যন্তরীণ সমস্যা, যেমন নকশাল আন্দোলন, এর একটি কারণ ছিল। এ ছাড়া বালারাজ মাধক যে ভয়টা পাচ্ছিলেন, পূর্ব বাংলার স্বাধীনতাসংগ্রাম ভারতের বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন উসকে দিতে পারে এবং যুক্ত বাংলার একটি সম্ভাবনাও তৈরি করতে পারে, সেই আশঙ্কাও কাজ করেছিল। এ ছাড়া কমিউনিস্ট রাশিয়া ও চীনভীতি

তো ছিলই। কমিউনিস্টভীতি থেকেই ভারত চেয়েছিল যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ শেষ হোক। এ ছাড়া ভারতের দেরি করে সাড়া দেওয়ার পেছনে মুজিবের সঙ্গে ভারতের ক্রমবর্ধমান দূরত্বও দায়ী ছিল। এটি শেখ মুজিবুর রহমানও পরবর্তীকালে স্বীকার করেছিলেন। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার পর থেকে মুজিব ভারতের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে খুব সতর্ক ছিলেন। ভারত যখন কিছুতেই সাড়া দিচ্ছিল না মুজিব তখন সেনগুপ্তর মাধ্যমে ভারত সরকারকে সংবাদ পাঠালেন, আমেরিকার রাষ্ট্রদূত তাঁদের সঙ্গে একটি চুক্তিতে যেতে চাইছে যে বঙ্গোপসাগরের একটি দ্বীপ যদি তাঁরা সাত বছরের জন্য দিয়ে দেয়, তাহলে আমেরিকা পূর্ব পাকিস্তান থেকে সেনা প্রত্যাহারের ব্যবস্থা করবে। এ অবস্থায় ভারত যদি এগিয়ে না আসে তাহলে মুজিবের যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে চুক্তি ছাড়া আর কোনো পথ থাকবে না। মুজিবের এই বার্তায় ভারতীয় কর্মকর্তারা বেশ চিন্তিত হয়ে পড়েছিল (পৃ. ৫৮-৫৯)। ভারত কীভাবে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে জড়াল এ অধ্যায়ে এর বিস্তারিত আলোচনা এবং ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ রয়েছে।

চতুর্থ এবং পঞ্চম অধ্যায়ে লেখক আলোচনা করেছেন যুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং রাশিয়ার ভূমিকার কথা। রাঘবন দেখাচ্ছেন, ১৯৭১ সালের যুদ্ধে দুই পরাশক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং রাশিয়া বেশ প্রভাব রেখেছিল। যুক্তরাষ্ট্র সমর্থন করেছিল পশ্চিম পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীকে আর রাশিয়ার সমর্থন ছিল পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি। যদিও প্রথম দিকে রাশিয়া এই যুদ্ধে কোনো ভূমিকা রাখতে চায়নি, তবে শেষের দিকে রাশিয়া পূর্ব পাকিস্তানকে সক্রিয় সমর্থন দেয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধবিষয়ক পরিকল্পনা ও কূটনীতির প্রধান ভূমিকা পালন করেছিলেন হেনরি কিসিঞ্জার ও প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সন। কিসিঞ্জার ছিলেন প্রেসিডেন্ট নিক্সনের পররাষ্ট্র ও কৌশলগত বিষয়ের প্রধান উপদেষ্টা। ১৯৭১ সালের যুদ্ধ নিয়ে তিনি তিনটি সম্ভাব্য পরিকল্পনা করে রেখেছিলেন। প্রথম পরিকল্পনাটি হলো পশ্চিম পাকিস্তানকে সর্বপ্রকার সাহায্য প্রদান করা। দ্বিতীয় পরিকল্পনাটি ছিল নিরপেক্ষতা বজায় রাখা এবং তৃতীয় পরিকল্পনাটি ছিল ইয়াহিয়া খানকে যুদ্ধ শেষ করতে সর্বোচ্চ সহযোগিতা করা এবং এমন অবস্থার সৃষ্টি করা যে জায়গা থেকে পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন নিশ্চিত করা। রাঘবনের মতে, কোনো জায়গায় উল্লেখ না করলেও তৃতীয় পরিকল্পনার প্রতি কিসিঞ্জারের ঝোঁক আঁচ করা যায়। লেখকের মতে, যুক্তরাষ্ট্র যদিও পাকিস্তানকে সহযোগিতা দিয়েছিল, তবুও হেনরি কিসিঞ্জারের তৃতীয় পরিকল্পনাটি ছিল পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন নিশ্চিত করা। ১৯৭১ সালের মে মাসের ২ তারিখে প্রেসিডেন্ট নিক্সন তৃতীয় পরিকল্পনাটি অনুমোদন করেছিলেন এবং তাতে নিজের লেখা ছোট কয়েক লাইন নোট জুড়ে দিয়েছিলন: 'ইয়াহিয়া ডু নট স্কুইজ অ্যাট দিস টাইম' এবং 'ডু নট'-এর নিচে তিনটি আন্ডার লাইন করা ছিল এর গুরুত্ব বোঝাতে (পৃ. ৮০-৮১)।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে চীনের ভূমিকা নিয়ে। ১৯৭১ সালের যুদ্ধে সম্পৃক্ত হওয়া নিয়ে দ্বিধাদ্বন্দ্বে ছিল চীন। প্রথম থেকেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চীনকে তার পক্ষে ভেড়াতে চেয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চীনকে বারবার উৎসাহ এবং তাগাদা দিয়েছিল ভারত সীমান্তে সেনা সমাবেশ করায় এবং সম্ভব হলে ভারতে অনুপ্রবেশ করায়। কিন্তু এ কাজে শুরু থেকেই চীন ছিল দ্বিধাদ্বন্দ্বে।

একেবারে শেষ অধ্যায়ে, যুদ্ধে বাংলাদেশের জয়কে একটি আশ্চর্য জয় হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন লেখক। মুক্তিযোদ্ধাদের ভূমিকা ও দেশের মানুষের আভ্যন্তরীন উদ্যোগ লেখকের চোখে তেমনভাবে ধরা পড়েনি। তাই তথ্য বিন্যাস ও ব্যাখ্যায় বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধটি ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধে শেষ অব্দি পর্যবেসিত হয়েছে। যার ফলে এখানে মুক্তিযোদ্ধাদের ভূমিকা ততটা স্থান পায়নি। এত দ্রুত এবং যে মাত্রায় বিজয় অর্জন করেছিল মুক্তিযোদ্ধা এবং ভারতীয় বাহিনী, তাতে অনেক পণ্ডিতরা মনে করে থাকেন, এই বিজয় আগে থেকেই নির্ধারিত ছিল। সিশন এবং রোসও মতামত দিয়েছেন, যুদ্ধের ফলাফল অনেকটা পূর্বনির্ধারিতই ছিল। ভারতীয় সেনাবাহিনী ছিল খুবই বিশাল। জল, স্থল এবং আকাশ— তিনটি শাখায়ই এর আধিপত্য ছিল। ভারতীয় সেনাবাহিনী সুযোগ-সুবিধাও পেয়েছিল অনেক বেশি। স্থানীয় অধিবাসীদের কাছ থেকে তারা গোয়েন্দাসহ সর্বপ্রকার সুবিধা পেত। অপর দিকে স্থানীয় মানুষের কাছে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ছিল সম্পূর্ণ বৈরী এবং শত্রু বাহিনী। পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে যুদ্ধ করতে হয়েছিল একটি বৈরী পরিবেশে। ভারতীয় সেনাবাহিনীর নেতৃত্বও ছিল অনেক দক্ষ। রাঘবনের মতে, এটা ঠিক এসব বিষয় ভারতীয় সেনাবাহিনীকে বিজয় পাওয়ার ক্ষেত্রে সুবিধা দিয়েছিল। কিন্তু এসব সত্ত্বেও বিজয় যে অনিবার্য ছিল তা নয়। এমনকি ভারতীয় সেনাবাহিনীও যুদ্ধ শুরু করার আগে এ রকম ভাবেনি। তাদের বিভিন্ন কৌশল এবং পরিকল্পনা শুধু অপরেশনালই ছিল না বরং রাজনীতি দ্বারা প্রভাবিত হতো। একইভাবে যুদ্ধের ফলাফলও বিশেষভাবে নির্ভরশীল ছিল বিশ্বরাজনীতির ওপর। রাঘবনের মতে, অনেক দিক থেকেই এটি ছিল একটি আশ্চর্য বিজয়। যেদিন পাকিস্তান সেনাবাহিনী পূর্ব ফ্রন্টে আত্মসমর্পণ করেছিল, সেদিনই নতুন দিল্লি পশ্চিম ফ্রন্টে যুদ্ধবিরতির ঘোষণা দিয়েছিল এবং এই ঘোষণা কার্যকর হয় ১৭ ডিসেম্বর থেকে। এই যুদ্ধবিরতির ঘোষণা অবশ্যই এসেছিল পূর্ববর্তী কয়েক দিনের আন্তর্জাতিক রাজনীতির প্রভাবে।

শ্রীনাথ রাঘবনের গ্রন্থটি নিঃসন্দেহে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান। তবে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে বৈশ্বিক প্রভাব খুঁজতে গিয়ে তিনি মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসকে অনেক সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে দেখেছেন এবং এ অঞ্চলের মানুষের মুক্তির আকাঙ্ক্ষাকে খাটো করে দেখেছেন। শুরু থেকে পাকিস্তান রাষ্ট্র

খুঁড়িয়ে চলছিল। ইন্টার ডমিনিয়ন বিভিন্ন বাদানুবাদ নিয়ে পাকিস্তান ছিল ব্যস্ত। এ ছাড়া পাকিস্তান রাষ্ট্র ছিল বিকারগ্রস্ত প্যারানয়েড নেতৃত্ব দ্বারা চালিত, যারা সব সময়ই ভয় এবং উদ্বিগ্নতার মধ্যে থাকত। সব সময়ই এরা ভারত জুজু দ্বারা ভীত ছিল এবং বাঙালিদের দেখত সন্দেহের চোখে। এসব ভয় এবং মাত্রাতিরিক্ত উদ্বিগ্নতার ফলে পাকিস্তান শুরু থেকেই পরিণত হয়েছিল ফ্যাসিস্ট রাষ্ট্রে। পাকিস্তান রাষ্ট্রের অখণ্ডতা থাকবে কি না তা নিয়ে সন্দেহ দেখা দিয়েছিল প্রথম থেকেই। আর এজন্য পাকিস্তানের নেতৃবৃন্দের মনে সন্দেহ ও ভয় কাজ করত।

রাঘবন পূর্ব পাকিস্তানে উপনিবেশ-পরবর্তী শিক্ষার বিস্তার, শিক্ষিত শ্রেণি সৃষ্টি ও নতুন নতুন আন্দোলনের সৃষ্টি এবং এই আন্দোলনে শুধু শিক্ষিত শ্রেণির যে ভূমিকার কথা বলছেন তা পুরোপুরি ঠিক না। পূর্ব বাংলায় নতুন জাতীয়তাবাদের বিস্তারকে হয়তো লেখক বেনেডিক্ট এন্ডারসনের 'ইমাজিন্ড কমিউনিটি' তত্ত্বের আলোকে দেখতে চেয়েছেন। এন্ডারসনের তত্ত্ব অনুযায়ী, শুধু ইউরোপীয় শিক্ষায় শিক্ষিত স্বল্পসংখ্যক মানুষের হাত ধরেই তৃতীয় বিশ্বে জাতীয়তাবাদের উত্থান ঘটেছে।[৯] তিনি তৃতীয় বিশ্বে জাতীয়তাবাদের 'অফিশিয়াল ন্যাশনালিজমে' (যেখানে ঔপনিবেশিক প্রতিষ্ঠানে কাজ করা সংখ্যায় অল্প নেটিভ শিক্ষিত মানুষের দ্বারা জাতীয়তাবাদের উত্থান হিসেবে দেখানো হয়) নামিয়ে আনায় অনেক ইতিহাসবিদ সমালোচনা করেছেন।[১০] এন্ডারসনের তত্ত্বের মতোই দেখা যায়, পূর্ব বাংলায় জাতীয়তাবাদ বিস্তারে লেখক নব্য শিক্ষিত মধ্যবিত্ত এবং গণমাধ্যমকে অতিরিক্ত গুরুত্ব দিয়েছেন। কিন্তু দেশের বেশির ভাগ মানুষ যেখানে নিরক্ষর ছিল, সংবাদপত্র কিংবা টেলিভিশনের আওতার বাইরে ছিল সেখানে গণমাধ্যম কতোটা ভূমিকা রাখতে পারে তা নিয়ে মতভেদ থেকে যায়। এছাড়া গণমাধ্যম ছিল কঠোর রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রনের মধ্যে।

তথ্যসূত্র

১. দেখুন, Badruddin Umar, *The Emergence of Bangladesh: Class Struggle in East Pakistan, 1947-1958*, vol. I (Karachi: Oxford University Press, 2004); Umar, *The Emergence of Bangladesh: Rise of Bengali Nationalism, 1958-1971*, vol. II (Karachi: Oxford University Press, 2006).

২. Sarmila Bose, *Dead Reckoning: Memoirs of the 1971 Bangladesh War* (New York: Columbia University Press, 2011)

৩. দেখুন, Adrienne Cooper, *Sharecropping and Sharecroppers' Struggles in Bengal, 1930-1950* (Calcutta: KP Bagchi & Company, 1998).

৪. দেখুন, Taj Ul-Islam Hashmi, *Peasant Utopia: The Communalization of Class Politics in East Bengal, 1920-1947* (Dhaka: University Press Limited, 1994).

৫. দেখুন, Richard Sisson and Leo Rose, *War and Secession: Pakistan, India and the Creation of Bangladesh* (Berkely: University of California Press, 1990), রাঘবনের বই থেকে উদ্বৃত।

৬. Umar, *The Emergence of Bangladesh*, vol. I, p.x.

৭. Anatal Lieven, *Pakistan: A Hard Country* (London: Allen Lane, 2011), p. 10. রাঘবনের বইয়ে উদ্বৃত।

৮. দেখুন এ বিষয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা Tariq Omar Ali, 'The Envelope of Global Trade: The Political Economy and Intellectual History of Jute in the Bengal Delta, 1850s to 1950s' (PhD Diss. Cambridge Massachusetts: Harvard University, 2012).

৯. বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন Benedict Anderson, *Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism* (London: Verso, 1993).

১০. পার্থ চট্টোপাধ্যায় বেনেডিক্ট এন্ডারসনের তত্ত্বের সমালোচনা করে একটি প্রবন্ধ লিখেছেন। দেখুন Partha Chatterjee, 'Whose Imagined Community' in Sekhar Bandyopadhay (ed.), *Nationalist Movement in India: A Reader* (New Delhi: Oxford University Press, 2009), 3-13.

লেখক পরিচিতি

সামিয়া রহমান

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক। বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক জার্নালে বারোটির বেশি গবেষণা নিবন্ধ ছাপা হয়েছে। প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা দুই। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ থেকে স্নাতক ও মাস্টার্সে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম ও স্বর্ণ পদক লাভ করেছেন। একুশে টেলিভিশনের শুভযাত্রায় সংবাদ উপস্থাপক হিসেবে গণমাধ্যমে অভিষেক। পরে যথাক্রমে এনটিভি, দেশটিভি এবং বর্তমানে একাত্তর টেলিভিশনে কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স ও প্রোগ্রাম এডিটর হিসেবে কর্মরত।

সৈয়দ মাহফুজুল হক

প্রভাষক, ক্রিমিনোলজি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। এর আগে ড্যাফোডিল বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতা বিভাগের প্রভাষক পদে কর্মরত ছিলেন। এছাড়াও কাজ করেছেন দৈনিক সংবাদ, দৈনিক কালের কণ্ঠে। বর্তমানে একাত্তর টেলিভিশন ও বিবিসি বাংলায় খণ্ডকালীন হিসেবে কাজ করছেন। সন্ত্রাসবাদ, সাইবার অপরাধ, ও ইসলামিজম সৈয়দ মাহফুজুল হকের আগ্রহের বিষয়।

এম মোফাখ্‌খারুল ইসলাম

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাস বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক। তিনি ভারত উপমহাদেশের অর্থনৈতিক ইতিহাসচর্চার ক্ষেত্রে একজন বিশেষজ্ঞ। তাঁর প্রধান তিনটি গবেষণাগ্রন্থ হচ্ছে বেঙ্গল এগ্রিকালচার, ১৯২০-৪৬ : এ কোয়ানটিটেটিভ স্টাডি (কেমব্রিজ, ১৯৭০); ইরিগেশন, এগ্রিকালচার অ্যান্ড দি রাজ : পাঞ্জাব ১৮৮৭-১৯৪৭ (নিউ দিল্লি, ১৯৯৭) এবং অ্যান ইকোনমিক হিস্ট্রি অব বেঙ্গল, ১৭৫৭-১৯৪৭ (ঢাকা, ২০১৩)। এ ছাড়া বিভিন্ন বিষয়ে লিখিত তাঁর চল্লিশটি প্রবন্ধ দেশি-বিদেশি জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে।

ভিলেম ভেন শ্যান্ডেল

এশিয়ার ইতিহাস, নৃবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞানের গবেষক। তিনি আমস্টারডাম বিশ্ববিদ্যালয় (মডার্ন এশিয়ান হিস্ট্রির চেয়ার) ও ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব সোশ্যাল হিস্ট্রিতে শিক্ষকতা ও গবেষণা করেন। তাঁর প্রকাশনার তালিকা দেখলে দক্ষিণ এশিয়া, বিশেষ করে বাংলাদেশ নিয়ে তাঁর আগ্রহের মাত্রা বোঝা যায়। তাঁর রচনার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো : *দ্য বাংলাদেশ রিডার : হিস্ট্রি, কালচারম পলিটিক্স*, মেঘনাগুহ ঠাকুরতার সঙ্গে যৌথ সম্পাদনা, (ডুরহাম, এনসি : ডিউক ইউনিভার্সিটি প্রেস, ২০১৩); *আ হিস্ট্রি অব বাংলাদেশ*, (কেমব্রিজ : কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস); *দ্য বেঙ্গল বর্ডারল্যান্ড : বিয়ন্ড স্টেট অ্যান্ড নেশন ইন সাউথ এশিয়া* (লন্ডন : এনথেম প্রেস, ২০০৫); *দ্য চিটাগং হিল ট্র্যাক্টস : লিভিং ইন আ বর্ডারল্যান্ড*, ওলফগ্যাং মেই ও আদিত্য কুমার ধিওয়ানের সঙ্গে সম্পাদনা (ব্যাংকক : হোয়াইট লোটাস), ইউপিএল বাংলাদেশ সংস্করণ বের করে ২০১০ সালে।

হাসান শফি

প্রাবন্ধিক, সমালোচক, গবেষক ও রাজনীতি বিশ্লেষক। হাসান শফি লেখকের অন্যতম কলাম-নাম। এই নামে তিনি সাধারণত রাজনৈতিক-সামাজিক বিষয়াদি নিয়ে লিখে থাকেন। জন্ম ১৯৫৩ সালের ২১ মার্চ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে সম্মানসহ স্নাতকোত্তর। একই বিশ্ববিদ্যালয়ের পি.এইচ.ডি। অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক। তিনি বিভিন্ন পত্রিকায় সাংবাদিকতাও করেছেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলোর মধ্যে রয়েছে : *ইসলাম ও মৌলবাদ : ধর্ম ও ধর্মের রাজনীতি* (প্রকাশক : প্রতিপক্ষ, ঢাকা, ১৯৮৯); *পাকিস্তানবাদের বিরুদ্ধে* (প্রকাশক : আজিম অ্যান্ড ব্রাদার্স, ঢাকা, ১৯৯০); *সময়ের মুখোমুখি* (প্রকাশক : পাঠক সমাবেশ, ঢাকা, ১৯৯৪); *পাউডার পাঁচালি* (প্রকাশক : সালমার, ঢাকা, ১৯৯৭); *রাজনীতিহীনতার রাজনীতি* (প্রকাশক : উত্তরণ, ঢাকা, ২০০১); *বিশ্বায়নের কবলে বাংলা ও অন্যান্য প্রসঙ্গ* (প্রকাশক : অনুপম প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৮); *আমাজন অরণ্যের বীর : চিকো মেন্দেস* (প্রকাশক : সুবর্ণ, ঢাকা, ২০০৮); *স্রোতের বাইরে* (প্রকাশক : শোভা প্রকাশ, ঢাকা, ২০১১); *মাঝরাতের টক শো, বিশ্বব্যাংক, ড. ইউনূস প্রভৃতি* (প্রকাশক : বর্ণবিচিত্রা, ঢাকা, ২০১৩)।

আজিজুল রাসেল

ইতিহাসবিদ ও গবেষক। বর্তমানে ইউনিভার্সিটি অব লিবারেল আর্টস-এ শিক্ষকতা করছেন। পড়াশোনা করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং নেদারল্যান্ডের লেইডেন বিশ্ববিদ্যালয়ে। উল্লেযোগ্য প্রকাশনা— প্রবন্ধ : 'আরমেনিয়ান ডায়াসপোরা ইন বেঙ্গল : ট্রেড এন্ড পলিটিকস ইন দ্য সেভেনটিন্থ এন্ড এইটিন্থ সেঞ্চুরিজ,' *বাংলাদেশ হিস্টোরিক্যাল স্টাডিজ*, সংখ্যা ২২, ২০১০-২০১২; গ্রন্থ : *দ্য সেভেনটিন্থ সেঞ্চুরি ডাচ ট্রাভেল লিটেরেচার এন্ড দ্য প্রডাকশন অব নলেজ অন এশিয়া* (২০১৩)।

গ্রাহক হওয়ার নিয়ম

যেকোনো সময় যেকোনো সংখ্যা থেকে *প্রতিচিন্তা*র গ্রাহক হওয়া যাবে। একবারে কমপক্ষে চার সংখ্যা বা এক বছরের জন্য গ্রাহক হতে হবে। 'মিডিয়াস্টার লিমিটেড প্রতিচিন্তা' বরাবর মানি অর্ডার, পে-অর্ডার বা ব্যাংক ড্রাফটের মাধ্যমে টাকা জমা করা যাবে। অফিসে সরাসরি উপস্থিত হলেই শুধু নগদ টাকা গ্রহণ করা হবে। এক বছরের জন্য গ্রাহক হতে দেশের গ্রাহকদের অগ্রিম দিতে হবে ২০০ (দুই শত) টাকা, বিদেশের গ্রাহকদের জন্য ৩০ (ত্রিশ) ডলার; দুই বছরের ক্ষেত্রে যথাক্রমে ৪০০ (চার শত) টাকা ও ৬০ (ষাট) ডলার।

গ্রাহক হিসেবে আবেদন করতে পরিষ্কার করে লিখুন :

নাম, অবস্থান (দেশ/ বিদেশ), বিস্তারিত ঠিকানা, ফোন ও ই-মেইল (যদি থাকে), গ্রাহক হওয়ার মেয়াদ (এক/ দুই বছর), অর্থ প্রদানের মাধ্যম (মানি অর্ডার/ পে-অর্ডার/ ব্যাংক ড্রাফট), টাকা/ ডলারের পরিমাণ।

গ্রাহক হিসেবে নিবন্ধিত হওয়ার পর গ্রাহককে একটি গ্রাহক কার্ড দেওয়া হবে।

যোগাযোগের ঠিকানা

সম্পাদক
প্রতিচিন্তা
১০০ কাজী নজরুল ইসলাম অ্যাভিনিউ (সিএ ভবন), কারওয়ান বাজার
ঢাকা ১২১৫। ফোন : ৮১৮০০৮১